পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

জাকিয়া সুলতানা

রেজিস্ট্রেশন নং ৪০/২০০৮-২০০৯

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন/দাখিল করিনি।

গবেষক

(জাকিয়া সুলতানা)
রেজিস্ট্রেশন নং ৪০/২০০৮-২০০৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

জাকিয়া সুলতানা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত "পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম. ফিল. গবেষণার অভিসন্দর্ভ "পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)"। আমার এ অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় অভিসন্দর্ভটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকমণ্ডলীর কাছেও আমার এ অভিসন্দর্ভ লেখার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। তারা হলেন যথাক্রমে প্রফেসর ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, প্রফেসর ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর, প্রফেসর ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. আশফাক হোসেন, জনাব এস. এম. রেজাউল করিম প্রমুখ। আমার এই গবেষণা কর্মে বন্ধু এস. এম. তানভীর আহমেদ ও মোশারফ হোসেন জুয়েল, আহমেদ শরীফ রনি, বোড় বোন ইফাত আরা বিথী, চাঁদ সুলতানা কাউসার কচি, ছোট বোন সানজিদা মুস্তাফিজ লিন্ডা, আঞ্জুমান আরা রোমা সবসময় খোঁজ খবর নিতেন এবং সহযোগিতা করেছেন তাই তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উপরোক্ত একাডেমিক ও গবেষণা বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত আমার পরিবারের কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে আমার এই এম. ফিল. ডিগ্রি করার পেছনে পূর্ণ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা সবটাই আমার মা মিসেস রাশিদা বেগম দিয়েছেন। সেই সাথে আমার বাবা মরহুম মোঃ সাহাব উদ্দিন আকন্দ কে স্মরণ করছি। যিনি আজকে বেঁচে থাকলে হয়ত অনেক খুশি হতেন। আমার ছোট দুই বোন শম্পা, ছন্দা ও চাচা সিরাজ উদ্দিন আকন্দ সব সময় আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং তাগিদ দিয়েছে। সর্বোপরি আমার ছেলে স্যামি ও স্বামী শাহ্ স্যামুয়েল কাইজার তাঁদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এগুলি হলো বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভ্স ও গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ "পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)" বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যতসামান্যও যদি এগিয়ে নিতে সহায়তা করে তবেই আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। যতদূর সম্ভব অভিসন্দর্ভটি ত্রুটিহীনভাবে উপস্থাপন করার সবসময় চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি, মুদ্রণ জনিত ভুল থাকলে তার ব্যর্থতার দায় একান্তই আমার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

জাকিয়া সুলতানা
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পটভূমি ৮

তৃতীয় অধ্যায় : যুক্তফ্রন্ট গঠন ৪৮

চতুর্থ অধ্যায় : যুক্তফ্রন্টের দলসমূহ ও তাদের আদর্শগত অবস্থান ৫৭

পঞ্চম অধ্যায় : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আসন বিন্যাস, প্রচার কৌশল, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের জয়লাভের পরিসংখ্যান ও প্রতিক্রিয়া ৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনামল ১১৫

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার ১৯৭

পরিশিষ্ট ২০৩

গ্রন্থপঞ্জি ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)

সংক্ষিপ্তসার

"পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮)" আমার এমন, ফিল, গবেষণার অভিসন্দর্ভ। এই অভিসন্দর্ভে পূর্ববাঙলায় উপনিবেশোত্তরকালীন সময়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন, ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন, পূর্ববাঙলায় প্রথম নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা ও ভাঙন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে শেখায়। বাঙালি জাতির এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রথম সোপান ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। তৎকালীন পূর্ববাঙলার বিরোধী দলসমূহ আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গনতন্ত্রী দল সর্বজনীন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পূর্ববাঙলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য এ 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। তবে যুক্তফ্রন্টে ছিল নিছক একটি নির্বাচনী জোট, সর্বোচ্চ পরিমাণ জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে তা নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং শোচনীয়ভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। তবে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নজীর বিহীন সাফল্য বয়ে এনেছিল তার ২১ দফা কর্মসূচি। বাঙালি ক্ষুদে বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রমিক শ্রেণী তাঁদের দাবি বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান ও পূর্ববাঙলা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেখে একে তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে আপন অস্তিত্বের প্রবল স্বাক্ষর রাখে। মোট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ প্রায় মাত্র ৯ টি। নির্বাচনের সুফল ছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষার স্বীকৃতি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা দাবিতে নিহত শহীদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকার ছুটির দিন ঘোষণা, বাঙলা ভাষার গবেষণাগার হিসেবে বাঙলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাঙলা যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে মোট সাতটি অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমিতে দুই পাকিস্তানের মধ্যকার নানাবিধ বৈষম্য, শরণার্থী সমস্যা, মুসলিম লীগ বিরোধী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে আলাদা রাজনৈতিক জোট 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন; ছোট বড় ১৬টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহন, তাদের রাজনৈতিক ইশতেহার বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের আসন বিন্যাস, প্রচার কৌশল, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভের পরিসংখ্যান, প্রতিক্রিয়া ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ; যুক্তফ্রন্টের সরকারের ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালুসহ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে বিস্তরিত আলোচনা করা হয়।

সর্বোপরি উক্ত থিসিসে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে সরকার গঠন করেছিল তার অনেক মূল্যবান সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন হতে পারেনি এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার অন্যতম কারণ ছিল। ফলে ১৯৫৪-১৯৫৮ পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার সফলতার মুখ দেখতে পারেনি।

জাকিয়া সুলতানা
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং ৪০/২০০৮-
২০০৯
ইতহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

পূর্ববাঙলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ এবং পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ব্যালট যুদ্ধ হলো এই নির্বাচন।[১]

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে শেখায়। বাঙালি জাতির এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রথম সোপান ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। পূর্ববাঙলায় এটি ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন।[২] তৎকালীন পূর্ব বাংলার বিরোধীদলসমূহ; আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল সর্বজনীন বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। সর্বসম্মতভাবে এ নির্বাচনী জোট গঠনের পশ্চাতে উদীয়মান বাঙালি ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা[৩] এবং ১৯৪৭-৫৩ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব, শোষণ-শাসনের পরোক্ষ প্রভাব যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তবে যুক্তফ্রন্ট ছিল নিছক একটি নির্বাচনী জোট, সর্বোচ্চ পরিমাণ জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে তা নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং শোচনীয়ভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে।[৪] এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টে নজিরবিহীন সাফল্য বয়ে এনেছিল তার ২১ দফা কর্মসূচি।

---

[১] *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৪৭-১৯৭১), ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, লিখিত প্রবন্ধ, সম্পাদনায় প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমেদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, প্রথম অধ্যায়, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৫৩।

[২] Election Commission of Bangladesh, Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, (Dhaka: Secretary, Bangladesh Election Commission, May, 1977), p. 1.

[৩] Feroz Ahmed, "The Structural Matrix of the Struggle in Bangladesh" in Kathleen Gough and Hari P Sharma (ed) Imperialism and Revolution in South Asia, (New York and London: Monthly Review Press, 1973), p. 432.

[৪] Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, Dhaka:University Press Limited, 1973), p. 45.

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি ক্ষুদে বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রমিক শ্রেণী তাঁদের দাবি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রদান ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে[৫] দেখে একে তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ভোট দেয়। বস্তুত, পূর্ব বাংলার প্রধান বিরোধী দলগুলো সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে[৬] এমন সময়োপযোগী নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়ন করে যা নির্বাচনে এক নজিরবিহীন সাফল্য বয়ে আনে। ঐতিহাসিক ২১ দফার ভিত্তিতে মাওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে প্রগতিবাদীদের দাবিতে সম্মিলিত ঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তীকালে ২১ দফাভিত্তিক জাতি গঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। নির্বাচনের সুফল ছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা, বাংলা ভাষার গবেষণাগার হিসেবে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন। যদিও এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসানাধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। তথাপি পরবর্তীকালে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।[৭] ১৯৫৪'র নির্বাচনে গণতন্ত্রের বিজয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সতন্ত্র ও ভীত হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শাসকদের দীর্ঘদিনের শোষণের বিরুদ্ধেই এই নির্বাচন ছিল সত্যিকার ব্যালট বিপ্লব। যেটি পরবর্তীকালে বাঙালি মানসে স্বাধিকার অর্জনের প্রণোদনা যুগিয়েছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-৫৮) এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের গঠন, অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক চেতনাকে তুলে ধরা। এছাড়াও যুক্তফ্রন্ট সরকার ২১ দফা ভিত্তিক জাতি গঠনের প্রতিশ্রুতির কতটা বাস্তবায়ন করতে

[৫] Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan the Nature and Direction of Change*, (New York: Praeger Publishers, 1980), p. 40.

[৬] Yunas Samad, *A Nation in Turmoil Nationalism and Ethnicity in Pakistan, 1937-1958,* (New Delhi: Sage Publications, 1995), p. 157.

[৭] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এস. এম. রেজাউল করিম, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া," সমাজবিজ্ঞান নিরীক্ষণ কেন্দ্র, মে-আগস্ট ২০০৩, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছিল তার মূল্যায়ন। মোটকথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশে নির্বাচনের বিকল্প কিছু নেই। তাই উপনিবেশোত্তর কালীন প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গবেষণায় ১৯৫৪ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও তৎপরবর্তী সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়নের প্রয়াস মাত্র।

আলোচ্য গবেষণার পরিধি ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা এবং পাশাপাশি তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা।

আলোচ্য বিষয় পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮) সময়কালীন আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এসব গ্রন্থ থেকে আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। অন্যদিকে কিছু গবেষণা কর্মেও আলোচ্য বিষয়টি আলোচনায় এসেছে প্রাপ্ত গবেষণাকর্মগুলোতেও আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। তাই পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি তুলে ধরা ও মূল্যায়ন করাই আলোচ্য গবেষণা কর্মটির প্রচেষ্টা। কারণ এখানে কয়েকটি বিষয় ওঠে আসে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুকালের মধ্যেই মুসলিম লীগের প্রতি বাঙালিদের বিশ্বাস ভঙ্গ হয় কখন? বিরোধী দলগুলো কেন ঐক্যবদ্ধভাবে একই কণ্ঠে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করে? কেনইবা সকল দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়? যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে ২১ দফাভিত্তিক দাবি উত্থাপন করে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে? এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে? ২১ দফার বাস্তবায়ন আদৌ বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা? নিম্নে কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হলো –

Keith Callard তাঁর *Pakistan A Political Study*[৮] গ্রন্থে মুসলিম লীগের পতন এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে ১৯৫৪-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সামান্যই আলোচনা করেছেন। ফলে আলোচ্য বিষয়টির আংশিক চিত্রই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটিও গবেষণার দাবি রাখে।

খালিদ বিন সাঈদ তাঁর *Politics in Pakistan the Nature and Direction of Change*[৯] গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে কীভাবে এক শ্রেণীর সামরিক বেসামরিক শাসকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এতে করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আলোচনা অপ্রতুলতা অনিবার্য। তাই এখানেও গবেষণার দাবি রাখে।

---

[৮] Keith Callard, *Pakistan – A Political Study*, London: George Allen Unwin Ltd., 1958.

[৯] Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change*, New York: Pradger, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

নাজমা চৌধুরী তাঁর *The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*[১০] গ্রন্থে ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালের দুটো প্রাদেশিক পরিষদের কার্যক্রম তুলে ধরেছেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদে সংগঠিত হওয়া, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দলগুলোর একত্রিত হওয়া এবং মুসলিম লীগের এই বিপরীত দলগুলোর প্রতি আচরণ তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতৃত্ব (১৯৪৭-৫৪), কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। এছাড়াও বিস্তারিতভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, নির্বাচনের পূর্বে দলগুলোর অবস্থানগত পটভূমি নির্বাচনের ফলাফল, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙ্গনের পরিস্থিতিসহ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকার ও সংসদীয় নানা বিতর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি, তাই একে মূল্যায়ন করার জন্য ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

Rounaq Jahan তাঁর *Pakistan Failure in National Integration*[১১] গ্রন্থে ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার নানাবিধ বৈষম্য বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভার্নাকিউলার এলিটদের কথা বলেছেন। তবে ১৯৫০ এর দশকে পাকিস্তানে সামরিক-বেসামরিক বুর্জোয়া শ্রেণী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে চলমান রাজনীতির গতি প্রকৃতির ওপর যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি নিয়ে তেমন আলোচনা আনেনি। তিনি পূর্ব বাংলার দলগুলোর উত্থান সম্পর্কেও অল্প আলোচনা করেছেন। তাই এই সম্পর্কে গবেষণার প্রয়াস রয়েছে।

Ahmed Kamal তাঁর *State Against the Nation*[১২] গ্রন্থে ১৯৪৭-৫৪ পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষকরে মুসলিম লীগের পতন নিয়ে আলোচনা করেছেন। Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh, Class Struggles in East Pakistan (1947-1958)*[১৩] গ্রন্থে ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে তাঁর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নানা বিষয়

[১০] Nazma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, Dacca: University of Dacca, 1980.

[১১] Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, Dhaka University Press Limited, 1973.

[১২] Ahmed Kamal, *State Against the Nation*, The University Press Ltd., 2009.

[১৩] Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh, Class Struggles in East Pakistan (1947-1958)*, Karachi: Oxford University Press, 2004).

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরেছেন। এছাড়া আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ যেমন আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*,[১৪] আতাউর রহমান খানের *ওজারতীর দুই বছর*,[১৫] অলি আহাদের *জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-১৯৭৫*,[১৬] মনি সিংহের "জীবন সংগ্রাম", আবদুশ শহীদের "আত্মকথা" ও আনিসুজ্জামানের "কাল নিরবধি" ইত্যাদি থেকে ১৯৫৪-৫৮ সময়কালের ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া সর্বশেষ প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*[১৭] এই আত্মজীবনীমূলক বইটিতে ১৯৪৭-১৯৫৪ পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনার অনেক চিত্রই উঠে এসেছে। বিশেষ করে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পূর্বেকার ঘটনাগুলো আছে। এখানে লেখক ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর পাশাপাশি রাজনৈতিক ঘটনাগুলো আলোচনায় এনেছেন। যেমন আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল সভা (১৯৫৩) এবং বঙ্গবন্ধুর দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাজিমুদ্দীনের বরখাস্ত হওয়া ও মোহাম্মদ আলী বগুড়ার প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ, '৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি, আওয়ামী লীগের ময়মনসিংহ কনফারেন্স (নভেম্বর ১৯৫৩), যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণা, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বনাম ওয়াহিদুজ্জামান (মুসলিম লীগ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বঙ্গবন্ধুর বিপুল ভোটে বিজয়, নির্বাচন-উত্তর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা বাতিল ও ৯২ (ক) ধারা জারি, বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়া, পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বাতিল (অক্টোবর ১৯৫৪), সিন্ধু কোর্টে গণপরিষদের সভাপতি তমিজউদ্দিন খানের মামলা, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (১৯৫৪), মোহাম্মদ আলী বগুড়ার 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস'-এ আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর যোগদান (ডিসেম্বর ১৯৫৪) এবং এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, যুক্তফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মতবিরোধ ও ফজলুল হকের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি।[১৮] বঙ্গবন্ধুর এই আত্মজীবনীতে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। এর পরের মন্ত্রিসভাগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তাই এখানেও যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

---

[১৪] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

[১৫] আতাউর রহমান খান, *ওজারতীর দুই বছর*, ঢাকা স্ট্যান্ডার্স পাবলিসার্স ১৯৬৪।

[১৬] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪।

[১৭] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১২।

[১৮] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি

আলোচ্য যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-৫৮) গবেষণাটিতে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী মূল দলিলপত্র, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য গবেষণায় দুই ধরনের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে:

ক. প্রাথমিক উৎস

১. রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী এবং আত্মজীবনী

২. পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভার কার্য প্রণালী

৩. সরকারি রিপোর্ট

খ. গৌণ উৎস

১. গ্রন্থাবলীসমূহ

২. জার্নাল (প্রবন্ধ) সমূহ ইত্যাদি।

অধ্যায় বিভাজন

পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৫৪-১৯৫৮) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলো হলো:

ক. প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর দুই পাকিস্তানের মধ্যকার নানাবিধ বৈষম্যসমূহ আলোচনায় উঠে এসেছে যেমন– রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য, শিল্প ক্ষেত্রে বৈষম্য, শরণার্থী সমস্যা বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য বৈষম্য, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

গ. তৃতীয় অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে আলাদা রাজনৈতিক জোট গঠন করে যা 'যুক্তফ্রন্ট' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. চতুর্থ অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্টের দলসমূহ ও তাদের আদর্শগত অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছোট বড় মোট ১৬টি রাজনৈতিক দল উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই অধ্যায়ে প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারসমূহসহ দলগুলোর অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত যুগোপযোগী ইশতেহারগুলোর মধ্যে অনন্য।

ঙ. পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আসন বিন্যাস, প্রচার কৌশল, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের জয়লাভের পরিসংখ্যান, প্রতিক্রিয়া ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ আলোচনা করা হয়েছে।

চ. ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ববাঙলায় গভর্নরের শাসন জারি করে সমাজতন্ত্র উচ্ছেদের নামে রাজনৈতিক দমন-নিপীড়ন চালিয়ে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটলে পূর্ববাঙলায় আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন, তার মন্ত্রিসভার সফলতা ও ব্যর্থতা, আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা গঠন করা ও তাঁর দলে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনীতিবিদদের নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হওয়া, প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির ক্ষমতার লড়াই পূর্ব পাকিস্তানে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন, চরম রাজনীতিক অস্থিরতা, প্রাদেশিক অর্থনীতি ও তার প্রশাসনিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার চিত্র উঠে আসে। এভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা উঠে আসে এবং ২১ দফা দাবির অনেক কিছু যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ছ. সপ্তম অধ্যায় উপসংহার এবং পরিশেষে পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পটভূমি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ঘোষিত "Provincial Legislative Assembly Order, 1947" অনুসারে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হয়। সুতরাং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু উক্ত পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১ (২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান।[১]

মূলতঃ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণ যে স্বপ্ন লালন করে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিল, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ও স্বৈরাচারী নীতির কারণে তাদের সে আশা ভঙ্গ ঘটে। ফলে পূর্ববাঙলায় মুসলিম লীগ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[২] ফলশ্রুতিতে নূরুল আমিন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ "The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953"

---

[১] এই উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় টাংগাইলে। একই আসনে এটি ছিল দ্বিতীয় উপনির্বাচন। প্রথমবার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে। তখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করেন। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব খুররম খান পন্নী নামক টাংগাইলের এক জমিদার – নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, টাংগাইলের রিটানিং অফিসার অন্যায়ভাবে তাঁর নমিনেশন পত্র বাতিল করেছিলেন। ট্রাইব্যুনাল ওই অভিযোগ গ্রহণ করেন ও নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে অনিয়ম করার অভিযোগে ভাসানী ও পন্নীকে ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অযোগ্য ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে পন্নীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় এবং ১৯৪৯ এর এপ্রিলে ওই আসনের উপনির্বাচনে পন্নীকেই মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়। মওলানা ভাসানী তখন জনাব শামসুল হককে পন্নীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড় করিয়ে দেন। পন্নীকে বিজয়ী করার জন্য স্বয়ং নূরুল আমীন (তখন মুখ্যমন্ত্রী) এবং অপর পাঁচজন মন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু নির্বাচনে ভাসানীর প্রার্থী শামসুল হকই জয়লাভ করেন। এই পরাজয়ে পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে ৩৪টি আসন (মোট আসনের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ) শূন্য থাকলেও আর কোনো উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়নি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : Najma Chowdhury, The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58 (Dacca : University of Dacca, 1980), pp. 85-88.

[২] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

পাস করার মাধ্যমে পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করেন।[৩] অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা ও নির্বাচন বিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে এইচ. এস. এম. ইসাহাক, সি. এইচ. পি. কে চেয়ারম্যান এবং এনায়েতুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) ও এমদাদ আলীকে (বিশেষ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) নিয়ে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। এই সীমানা নির্ধারণ কমিটি যথাসময়ে সরকারের নিকট চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে নির্ধারিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। অবশেষে ১৯৫৪ সালে প্রথমে ফেব্রুয়ারি এবং পরে ৮-১২ মার্চ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়।[৪]

পটভূমি

পূর্ববাঙলায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার

ভারত স্বাধীনতা আইনের (১৯৪৭) ৮(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, নতুন সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসনকার্য ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।[৫] এছাড়াও ভারত স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭)-এ উল্লেখিত হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত না-হওয়া পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষে তার অন্তবর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হবে।[৬] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইন সভার সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল। প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইনসভা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিল রাজার প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর প্রদেশের প্রধান শাসন কর্তা ছিলেন। গভর্নরের কার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হতে হত এবং তারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকতেন। যেসব ক্ষেত্রে গভর্নরকে সুবিবেচনায় কাজ করতে হত কিংবা যেসব বিষয়ে তার বিশেষ দায়িত্ব থাকত সেসব

[৩] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১০২।
[৪] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮।
[৫] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৯৫৩-১৯৬৬, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৮।
[৬] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, পৃ. ১০২।

ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গভর্নর মন্ত্রীগণের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। তবে দেশে জরুরি আইন ঘোষিত হলে কেন্দ্র প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত।[৭] কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাঙলায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯৪৭-৫৪ সময়কালে জাতীয় পরিষদের মোট ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে বাঙালি ও মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩ ও ৬০।[৮] আবার বাঙালি মুসলিম সদস্যরা ১৩ জন বাঙালি হিন্দু সদস্যদের[৯] সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। এর ফলে তাঁরা ঢাকা-করাচি-পেশওয়ার অক্ষশক্তি গড়ে তোলেন।[১০] পূর্ববাঙলার কতিপয় সদস্যদের সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্দু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সদস্যদের বিভিন্ন দিক দিয়ে সামঞ্জস্যও ছিল।[১১] কিন্তু ব্যাপক পরিসরের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় প্রদেশের অধিবাসীদের সাথে তেমন যোগাযোগ না থাকার কারণে তাঁরা পূর্ববাঙলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা গণপরিষদে তোলে ধরতে ব্যর্থ হন। এ সুযোগ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অবাঙালি সদস্যরা ফলপ্রসুভাবে কাজে লাগায়। তাঁরা বাঙালি সদস্যগণকে সম্পূর্ণভাবে আজ্ঞাবহ করে তোলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার সীমা লঙ্ঘন করে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তীকালে ভারত স্বাধীনতা আইনের (১৯৪৭) ৮(২) নং অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী নতুন সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন কার্য ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এটি লঙ্ঘন করে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সুযোগ আসে দেশ বিভাগের (১৯৪৭) সময়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়ার সময় তাঁকে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা দেয়া হয়।[১২] অধিকন্তু, ভারত স্বাধীনতা আইনের (১৯৪৭) ৯ (১) নং ধারায় তাঁর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা হয়[১৩] এবং তিনি নিজের ক্ষমতা আরো সুদৃঢ় করার জন্যে ১৯৪৮

---

[৭] ঐ, পৃ. ১০৩।

[৮] Khalid, B. Sayeed, Politics in Pakistan The Nature and Direction of Change, (New York: Praeger Publishers, 1980), p. 33. দেখুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, (১৯৫৩-১৯৬৬), ড. মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, পৃ. ১৭।

[৯] Allen McGrath, *The Destruction of Pakistan's Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996), p. 105. দেখুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, (১৯৫৩-১৯৬৬), ড. মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, পৃ. ১৭।

[১০] Khalid, B. Sayeed, *op. cit*., p. 33. দেখুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, (১৯৫৩-১৯৬৬), ড. মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, পৃ. ১৭।

[১১] Allen McGrath, *op. cit*., p. 104. দেখুন, ড. মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, পৃ. ১৭।

[১২] কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাঙলার সমাজ ও রাজনীতি*, (ঢাকা: স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০১।

[১৩] Commission of M. A. Jinnah, Appendix II in Khalid Bin Sayeed, Pakistan, pp. 306-7.

Dhaka University Institutional Repository

সালের ১৬ জুলাই Pakistan Provisional Constitution (Third Amendment) Order, 1948 এর মাধ্যমে ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) ৯২-ক ধারা সংযোজন করে।[১৪] এর ফলে তিনি প্রয়োজন মনে করলে ভারত শাসন আইনের সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করার এবং গণপরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা লাভ করেন।

কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর ক্ষমতা এত অপপ্রয়োগ করেন যে, ভারত স্বাধীনতা আইনের (১৯৪৭) ৮ নং অনুচ্ছেদে তাঁকে যে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের সময় গণপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল তা তিনি মানেননি।[১৫] তিনি একাধারে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং গণপরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থেকে কেন্দ্রে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। জিন্নাহর উত্তরাধিকারীগণ ও পরবর্তীকালে একইভাবে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও একনায়কসুলভ আচরণ করতে থাকেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালিদের উপস্থিতি তেমন ঘটেনি এবং স্বাভাবিকভাবে তারা সেখানে কোনো বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালে নিহত হওয়ার পরে গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে একজন বাঙালি ও একজন পশ্চিম পাকিস্তানি নিয়োগ দেয়ার রীতি মেনে চলা হলে ও পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তাতে পূরণ হয়নি।

বেগম সায়েস্তা সোহরাওয়ার্দী একরামূল্লাহ গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে সতর্ক করে বলেন, পূর্ববাঙলার অধিবাসীরা নিজেদেরকে অবহেলিত এবং পূর্ববাঙলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে এবং লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা গণপরিষদের কতিপয় অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার দাবিও জানাচ্ছে। বস্তুত, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমে খাজা নাজিমুদ্দীন ও পরে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও তাঁরা পূর্ববাঙলার যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন।[১৬] তাছাড়া ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদেরকে কেবল মুসলিম লীগ থেকে নেয়া হতো। ফলে পূর্ববাঙলার রাজনীতিতে কেন্দ্রীয়

[১৪] *Ibid*, p. 258.
[১৫] Khalid Bin Sayeed, Pakistan, p. 252.
[১৬] Allen McGrath, *op. cit*., pp. 80-86.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি থেকে পৃথক করা যেত না; গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল মুসলিম লীগের সদস্যরা পাঞ্জাবি নেতাদের হাতের ক্রীড়ানক হিসেবে পরিণত হয়েছিল।[১৭]

অর্থাৎ স্বাধীন পাকিস্তানে শুরু থেকেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়। প্রদেশের গভর্নরের নিয়োগদান করতেন গভর্নর জেনারেল। স্বভাবতই প্রাদেশিক গভর্নর সব সময় গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের গঠন, দায়িত্ব বণ্টন ও কার্যকাল বিষয়েও গভর্নরের ওপর গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। 'The Pakistan Provincial Constitution (Third Amendment) Order, 1948' - এর মাধ্যমে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করা হয়।[১৮] এতে বলা হয় গভর্নর জেনারেল যদি মনে করেন যে, পাকিস্তান কিংবা এর কোনো অংশের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, কিংবা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে প্রাদেশিক সরকার দায়িত্ব পালনে অপারগ, সেক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল উক্ত প্রদেশের সকল ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারবেন (তবে প্রদেশের হাইকোর্ট এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে)। ১৯৪৯ সালে PRODA (Public and Representative Offices [Disqualification] Act) জারির মাধ্যমে প্রাদেশিক মন্ত্রীদেরকে পরোক্ষভাবে পরাধীন করা হয়। এই আইনে হাইকোর্টের বিচারক দিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রীর কাজের তদন্ত করা যেত এবং উক্ত তদন্তে কোনো অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি চিহ্নিত হলে উক্ত মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সকল রকম সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যেত।[১৯] এর ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ সব সময় কেন্দ্রের অনুগত থাকতেন।

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মবহির্ভূতভাবে পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক সরকারে হস্তক্ষেপ করেই যেত। কেন্দ্রীয় সরকার নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রাদেশিক পরিষদ সভাকে হয় বরখাস্ত করতো না হয় স্থগিত ঘোষণা করতো। এর ফলে পূর্ববাঙলার সাধারণ অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। রাজনৈতিক অবস্থা একেবারে হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নিপতিত হয়। কেন্দ্রীয়

---

[১৭] Keith Callard, *Pakistan A Political Study*, (London: George Allen & Wnwin Ltd., 1957), p. 25.

[১৮] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, পৃ. ১০৩।

[১৯] তৎকালীন মুখ্য সচিব আজিজ আহমেদ মন্ত্রীদের নামে স্বতন্ত্র গোপন ফাইল রাখতেন। দেখুন, ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, পৃ. ১০৩। আরও দেখুন, Golam Morshed, "East Bengal Provincil Elections of March 1954 and Germination of Separatist Movement in East Pakistan". The Rajshahi University Studies, vol. VII, 1976, p. 78.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের আরেকটি পদক্ষেপ হিসেবে সংবিধান প্রণয়নের প্রয়াসকে উল্লেখ করা যায়। পাকিস্তানের এ সংবিধান প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ ও দিক নির্দেশনা স্বরূপ ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে একটি আদর্শ প্রস্তাব (Objective Resolution) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পূর্ববাঙলায় এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ওঠে। এর কারণ হলো, তাতে পাকিস্তানের জন্যে একটি ইসলামী সংবিধান রচনার সুপারিশ করা হয়। এ আদর্শ প্রস্তাব পাস হওয়ার পরই সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ২০ সদস্যের একটি মূলনীতি কমিটি, তিনটি উপ-কমিটি ও একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়।[২০]

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র ভিত্তি হিসেবে "মূলনীতি কমিটি" সুপারিশাবলী প্রকাশ করিলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক অংশ এমনকি খোদ পূর্ব পাকিস্তানি মুসলিম লীগ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।[২১] মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করিবার নিমিত্তে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স সভাপতি এ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের গৃহে এক সভায় মিলিত হয় এবং (১) আতাউর রহমান খান, (২) কামরুদ্দিন আহমদ (আহ্বায়ক), (৩) সাখাওয়াত হোসেন, (৪) পাকিস্তান অবজার্ভার সম্পাদক আবদুস সালাম, (৫) অলি আহাদ প্রমুখ ব্যক্তির সমন্বয়ে Committee of Action for Democratic Constitution গঠন করা হয়।[২২]

উক্ত সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় মূলনীতি কমিটির সুপারিশাবলী বাতিল করার দাবি জানানো হয়। সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে মহাজাতীয় সম্মেলন (Grand National Convention) আহ্বান করে।[২৩] এতে অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট বাতিল করে একটি পাল্টা প্রস্তাব মালা পেশ করা হয়। এ প্রস্তাবমালাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে দুটো স্বায়ত্তশাসিত শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার দাবিই এতে আলোচিত হয়েছে। অধিকন্তু, বাঙালিরা মূলনীতি কমিটির অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট বাতিল করার উদ্দেশে সভা-সমাবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

[২০] Moudud Ahmed, "Bangladesh: Constitution Quest For Autonomy," (Dhaka: University Press Ltd., 1979), pp. 18-18.
[২১] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ৭৫*, পৃ. ১১৬।
[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।
[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

ছাত্র ধর্মঘট ও ১৩ নভেম্বর (১৯৫০) প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। পূর্ববাঙলায় এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ২১ নভেম্বর (১৯৫০) ঐ রিপোর্টটি স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। অবশ্য পরে ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন তা ২২ ডিসেম্বর (১৯৫২) গণপরিষদে পেশ করেন।[২৪] কিন্তু দেখা যায় চূড়ান্ত খসড়া রিপোর্টটি ও পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। এখানে উল্লেখ্য, মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাঙালিদেরকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলতে সোচ্চার করে দেয়। যেহেতু তাঁরা মনে করেছিল যে, ওই কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হলে গণপরিষদে বাঙালিরা সংখ্যালঘুতে ও পূর্ববাঙলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হবে।[২৫] এই বিষয়টি বাঙালিদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষেপিয়ে তোলে।

প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আরেকটি মাধ্যম ছিল কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যবর্গ। প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাদের চাকরি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ-নিষেধ মানতেন না। ফলে প্রদেশে আমলাতন্ত্র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আমলা গোষ্ঠীতে বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ববাঙলা সচিবালয়ে একজন বাঙালি সচিবও ছিলেন না। অবাঙালি সচিবগণ পূর্ববাঙলার স্বার্থকে কখনই বিবেচনায় আনতেন না। বাঙালি অফিসারদের সঙ্গেও তারা ভালো ব্যবহার করতেন না। তারা ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সাত বছরে সরকারের অফিস-আদালতে পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কর্মকর্তা নিয়োগের তুলনামূলক চিত্রটি উপস্থাপন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।[২৬]

---

[২৪] Allen McGrath, *The Destruction of Pakistan's Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996), p. 88.

[২৫] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৯৫৩-১৯৬৬, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২০।

[২৬] A. K. Choudhury, The Independence of East Bengal a Historical Process, (Dhaka, Jatiya Grantha Kendra, 1984), p. 133.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কর্মকর্তা নিয়োগের তুলনামূলক চিত্র

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববাঙলা
কেন্দ্রীয় সচিবালয়	৬৯২ জন	৪২ জন
পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৩২ জন	৩ জন
রেডিও পাকিস্তান	৯৮ জন	১৪ জন
সরবরাহ ও উন্নয়ন	১৬৪ জন	১৫ জন
রেলওয়ে বিভাগ	১৬৮ জন	১৪ জন
ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ	২৭৯ জন	৫০ জন
কৃষি উন্নয়ন বিভাগ	৩৮ জন	১০ জন
জরিপ বিভাগ	৫৪ জন	২ জন
পাকিস্তান বিমান বাহিনী	১০২৫ জন	৭৫ জন

উৎস : A. K. Choudhury, The Independence of East Bengal A Historical Process. (Dhaka, Jatiya Grantha Kendra, 1984), p. 133. [২৭]

এই পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় যে, পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরসমূহে বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল নামে মাত্র। "পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক অফিসগুলিতে সাতজন সহকারী সেক্রেটারির মধ্যে একজনও পূর্ববঙ্গের লোক নেই। বায়ান্নজন সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যে মাত্র তিনজন এবং দুশো ষোলজন সহকারীর মধ্যে মাত্র পঁচিশজন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী।[২৮] অন্যদিকে দেশের সামরিক বাহিনীতে ও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই সব বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল পাকিস্তানে। এক হিসেবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে পূর্ববাঙলার প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নরূপ :

[২৭] প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, (১৯৪৭-৭১), প্রথম অধ্যায় – ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬-৫৭।

[২৮] বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫) পৃ. ৪১, ড. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), পৃ. ১০৩।

পদ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জেনারেল	১	০
লে. জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
বিগ্রেডিয়ার	৩৫	০
কর্ণেল	৫০	০
লে. কর্ণেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০

পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখন পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা এক রকম ছিল না। যুগ যুগ ধরে বাংলা ছিল শোষিত অঞ্চল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সম্পদ-এর লবণ, চিনি, কাপড় শিল্প এবং এর উর্বরা জমি ও উন্নত কৃষি বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোভাতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃটিশ শাসনের প্রথম নব্বই বছর বাংলাদেশ ক্রমাগত শোষিত হয়। তার শিল্প সম্ভার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বাংলা হয় একটি পশ্চাৎভূমি। একই সঙ্গে বিলেতি শিল্পজাত দ্রব্যের একটি বাজারে পরিণত হয় এই দেশ। দেশের কৃষি ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ে আর এতে অবদান রাখে কৃষির প্রতি সার্বিক অবহেলা এবং জমি ভোগ দখলের এক মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)। এর পরে পাকিস্তান রাষ্ট্র এলে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশকে পেল একটি দুগ্ধবতী গাভী হিসেবে এবং শোষণ প্রক্রিয়া চলালো আরো জোরেশোরে।[২৯] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিকভাবে এটি একটি সম্ভাবনাহীন দেশ। পাকিস্তানের দুটো অংশেই ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থনীতি। জাতীয় আয়ের ষাট শতাংশে ছিল কৃষিখাত উদ্ভুত। জাতীয় আয়ের ৫২.৬ শতাংশে ছিল পূর্ববাঙলার হিস্যা, যদিও জনপ্রতি আয় পূর্ববাঙলা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৮ শতাংশ

[২৯] আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

কম।[৩০] কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প ও বাণিজ্যে, আমদানি ও রফতানি নীতি এক কথায় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পূর্ববাঙলাকে বঞ্চিত করে রাখে। ফলে মাথাপিছু আয়, উন্নয়ন ব্যয়, রাজস্ব খাতে ব্যয় বৈদেশিক বাণিজ্য। আন্তঃ অঞ্চল বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিস্তর বৈষম্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে সরকারি নীতির পাশাপাশি পাকিস্তানের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া প্রভাব এক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে ১৯৫০ এর দশকের শুরুতেই বাঙালিদের মনে কেন্দ্রীয় সরকারবিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এমন কি তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দেয়া বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।[৩১]

১৯৪৭-৫৩ সময়কালে পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর পরই পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় পূর্ববাঙলার জনগণের থেকে ২৫ টাকা বেশি হয়[৩২] এবং তা ১৯৪৯-৫৫ সালে ৭১ টাকায় পৌঁছে।[৩৩]

সারণি ১

১৯৪৯-৫৫ সময়কালে পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অংকে)

সন	পূর্ববাঙলা	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত
১৯৪৯-৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪-৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১

উৎস : রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ২৪।[৩৪]

তাছাড়া ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ববাঙলার মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ছিল ১২,৩৬০ মিলিয়ন রুপি এবং তা ১৯৪৯-৬০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪,৯৪৫ মিলিয়ন রুপি। অপরদিকে ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ছিল ১২.১০৬ মিলিয়ন রুপি এবং তা ১৯৫৬-৬০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬,৪৯৪ মিলিয়ন-এ। এতে দেখা যায় যে, এক দশকে পূর্ববাঙলার বাৎসরিক গড় উৎপাদন (Average Annual Growth Rate) ছিল ০.২ শতাংশে

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

[৩১] Nurul Islam, *Making of a Nation Bangladesh An Economist's Tale* (Dhaka: The University Press Ltd., 2003), p. 22.

[৩২] মতিলাল পাল, বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, রক্তাক্ত বাংলা (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৪।

[৩৩] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৯৫৩-১৯৬৬, পৃ. ২০।

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩.৬ শতাংশ।[৩৫] ফলে ১৯৪৯-৫৫ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুত ও ঊর্ধ্বমুখী এবং পূর্ববাঙলায় মন্থর বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ২

১৯৪৯/৫০-১৯৫৩ সময়কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মোট প্রাদেশিক উৎপাদন। মোট জনসংখ্যা ও মোট প্রাদেশিক মাথাপিছু উৎপাদনের হিসাব।

	মোট প্রাদেশিক উৎপাদন		জনসংখ্যা (লক্ষ)		মোট প্রাদেশিক মাথাপিছু আয়		
বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য মাথাপিছু
১৯৪৯-৫০	১২৩৭.৪	১২০৯.১	৪২২.৫	৩৫৩.১	২৯৩	৩৪২	১৫.৭৬
১৯৫০-৫১	১২৮১.২	১২৫৬.৩	৪৩২.৯	১৬১.৮	২৯৬	৩৪৭	১৬.১৯
১৯৫১-৫২	১৩২২.০	১২২৭.৫	৪৪৩.৫	৩৭০.৭	২৯৮	৩৩১	১০.৭১
১৯৫২-৫৩	১৩৬২.৭	১২৫১.৩	৪৫৪.৪	৩৭৯.৮	৩০০	৩২৯	৯.৩৫
১৯৫৩-৫৪	১৪০৭.৭	১৩৭২.৭	৪৬৫.৬	৩৮৯.১	৩০২	৩৫৩	১৫.৮৪

উৎস : Government of East Pakistan, *A Handbook of Comparative Statistics of East and West Pakistan* (Dacca: Planning and Development, 1968), p.247.

নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দুটো অংশেই ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থনীতি। জাতীয় আয়ের ষাট শতাংশে ছিল কৃষিখাত উদ্ভূত। জাতীয় আয়ের ৫২.৬ শতাংশ ছিল পূর্ববাঙলার হিস্যা, যদিও জনপ্রতি আয় পূর্ববাঙলায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৮৩ শতাংশ কম।[৩৬] দুটি এলাকাই ছিল শিল্প ও বাণিজ্যে পশ্চাদপদ। প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং কৃষি উপকরণ ক্রয় করার জন্য কৃষকদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ বা ঋণ গ্রহণের তেমন ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি কারণে পূর্ববাঙলায় পাট ও ধানের উৎপাদন অনেক কম হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে গম, তুলা, ধান জল সেচের মতো আধুনিক কৃষি কাজের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে উৎপাদিত হয়।[৩৭]

[৩৫] Kabir Uddin Ahmed, Breakup of Pakistan Background and Prospects of Bangladesh (London: The Social Science Publishers, 1972), p. 24. আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি* ১৯৫৩-১৯৬৬, পৃ. ২১।

[৩৬] আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৯৯।

[৩৭] Suman Sarkar, "Pakistan: Patterns of Exploitution" in Muntassir Mamoon (Compiled & Edited), Media and the Liberation War of Bangladesh vol. 2, (Dhaka: Centre for Bangladesh Studies, 2002), p. 57.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ববাঙলায় ৪০৪০০০ একর জমি সেচের আওতাধীন থাকে এবং তা মোট আবাদী ২০.০৯ মিলিয়ন একর জমির মধ্যে ১.৮২ শতাংশ মাত্র। এর কাছাকাছি সময় পশ্চিম পাকিস্তানে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ অনেক বেশি ছিল।[৩৮]

সারণি ৩

পাকিস্তানের জাতীয় আয় (১৯৫৯-৬০ সালের মূল্যে) কোটি টাকা

খাতসমূহ	মোট	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
কৃষি	১৪৬৭	৮৫০	৫৯০	২৪৫৯	১২৩৪	১২২৪
খনিজ	২.৭	-	-	২৬	১	১৫
শিল্প	১৪৩	-	-	৬৫৪	১৯৯	৪৫৫
বৃহদায়তন	-	১২	-	-	-	-
নির্মাণ	২৪	-	-	২৭৩	১৩৫	১৩৭
পরিবহন	১২৪	-	-	৩৬০	১৩০	১২৯
বাণিজ্য	২৮৬	-	-	৬৭০	২৫১	৪২০
সেবা	১৫১	-	-	৩৫২	১১৩	২৩৯
জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১০৬	-	-	৩৩১	৫০	২৮১
ইমারত	১৩৯	-	-	২৩০	১১৭	১১২
ব্যাংক ও বীমা	৭.৭	-	-	৮৩	৬.৬	৭৬.৪
মোট	২৪৫০	১৩১৩	১১৮৩	৫৪২৭	২২৩৮	৩১৮৮
জনসংখ্যা	৭.৯	৪.৩	৩.৬	১২.৮	৭.৩	৫.৫
জনপ্রতি আয়	৩১১	৩০৫	৩৩০	-	৩০৮	৪৯৮

উৎস : ১. জি. এফ. পাপানেক : *Pakistan's Development Social Goals and Private Incentive*. কেমব্রিজ, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭, পৃ. ২৭৬-২৭৮/ ৩১৬-৩১৯।
২. পূর্ব পাকিস্তান সরকার : পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ১০২-১০৩।
৩. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১০০।

[৩৮] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৯৫৩-১৯৬৬, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪

১৯৫০ এর দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মোট সেচ আওতাধীন জমির পরিমাণ (তথ্য অনুযায়ী, হাজার একর হিসেবে)

সেচের উৎস								সেচের এলাকা		
প্রদেশ/ রাজ্য	বছর	সরকারি খাল	বেসরকারি খান	পুকুর	কূপ	অন্যান্য উৎস	মোট	সেচের আওতাধীন	সেচের বাহিরে	মোট
পাঞ্জাব	১৯৫২-১	৯৬০৪	১০৫	২৮	২২১৩	৫০	১২০০০	১২০৬৩	৫৮০৭	১৭৮৭০
সিন্ধু	১৯৪৫-৬	৪৩১৩	১	-	২৩	১১৫৮	৫৪৯৫	৬২৬৮	-	৬২৬৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৯৫১-২	৪৮৬	৪৩৫	২	৫৯	৫৯	১০৪১	১১২২	১৪৭০	২৫৯২
বেলুচিস্তান	১৯৫০-১	২৯০	-	৯১	-	১৮০	৫৬১	৫৬১	-	৫৬১
ভাওয়ালপুর	১৯৫১-২	২০০৭	-	-	১১৪	৩	২১২৪	২২৭৪	২৩৪	২৫০৮
খয়েরপুর	১৯৫১-২	৪৪৮	-	-	-	১৭	৪৬৫	৪৬৫	-	৪৬৫
মোট পশ্চিম পাকিস্তান	-	১৭১৪৮	৫৪১	১২১	২৪০৯	১৪৬৭	২১৬৮৬	২২৭৫৩	৭৫১১	৩০২৬৪
পূর্ব পাকিস্তান	১৯৪৯-৫০	৬	৪৭	১৫	১২	৩২৪	৪০৪	৪৫৮	২৫২০১	২৫৬৫৯
সমগ্রপাকিস্তান	-	১৭১৫৪	১৩৬	২৪২১	১৭৯১	২২০৯০	২৩২১১	৩২৭১২		৫৫৯২৩

উৎস : J. Russell, Andrus X Azizli F. Mohammad, *The Economy of Pakistan* (London : Oxford University Press, 1958), p. 79.

পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড় সম্পদ ছিল সেখানকার ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা। অবশ্য এসব নিয়ে প্রথম দিকে কিছু সমস্যা ছিল; কারণ এদের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল প্রায়শই ভারত এলাকায়। ১৯৫০ সালে সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির মাধ্যমে এই জটিলাবস্থার সমাধান হয়। পশ্চিমে নগরায়ন ছিল অনেক বিস্তৃত। পূর্ববাঙলায় জনগণের মাত্র ৪ শতাংশ ছিল নগরবাসী, কিছু পশ্চিমে ছিল ২০ শতাংশ।[৩৯] ১৯৫০ এর দশকে পূর্ববাঙলায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে সহায়তা প্রদান করেও কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি পাট চাষীদের অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতি সাধন করে ফেলে।[৪০] এমনকি পূর্ববাঙলার প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং কাঁচাপাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানী করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক

[৩৯] পাকিস্তান সরকার, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর : Twenty Years of Statistics in Pakistan 1947-67, করাচি, ১৯৬৮, পৃ. ২০। আরও দেখুন, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১০১।

[৪০] Sugata Bose, General Economic Conditions under the Raj in Sirajul Islam (ed), History of Bangladesh vol. 2, Economic History (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), p. 113.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের এক নতুন নীতিগ্রহণ করাকে[৪১] বাঙালি কৃষকরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাদের অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। আর তা পূর্ববাঙলায় পাট চাষে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে অনুমেয় হয়। উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার এ সময় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। এতে পূর্ববাঙলার অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে : পাটের মূল্য হ্রাস পায়। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পাট ব্যবসা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য। পাট বোর্ড গঠন করে এবং পাটের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু ওই পাট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় অবাঙালি শিল্প সচিব গোলাম ফারুক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বড় ব্যবসায়ী ও পাটের প্রধান ডিলার এম. এ. ইস্পাহানীকে। ফলে পাট বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাঙালিদের প্রতি অনুদার নীতি অবলম্বনের সুযোগ পায়। পাট উৎপাদনকারী চাষীদেরকে পাট বোর্ড, কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের কমমূল্যে উৎপাদিত পাট বিক্রি করতে হয়। আর এম. এ. ইস্পাহানীর মতো ফটকা ব্যবসায়ীরা কৃষকদের কাছ থেকে কম মূল্যে ওই পাট ক্রয় করে উচ্চ মূল্যে পাট বোর্ডের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং প্রচুর মুনাফা করার সুযোগ লাভ করে।[৪২]

শিল্প ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিল্প বলতে ছিল ছোট ও মাঝারি গুটিকয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দুই অংশেই সেগুলো সমানভাবে বিন্যস্ত ছিল। কুটির শিল্পে পূর্ববাঙলা সামান্য এগিয়ে ছিল। পাকিস্তানের সব কাপড় ও চিনি কল ছিল পূর্ববাঙলায়। মারদানের প্রিমিয়ার চিনিকল তখন নির্মাণাধীন ছিল। পশ্চিমে তুলা জিনিং ক্ষমতা ছিল ৬ লাখ টন এবং পূর্বে পাট বেলিং ক্ষমতা ছিল ১১ লাখ টন। পশ্চিমে গম ভাঙার কলে ৪ লাখ টন আর পূর্বে চাল কলে ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজত করা যেত। দিয়াশলাইয়ের সব কারখানা ছিল পূর্ববাঙলায়। চামড়া ও প্রকৌশল কারখানা দুই অংশেই সমানভাগে ভাগ করা ছিল। পূর্ববাঙলায় চা শিল্পের ছিল সাড়ে দুই কোটি কিলোগ্রাম উৎপাদন ক্ষমতা। পশ্চিমে সিমেন্ট বেশি উৎপাদন হতো এবং একটি ১.১ কোটি গ্যালনের ক্ষমতাসম্পন্ন

[৪১] Ayesha Jalal, The State of Martial Rule The Origins of Pakistan's Political Economy of Defense (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 105-106.

[৪২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬।

পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ছিল।[৪৩] ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পূর্ববাঙলায় তাঁত, বিড়ি, রেশম বয়ন, মৃৎ, চরকা, চামড়া, লবণ, বেত ও বাঁশ ইত্যাদি কুটির শিল্প পর্যাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠ পোষকতার অভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করলে পূর্ববাঙলায় কিছুটা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলা, পশমী, রেশমী, ধাতব, খেলার সরঞ্জাম, মৃৎ, সাবান ইত্যাদি শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বিকাশ লাভ করে। বৃহদায়তনের শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে একটিও পাটকল ছিল না। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষ নাগাদই কেবল পূর্ব পাকিস্তানে ১৪টি পাটকল স্থাপন করা হয় কার্পাস বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে দেয়া যায় যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে মাত্র ১৪টি কাপড় কল স্থাপন করা হয়। কার্পাস বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রেও দেয়া যায় যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে মাত্র ১৪টি কাপড়কল স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ৮টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ৬টি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পূর্ববাঙলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক পরিমাণ কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটে। একইভাবে পশম বয়ন শিল্পের কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানের হারনাই, নওশেরা, লরেন্সপুর, কায়দাবাদ, ইসলামাবাদ ও করাচীতে স্থাপিত হয়। পূর্ববাঙলায় একেবারেই এ শিল্প গড়ে ওঠেনি। দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের ভাগে কোনো কাগজের কল পড়েনি। ১৯৫৩ সালে কেবল পূর্ববাঙলার পার্বত্য চট্টগ্রামে চন্দ্রঘোনা কাগজ মিল স্থাপন করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কয়েক বছর দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য অবাধনীতি অনুসরণ করা হয়। ফলে এ অবাধনীতির সুযোগ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিরা লাভ করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি পূর্ববাঙলার অনুকূলে ছিল না। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন করা হলেও ১৯৬২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এ সংস্থা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের নীতি চালু রাখে। কেবল ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা শিল্প সংস্থা চালু করা হয়। এ সময় থেকে পূর্ববাঙলার শিল্প উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রই পূর্বের তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা লাভ করতে শুরু করে। এর পূর্বে তাদের কাছে

[৪৩] পাকিস্তান সরকার, পরিকল্পনা বোর্ড : First Five Years Plan, করাচি, ১৯৫৭, পৃ. ৩৯৯-৪০০, আরও দেখুন, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় সরকারের নানা শর্ত পূরণ করে পূর্ববাঙলায় বড় ধরনের শিল্প কারখানা স্থাপন করা একটি কঠিন ব্যাপারই ছিল।[৪৪]

তাছাড়া দেশের প্রধান ১৭ ধরনের শিল্প কারখানা ১৯৫০ সালে ১০০টি ছিল এবং ১৯৫৪ সালে তা ২৮৫টিতে উন্নীত হয়। দেশের বেসরকারি বিনিয়োগ প্রধানত তুলা ও পাট মিল, ভোজ্যতেল, সিগারেট, ফল ও শাক-সবজি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, দিয়াশলাই, চিত্রকর্ম, ওষুধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চামড়া ও জুতা ইত্যাদি শিল্প করা হয়। এ বেসরকারি পর্যায়ে কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয় তা অনুমান করা কঠিন। একটি আনুমানিক হিসেব হলো যে, ১৯৫১/৫২ থেকে ১৯৫৪/৫৫ পর্যন্ত প্রায় ২৩৪ কোটি রুপি শিল্পখাতে বিনিয়োগ করা হয়।

দেশে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার পর ঐ বোর্ড ১৯টি প্রকল্পের অর্থ যোগান দিলে তাতে উৎপাদন শুরু হয় এবং ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন থাকে। ১৯৫৪-৫৫ অর্থ বছরের শেষ নাগাদ পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয় ৬২ কোটি রুপি। এ পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন বোর্ড এর প্রধান বিনিয়োগ কাগজ, সার, পাটমিল, জাহাজ নির্মাণ, বেলুচিস্তানের সুই থেকে করাচী পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপ লাইন স্থাপনে ব্যয় করা হয়।[৪৫] উল্লেখ্য, সরকারি এ ব্যয়ের সিংহভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। একই ভাবে বেসরকারি উদ্যোগের বিনিয়োগও পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি হয়। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ও একই ধরনের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের খুব কমই তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপকভিত্তিক ওই শিল্প গড়ে উঠতে থাকে।

[৪৪] Muhammad Anisur Rahman, The Lost Moment Dreams With a Nation Born Though Fire Papers on Political Economy of Bangladesh (Dhaka: University Press Ltd., 1993), pp. 51-52.

[৪৫] Government of Pakistan, The First Five Years Plan 1955-60, Chapter 2, Background from Five Years Plan (Karachi : National Planning Board, 1957), p. 9.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫

১০৫০ এর দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তাঁত শিল্পের হিসেব

প্রদেশ	তুলা তাঁত	শিল্প তাঁত	কারুকার্য পূর্ণ শিল্প তাঁত	পশমী তাঁত	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	৩৬১১৭৯	৪৫৭২	১৫২৩৯	-	৩৮০৯৯০
শতকরা	৯৪.৮	১.২	৪.০	-	১০০০.০
পশ্চিম পাকিস্তান	৪৩২২৭	২৪২	৪৭৯২	১৪৫	৪৮৪০৭
শতকরা	৮৯.৩	০.৫	৯.৯	০.৩	১০০.০
সমগ্র পাকিস্তান	৪০৪৪০৬	৮৪১৪	২০০৩১	১৪৫	৪২৯৩৯৭

উৎস : Government of East Pakistan, *Statistical Abstract for East Pakistan Containing Statistical Data on Various Subjects for the Years 1949-50 to 1953-54*, vol. III (Dacca: The Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, (Planning Development), 1956, p. 454.

১৯৫১ সালে পূর্ববাঙলায় ছোট বড় মিলিয়ে মোট শিল্প-কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় **১৫২** টিতে। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক সিমেন্ট কারখানা নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সিমেন্ট কারখানা নির্মাণ করা হয়নি। পূর্ববাঙলায় লবণ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও কোনো লবণ কারখানা নির্মাণ করা হয়নি। এ প্রদেশের লবণের চাহিদা পূরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানি করা হতো। **১৯৫৪** সাল পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬

১৯৫৪-১৯৫৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তালিকাভুক্ত শিল্প কারখানার সংখ্যা

	১৯৫৪		১৯৫৫	
শিল্প	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
খাদ্য প্রক্রিয়াজাত	২২৫	২০৯	১৩০	২২০
পানীয়	৩	৪	২	৫
তামাক	২	৬	২	৮
বস্ত্র বয়ন	৩১	৩৪০	৫৩	৪৬০
জুতা, অন্যান্য পোশাক ও বস্ত্র বয়ন	-	৬৫	৮	৬২
কাঠ, বোতলের ছিপি ও তার আনুষাঙ্গিক বস্তু (আসবাবপত্র ব্যতীত)	৬	১২	২	৬
আসবাবাপত্র ও তার আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি	-	-	১	১৭
কাগজ ও কাগজ থেকে তৈরি দ্রব্য	১	৭	৬	৩
প্রিন্টিং, প্রকাশনা ও তাঁর আনুসঙ্গিক বস্তু	২৮	৭৫	৩০	৯৫
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১১	৩২	২৬	৪৮
রাবার	৩	১৪	৩	২৫
রাসায়নিক দ্রব্য	১৬	১০২	২৬	১৪০
জ্বালানি তেল ও কয়লা	-	-	-	৩
খনিজ দ্রব্য জাত	৬	৩৩	৯	৪৫
মৌলিক ধাতব দ্রব্য	-	৩৫	২	৪১
ধাতব দ্রব্যজাত (সাধারণ ও পরিবহন যন্ত্রপাতি ছাড়া)	৩৮	১৫৮	৩৬	১৯০
যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যতীত)	-	৮৩	৮	১৩৮
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার আনুষাঙ্গিক বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ	৬	৯২	১৮	১০৭
পরিবহন যন্ত্রপাতি	১২	১২৬	৩৬	৮৬
বিবিধ যন্ত্রপাতি	১৩৯	৩৬৮	১২০	৩৬৯
মোট	৩৪৩	১৫২৭	৪২৭	২০৩১

উৎস : Government of East Pakistan, *Statistical Abstract for East Pakistan Containing Statistical Data on Various Subjects for the Years 1949-50 to 1953-54*, vol. III (Dacca: The Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, (Planning Development), 1956, pp. 53-70.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাঙলার বড় বড় শিল্প কল-কারখানার মালিক কেবল অবাঙালি মুসলিমরাই হতে পারে। বাঙালি মুসলিমরা কেবল মাঝারি ধরনের শিল্প উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, পূর্ববাঙলা থেকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হতো এবং রাজধানী শহর করাচীর উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বহনের দায়-দায়িত্ব পূর্ববাঙলাকে বহন করতে হতো। একইভাবে বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা পূর্ববাঙলায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান কার্যালয় থেকে আয়কর দিলে[৪৬] পূর্ববাঙলা কোনক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই আয়করের কোনো অংশ ফেরত পায়নি।

শরণার্থী সমস্যা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে যেসব শরণার্থী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে চলে আসে তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রম কিছুটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে দেয়। পূর্ববাঙলার সঙ্গে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শরণার্থীর আগমন হলে[৪৭] বেশি নগরায়ন ঘটে এবং ওই শরণার্থীরা বেসরকারি পর্যায়ে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করে। তখনকার জ্যামিতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সমগ্র শরণার্থী আছে ৬.৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আসে ০.৭ মিলিয়ন (১৯৫১ আদমশুমারী অনুযায়ী) এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৭.২ মিলিয়ন।[৪৮] শরণার্থীর এই ভূবাসন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের গরমিলকে তুলে নিয়ে আসে এবং একপক্ষীয় দায়-দায়িত্বকে নির্দেশ করে।[৪৯] পূর্ববাঙলায় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম শরণার্থী আসার ফলে কম নগরায়ন ঘটে এবং দেশ বিভাগের পর হিন্দু অভিজাত শ্রেণী স্থায়ীভাবে ভারতে চলে যাওয়ার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা শরণার্থীদের

[৪৬] রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ২২।

[৪৭] Government of Pakistan, Census of Pakistan, 1951, vol. 3, East Bengal Report & Tables (Karachi: Ministry of the Interior, 1957), p. 80.

[৪৮] Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, (Oxford University Press) 1973 Bangladesh, p. 12.

[৪৯] Rounaq Jahan, *op. cit*., p. 12.

দিয়ে পূরণ হয়নি।[৫০] পশ্চিমে নগরায়ন ছিল অনেক বিস্তৃত। পূর্ববাঙলায় জনগণের মাত্র ৪ শতাংশ ছিল নগরবাসী, কিন্তু পশ্চিমে ছিল ২০ শতাংশ।[৫১]

সারণি ৭

মহাজিরদের আদি বাসস্থান

ভারতের প্রদেশ হইতে	পূর্ববাঙলায় আসা শরণার্থীর সংখ্যা	শরণার্থীদের শতকরা হার
পশ্চিম বাংলা	৪৬৬৮১৫	৬৬.৬৯
বিহার	১০১৫৩১	১৪.৫০
আসাম	৮২৮৭৭৮	১১.৪৪
অন্যান্য প্রদেশ	৪৮৭৫৯	৬.৯৭
মোট	৬৯৯৯৭৯	

উৎস : Government of Pakistan, Census of Pakistan, 1951, vol. 3. East Bengal Report & Tables (Karachi: Ministry of the Interior, 1957, p. 80)

১৯৫১ সালের আদমশুমারী থেকে জানা যায় যে, পূর্ববাঙলায় ৬৯৯৯৭৯ শরণার্থী পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসে। সাধারণত পশ্চিম বাংলা থেকে যারা আসে তারা পূর্ববাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বিহার থেকে আসা শরণার্থীরা রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে এবং আসাম ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা শরণার্থীরা ঢাকা বিভাগের জেলাগুলোতে বসতি স্থাপন করে।[৫২]

[৫০] *Ibid*, p. 12.

[৫১] পাকিস্তান সরকার, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর : Twenty Years Plan করাচি, ১৯৬৮, পৃ. ২০। আরও দেখুন, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১০১।

[৫২] Government of Pakistan, Census of Pakistan, 1951, vol. 3, East Bengal Report & Tables (Karachi: Ministry of the Interior, 1957), p. 80.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৮

১৯৫১ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শরণার্থীদের সংখ্যা

প্রদেশ ও রাজ্য	জনসংখ্যা (হাজার)	শরণার্থী	শরণার্থীদের শতকরা হার	মহিলা প্রতি পুরুষের সংখ্যা (১০০), মোট শরণার্থী	
পাকিস্তান	৭৩৮৮০	৭২২৬	৯.৮	১১২৭	১১৮৭
বেলুচিস্তান ও রাজ্য	১১৫৪	২৮	২.৪	১২১৫	১৮০০
ইউনিয়ন জেলাসমূহ	৬০২	২৮	৪.৭	১২৩৯	১৩০০
রাজ্য ইউনিয়ন	৫৫১	-	-	১১৩৯	-
করাচির ফেডারেল রাজধানী এলাকা	১১২২	৬১৭	৫৫.০	১০৯৭	১২০৫
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩২২২	৫১	১.৬	১১১৭	১৪২৯
পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুর	২০৬৩৬	৫২৮১	২৫.৬	১১৫২	১১৬৭
রাজ্য জেলাসমূহ	১৮৮১৪	৪৯০৮	২৬.১	১১৪৯	১১৬৪
ভাওয়ালপুর রাজ্য	১৮২২	৪৯০৮	২৬.১	১১৪৯	১১৬৪
সিন্ধু ও খয়েরপুর	৪৯২৫	৫৫০	১১.২	১২২০	১১৬৫
রাজ্য, জেলাসমূহ	৪৬৬৫	৫৪০	১১.৭	১২১৮	১১৬৯
খয়েরপুর রাজ্য	৩১৯	১০	৩.১	১২৪৬	১১৩৩
পূর্ববাঙলা	৪১৯৩২	৬৯৯	১.৭	১০৯৭	১২০৫

উৎস : Government of Pakistan, Census of Pakistan, 1951, Population According to Economi Status (Tables 11 & 19-C), *Census Bulletin*, No. 4, (Karachi: Office of the Census. Commissioner, Ministry of the Interior, 1953), p. 11.

তবে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর মধ্যে ও কিছু লোকের স্থায়ী আগমন ও বহিঃগমন ঘটে। এটা ঘটার কারণ হলো যারা সশস্ত্র বাহিনী (Arms Forces) ও সিভিল সার্ভিসে চাকরি করতেন তাদেরকে প্রয়োজনের তাগিদে স্থায়ীভাবে এ আগমন ও বহিঃগমন করতে হয়েছে। ফল ব্যবসায়ী ও কিছু অন্য ধরনের ব্যবসায়ীরাও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আগমন ও বহির্গমন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর, লালপুর, মন্টোগোমারী, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ ও করাচীতে

Dhaka University Institutional Repository

শরণার্থীরা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে চলে আসেন। মুতলুবুর রহমানের (Mutlubur Rahman) মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে ভারত থেকে নয় মিলিয়ন শরণার্থী প্রবেশ করে এবং সাড়ে ছয় মিলিয়ন হিন্দু ও শিখ ভারতে স্থায়ীভাবে চলে যায়। ফলে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে আড়াই মিলিয়ন লোক বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ববাঙলা সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য দুই মিলিয়ন রুপি, পাঞ্জাব প্রাদেশিক সরকার আট কোটি রুপি, সিন্ধু প্রাদেশিক সরকার ৬০ লাখ রুপি ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার দশ লাখ রুপি ব্যয় করে।[৫৩] ফলে এ শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে দেয়। পশ্চিমে শরণার্থী সমস্যা সামাজিক ভারসাম্যকে যেভাবে ব্যাহত করে পূর্বে সে রকম কিছু ছিল না। পশ্চিমে শরণার্থীদের ভিড়ের কিছু একটি ভালো দিকও ছিল। ভারতের উদ্যোগী মুসলমান গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ শরণার্থী হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নেয় পশ্চিমের ভৌত অবকাঠামো ছিল অনেক উন্নত। তবে তার সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসকের উপস্থিতি। পূর্ববাঙলায় এই গোষ্ঠী মোটেই ছিল না।[৫৪] পূর্ববাঙলার প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। তার বাজার ছিল অনেক বৃহৎ এবং চাহিদাও ছিল বৃহত্তর। বাংলাদেশে সব সময়ই মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল খুবই সুবিধাজনক।[৫৫] সেখানে সঞ্চয়ের হার ও সব সময় ছিল উচ্চ। দুই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিল নিম্নরূপ :

সারণি ৯

সময়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫০-৫৫	৬.০%	১.৭%
১৯৫৫-৬০	৭.৬%	৪.০%
১৯৬০-৬৫	৪.৩%	০.৯%

উৎস : *Forum* সাপ্তাহিকী, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, ঢাকা। রেহমান সোবহানের প্রবন্ধ 'Who Par for Development', পৃ. ৬-৭।

[৫৩] Mutlubur Rahman, *Economic Problems of Pakistan*, vol. 2, (Karachi: The name of Publishers is not mentioned, 1950), pp. 199-206. দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি* ১৯৫৩-১৯৬৬, পৃ. ২৯।

[৫৪] জি. এফ. পাপানেক : *Pakistan's Development-Social Goals and Private Incentives*, কেমব্রিজ ম্যাসাচুস্টেচ, হার্ভাড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭, পৃ. ১৯।

[৫৫] ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধনের উৎপাদনী হার ছিল ২.১, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২.২। পূর্ববর্তী সময়ে পূর্বের অনুপাত আরো সুবিধাজনক ছিল। পরিকল্পনা কমিশন : Report of the Panel of Economists on Fourth Five Year Plan, ইসলামাবাদ, ১৯৭০, পৃ. ২৫। আরও দেখুন, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, পৃ. ১০১ এবং ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ পরবর্তীকালে প্রবৃদ্ধি বন্ধ্যাত্ব পেল এবং তারপর শুরু হলো তার নিম্নমুখী গতি। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপারটি ছিল অন্য রকম। ১৯৫৪-৫৫ সালে পশ্চিমের জাতীয় আয় পূর্বের সঙ্গে সমতায় পৌঁছাল। সেখানে পূর্বে জনপ্রতি আয় ২ শতাংশ হারে কমল। সেখানে পশ্চিমে তা ৮ শতাংশ হারে বাড়ল।[৫৬]

বিনিয়োগ

১৯৪৯-১৯৫৩ সময়কালে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমানভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ সুবিধা লাভ করে শিল্প কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে পারে। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে বাঙালিরা ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকারের অনুদার নীতি থাকার কারণে তেমন উল্লেখযোগ্য সরকারি ঋণ ও অনুদান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের পক্ষে পূর্ববাঙলায় উল্লেখযোগ্য পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[৫৭]

সারণি ১০

১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫৩/৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ঋণ ও অনুদান লক্ষরুপি হিসেবে)

উন্নয়ন ঋণ (Development Loan)							অনুদান (Grand in Aid)	
অর্থ বছর	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান		মোট		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	উত্তোলনের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ	উত্তোলনের পরিমাণ	বরাদ্দের পরিমাণ	উত্তোলনের পরিমাণ		
১৯৪৮-৪৯	৪০০	-	৭২৭	৫৫২	১১২৭	৫৫২	১০	১৪০
১৯৪৯-৫০	৪২১	-	৬১৫	৫৬৫	১০৩৬	৫৬৫	১০১	৭৫
১৯৫০-৫১	২০০	২০০	৬৫১	৫১০	৮৫১	৭১০	৩৮	২৩৬
১৯৫১-৫২	৩৩০	৩৩০	৭৫০	৬০০	১০৮০	৯৩০	১৭৫	২০৪
১৯৫২-৫৩	২৯০	২৯০	৫৫০	৫৫০	৮৪০	৮৪০	২০৩	১৪৯
১৯৫৩-৫৪	১৩৮৫	৬৫৪	১৭৭৮	১৩৫৬	৩১৬৩	২০১০	৩০২	৬৭৫
মোট	৩০২৬	১৪৭৪	৫০৭১	৪১৩৩	৮০৯৭	৫৬০৭	৭৩৮	১৪৭৯

উৎস : Government of East Pakistan, *A Handbook of Comparative Statistics of East and West Pakistan* (Dacca: Planning and Development, 1968), pp.269-270.

[৫৬] আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১০১।

[৫৭] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি* ১৯৫৩-১৯৬৬, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমানভাবে বাণিজ্যিক কোম্পানী গড়ে ওঠেনি। পূর্ববাঙলায় কতিপয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় একেবারে নগণ্য।

সারণি ১১

১৯৪৯/৫০-১৯৫৩-৫৪ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়ী কোম্পানী (Joint-stock Company)

বছর	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৯-৫০	২৬০২	৯২৬	১৬৭৬
১৯৫০-৫১	২৭৬৪	৯৮৪	১৭৮০
১৯৫১-৫২	২৯৭৭	১০৬০	১৯১৭
১৯৫২-৫৩	৩৬৭২	১৬২৯	২০৪৩
১৯৫৩-৫৪	৩৩৩৬	১৩৬৫	১৯৭১
মোট	১৫৩৫১	৫৯৬৪	৯৩৮৭

উৎস : Government of Pakistan, 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967 (Karachi : Central Statistical office, 1968), p. 271.

ব্যবসা-বাণিজ্যতে বৈষম্য

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক ও আন্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি অবলম্বন করায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১২

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের হিসাব (কোটি টাকা হিসেবে)

বছর	রফতানি আয়		আমদানি ব্যয়		আন্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্য	
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি	পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি
১৯৪৭-৪৮	২৭২	৪৪৪	৪০	৩১৮	১৯	১৪০
১৯৪৮-৪৯	১৩২৮	৫৪২	২৪২	১১৭৭	৫০	২৩৫
১৯৪৯-৫০	৬৮৩	৫৩৪	৩৮৫	৯১২	৬২	২৭২
১৯৫০-৫১	১২১১	১৩৪২	৪৫৩	১১৬৭	-	-
১৯৫১-৫২	১০৮৭	৯২২	৭৬৩	১৪৭৪	১৪৯	২১৮
১৯৫২-৫৩	৬৪২	৮৬৭	৩৬৬	১০১৭	১৫১	৩৮৭
১৯৫৩-৫৪	৬৪৫	৬৪১	২৯৪	৮২৪	১৯৮	৩০৫

উৎস : Government of Pakistan, 20 Years of Pakistan in Statistics 1947-1967 (Karachi : Ministry of Economic Affairs. Central Government of Pakistan, Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Years Plan, vol. I (Islamabad: Planning Commission, 1970), p. 144.

পাকিস্তানের বাহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। দুই অঞ্চলের আমদানি-রফতানি পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত দফতর থেকে পরিচালিত হতো। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু দফতর পূর্বাঞ্চলে স্থাপিত হয়। তবে সাধারণত এগুলো হয় সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। আমদানি ব্যবসার জন্য একটি বিস্তৃতি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু ছিল। রফতানি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ হতো শুল্ক বহাল করে অথবা বিশেষ উৎসাহী ব্যবস্থা চালু করে। তার ফলে যদিও বহির্বাণিজ্য পুরোপুরি ব্যক্তি মালিকানা খাতেই অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু কি ধরনের দ্রব্যাদি বাণিজ্যে ভূমিকা রাখবে তা মোটামুটিভাবে সরকারই নির্ধারণ করে দিত। পাকিস্তানের শুরুতে রফতানি বলতে শুধু কাঁচামালের রফতানিই ছিল, যেমন পাট, চা, তুলা, উল বা চামড়া। শিল্পায়নে সামান্য অগ্রগতি হলেই প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদির রফতানি

Dhaka University Institutional Repository

শুরু হয়। বিশেষ করে সুতা ও কাপড় এবং পাটজাত দ্রব্য। ষাটের দশকে অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত সামগ্রীর রফতানিও শুরু হয়।[৫৮] পূর্ববাঙলার পাট শিল্প থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাকে পূর্ববাঙলায় ব্যয় না করে তা পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগ করা হতো। এ ব্যাপারে যুক্তি দেখানো হতো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নত অর্থ ব্যবস্থায় নতুন অর্থ বিনিয়োগ করলে বেশী মুনাফা পাওয়া যায়। আর পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান থাকার ফলে এক অংশের ব্যবসালব্ধ মুনাফা অপর অংশে পৌঁছাও সম্ভবপর ছিল না। গোটা পাকিস্তানের ব্যাংক ও ইনসুরেন্স কোম্পানিগুলোর অর্থ (Fund) যথাক্রমে শতকরা ৮০ ও ৮৫ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানি ২০টি পরিবার নিয়ন্ত্রণ করত।[৫৯] তারাই কেবল বড় বড় শিল্প উদ্যোগ ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে পারত। বাঙালিরা পর্যাপ্ত আর্থিক সচ্চলতার অভাবে এ সুযোগ ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্পদের এ অসম বণ্টন এবং পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান এক ভারসাম্যহীন অর্থনীতির ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

> "The worst victim of this lopsided economic policy was the East Bengal region. The West Pakistan-based industrial elite, and their co-planners in the civil service and foreign advisory groups, were able to reduce East Bengal to a client colony." [৬০]

পূর্ববাঙলার অর্থনীতি এ ধরনের হওয়ার আরেকটি কারণ হলো ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় পর্যন্ত পূর্ববাঙলা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়।

---

[৫৮] আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১১১।

[৫৯] Hassan N. Gardezi, *op. cit.*, p. 140, কিন্তু ছদ্রুদ্দীন ২২টি পরিবারের কথা বলেন। ছদ্রুদ্দীন বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, (ঢাকা, ১৯৭৫) পৃ. ১২।

[৬০] Hassaan N. Gardezi, Neocolonial Alliances and the crisis of Pakistan in Kathleen Gough and Hari, *op. cit.*, p. 140

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১৩

১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত পাকিস্তানের ব্যালেন্স পেমেন্ট (কোটি রুপি হিসেবে)

সময় (মার্চ-এপ্রিল)	ব্যবসার হিসাব						অদৃশ্য
	আমদানির জন্য প্রদানকৃত অর্থ						
			সরকারি হিসাব				
	রপ্তানীর জন্য প্রাপ্ত	বেসরকারি হিসাব	প্রতিরক্ষা মওজুদ	সরকারি হিসেবে অন্যান্য আমদানী	মোট প্রদানকৃত অর্থ	ব্যালেন্স	বেসরকারি খাতে অদৃশ্য থেকে প্রাপ্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৪৮-৪৯							
পূর্ব পাকিস্তান	১৪৭.৪৭	২৪.৩৮	০.১৩	১.২৬	২৫.৭৭	+১২১,৭০	১৩.৯০
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৮.৪১	৯৪.৮৭	৮.৯২	৭.৭৬	১১১.৫৫	-৪৩.১৪	৬৬.৫২
মোট, পাকিস্তান	২১৫.৮৮	১১৯.২৫	৯.০৫	৯.০২	১৩৭.৩২	+৭৮.৫৬	২০.৪২
১৯৪৯-৫০							
পূর্ব পাকিস্তান	৬৫.০২	৪২.৩৫	০.১৭	২.৮৩	৪৫.৩৫	+১৯.৬৭	৩.৮৯
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৬.৭৫	৯০.৪৯	১৩.২২	৪.৮২	১০৮.৫৩	-৪১.৭৮	৪.০০
মোট, পাকিস্তান	১৩১.৭৭	১৩২.৮৪	১৩.৩৯	৭.৬৫	১৫৩.৮৮	-২২.১১	৭.৮৯
১৯৫০-৫১							
পূর্ব পাকিস্তান	১১১.৭০	৩৫.৯৬	০.৪১	২.৭০	৩৯.০৭	+৭২.৬৩	৭.০৯
পশ্চিম পাকিস্তান	১৪৬.৬২	৯৯.২৪	১১.৮৭	১৩.৭৮	১২৪.৮৯	+২১.৭৩	৯.৩০
মোট, পাকিস্তান	২৫৮.৩২	১৩৫.২০	১২.২৮	১৬.৪৮	১৬৩.৯৬	+৯৪.৩৬	১৬.৩৯
১৯৫১-৫২							
পূর্ব পাকিস্তান	১৪০.০৬	৫৮.৩০	০.৮৩	৭.৭৮	৬৬.৯১	+৭৩.১৫	১২.৮৪
পশ্চিম পাকিস্তান	৯৮.৯৯	১২১.৬৬	১৮.০০	৫.১৫	১৪৪.৮১	-৪৫.৮২	৯.০৭
মোট, পাকিস্তান	২৩৯.০৫	১৭৯.৯৬	১৮.৮৩	১২.৯৩	২১১.৭২	+২৭.৩৩	২১.৯১
১৯৫২-৫৩							
পূর্ব পাকিস্তান	৬৭.১৩	৪৫.৫২	০.৮৫	৬.৯০	৫৩.২৭	+১৩.০৬	৭.৬৮
পশ্চিম পাকিস্তান	৮৯.৫৭	৯২.৬৬	১৮.৪৩	২৭.০৯	১৩৮.১৮	-৪৮.৬১	১০.২৫
মোট, পাকিস্তান	১৫৬.৭০	১৩৮.১৮	১৯.২৮	৩৩.৯৯	১৯১.৪৫	-৩৪.৭৫	১৭.৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১৩ চলমান

হিসাব					অর্থায়নের ধরন : ঘাটতি মূলধন প্রবাহ					
ট্রেড এজেন্সি, ছাত্র, কূটনৈতিক মিশনের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় এবং বেসরকারি খাতে অদৃশ্য প্রদানকৃত অর্থ										এ তিন ধরনের হিসেবের ব্যালেন্স
বেসরকারি খাত	সরকারি খান	মোট প্রদানকৃত অর্থ	ব্যালেন্স	অদৃশ্য হিসাব ও ব্যবসার মোট ব্যালেন্স	স্থানীয় মুদ্রার রাজস্বের সমন্বয়	বৈদেশিক মুদ্রায় রাজস্বের সমন্বয়	রিজার্ভ থেকে উত্তোলন	বিদেশি সাহায্য উত্তোলন ব্রিটিশ মুদ্রা ও শরণার্থীদের মূলধন ইত্যাদি	মূলধন প্রবাহ	
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২.৯৫	১.৬১	৪.৫৬	+৯.৩৪	+১৩১.০৪	-১৩.০৪	-	+০.৫৮	-	১৩১.৬২	-০.৫৮
১১.৮৬	১.৬১	১৩.৭	-৬.৫৫	-৪৯.৬৯	+১৩.০৪	-	+৪৯.৬৯	-	-	-৪৯.৬৯
১৪.৪১	৩.২২	১৭.৬৩	+২.৭৯	+৮১.৩৫	-	-	+৫০.২৭	-	১৩১.৬২	-৫০.২৭
৫.৭৫	০.৯৮	৬.৭৩	-২.৮৪	+১৬.৮৩	-২০.৩২	-১৬.৮৩	-	-	-	-
১৫.১২	০.৯৮	১৬.১০	-১২.১০	-৫৩.৮৮	+৪০.৩২	+১৬.৮৩	+৩১.৪৭	৫.৫৮	-	৩১.৪৭
২০৮৭	১.৯৬	২২.৮৩	-১৪.৯৪	-৩৭.০৫	-	-	+৩১.৪৭	+৫.৫৮	-	-৩১.৪৭
৩.৮৪	১.২৬	৫.১০	+১.৯৯	+৭৪.৬২	-২১.৩৩	-২১.৩৩	-২১.৫৫	-	৩১.৭৪	+২১.৫৫
১৫.০৪	১.২৬	১৬.৩০	-৭.০০	+১৪.৭৩	+২১.৩৩	+২১.৩৩	-৩৬.০৬	-	-	+৩৬.০৬
১৮.৮৮	২.৫২	২১.৪০	-৫.০১	+৮৯.৩৫	-	-	-৫৭.৬১	-	৩১.৭৪	+৫৭.৬১
১০.৫৬	১.৭৫	১২.৩৪	+০.৫০	+৭৩.৬৫	-৩৪.৯৫	-১৬.৯৭	-	-	৫৬.৬৮	-
২৪.৮৫	১.৭৫	২৬.৬০	-১৭.৫৩	৬৩.৩৫	+৩৪.৯৫	+১৬.৯৭	+৬৪.৩৮	-	-	৪৬.৩৮
৩৫.৪৪	৩.৫০	৩৮.৯৪	-১৭.০৩	+১০.৩০	-	-	+৪৬.৩৮	-	৫৬.৬৮	-৪৬.৩৮
৫.৮৭	১.৪০	৭.২৭	+০.৪১	+১৪.২৭	-০.৫২	-০.৫২	-	-	১৩.৭৫	-
১৭.৪৫	১.৪০	১৮.৮৫	-৮.৬০	-৫৭.২১	+০.৫২	+০.৫২	+৪০.৭৯	+১৫.৯০	-	-৪০.৭৯
২২.৩২	২.৮০	২৬.১২	-৮.১৯	-২৪.৯৪	-	-	+৪০.৭৯	+১৫.৯০	১৩.৭৫	-৪০.৭৯

উৎস :Government of East Pakistan, *Statistical Abstract for East Pakistan Containing Statistical Data on Various Subjects for the Years 1949-50 to 1953-54 vol. III* (Dacca: The Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, (Planning Department), 1956), pp/ 276-277.

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্ব আয় ও ব্যয়

অর্থনৈতিক দিকেও প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আয়ের মূল উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে দেয়া হয়েছিল, তথাপি উক্ত আয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বণ্টনের একটা বিধি ছিল। স্বাধীনতার পর আয়কর পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যায়। বিক্রয় কর, যা ইতিপূর্বে Jute export duty-এর কমপক্ষে ৫০% পাট রফতানিকারী প্রদেশ লাভ করত। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ওই নিয়ম বদলানো হয় এবং প্রদেশ কতভাগ পাবে তা গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়।[৬১] এ প্রসঙ্গে পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ও গণপরিষদের ১৯৫১-৫২ সালে বাজেট অধিবেশনে পূর্ববাঙলার অর্থনৈতিক করুণ দশার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পূর্ববাঙলার বাজেট ঘাটতি বছর প্রতি ৪/৫ কোটি টাকার। কিন্তু এই ঘাটতি প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য ছিল না, এটা ছিল প্রদেশের আয়ের উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেয়ার কারণে।[৬২]

১৯৪৮-৪৯ অর্থ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬.৯১ কোটি রুপি রাজস্ব আয় হয় এবং ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয় ২৩.০১ কোটি রুপি। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সম্প্রসারণ কম ঘটেও রাজস্ব সংগ্রহের অন্যান্য খাত কম থাকায় পূর্ববাঙলায় কম রাজস্ব সংগ্রহ হয়। এটা সত্ত্বেও দেশের রাজস্ব বাজেটের একটি বড় অংশ পূর্ববাঙলা থেকে সংগৃহীত হতো। কিন্তু পূর্ববাঙলা থেকে সংগৃহীত এ রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পূর্ববাঙলায় ব্যয় করা হতো না।

---

[৬১] Golam Morshed, "Pakistan's 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh; A political Analysis", *The Journal of the Institutie of Bangladesh Studies*, vol. xi, 1988. আরও দেখুন, ড. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), পৃ. ১০৪।

[৬২] ড. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১৪

১৯৪৮/৪৯-১৯৫২-/৫৩ সময় পর্বে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসেব (মিলিয়ন রুপি হিসেবে)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	ব্যালেন্স	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	ব্যালেন্স
১৯৪৮-৪৯	১৬৯.১	১৬০.৫	৮.৬	২৭৯.৫	৩০১.৩	-১.৮
১৯৪৯-৫০	১৪৪.৩	১৭৮.৬	-৩৪.৩	২৯৯.৪	৩০৭.০	-৭.৬
১৯৫০-৫১	১৮২.০	১৯০.৩	-৮.৩	৩৫৯.৮	৩২৯.৭	৩০.১
১৯৫১-৫২	২০১.৬	২২৭.৫	-২৮.২	৪১১.৫	৩৭৬.৪	৩৫.১
১৯৫২-৫৩	২৩০.১	২৫৮.৩	-২৯.৯	৩৮৬.৩	৪১১.০	-৪.৭
মোট	৯২৭.১	১০১৫.২	-৬৮	১৭৫৯.৫	১৭৩৮	৭৬

উৎস : Government of East Pakistan, *A Handbook of Comparative Statistics of East and West Pakistan* (Dacca: Planning and Development, 1968), pp.279-285.

অপরদিকে ১৯৪৮-৪৯ অর্থ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজস্ব আয় হয়েছে ২৭.৯৫ কোটি রুপি ও ব্যয় করা হয়েছে ৩০.১৩ কোটি রুপি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে রাজস্ব অর্জিত হয় তা সবই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় এবং ওই অর্থের অঙ্ক বাড়িয়ে খরচ করা হয়। এ বাড়তি অর্থ পূর্ব পাকিস্তান থেকে নেয়া হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য ১৯৫১-৫২ অর্থ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। কেবল ১৯৫২-৫৩ অর্থ বছরে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এ বছর পূর্ববাঙলায় পূর্ববর্তী বছরগুলোর থেকে বেশি রাজস্ব উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়।

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাস্তিানে ব্যয়ের পরিমাণ ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা – এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

অংশ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। যার ফলে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশাল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।[৬৩]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বাজেট বরাদ্দের বৈষম্যের আরেকটি নমুনা নিম্নরূপ :

এবারের (১৯৫১ উদ্বৃত্ত পাক বাজেটে শিক্ষাখাতে কোন প্রদেশের জন্য কত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তাই দেখা যাক : করাচি ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার, মাথাপিছু ৪ টাকা ৩ আনা ৩ পাই; সিন্ধু ১০ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৬ পাই; সীমান্ত প্রদেশ ১১ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই; পূর্ববঙ্গ ৭১ হাজার, মাথাপিছু ১ পাইয়ের ৩ ভাগের ১ ভাগ।[৬৪]

চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য

প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আরেকটি মাধ্যম ছিল কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যবর্গ। প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাদের চাকরি ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ-নিষেধ মানতেন না। ফলে প্রদেশে আমলাতন্ত্র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আমলাগোষ্ঠীতে পূর্ববাঙলার কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ববাঙলা সচিবালয়ে একজন বাঙালি সচিবও ছিলেন না। অবাঙালি সচিবগণ পূর্ববাঙলার স্বার্থকে কখনই বিবেচনায় আনতেন না, বাঙালি অফিসারদের সঙ্গেও তারা ভাল ব্যবহার করতেন না। তারা ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। চাকরি বা কর্মসংস্থানের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয় ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ সরকারি বিভিন্ন উচ্চপদে পাঞ্জাবিরা তাদের পূর্বেকার একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখার ধারা অব্যাহত রাখে। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলিমরা এ সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে যেমন বঞ্চিত ছিল ঠিক তেমনি এ সময়ও বঞ্চিত হয়। দেশ বিভাগের সময় বাঙালি হিন্দুদের দখলে থাকা সহকারী সচিব, রেজিস্ট্রার[৬৫] ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের উচ্চ পদগুলো পাকিস্তান আমলে শূন্য হলেও বাঙালি মুসলিমরা তাতে নিয়োগ লাভে সমর্থ হননি,

---

[৬৩] Talukder Maniruzzaman, The Politics of Development: The case of Pakistan, 1947-58 (Dacca: Green Book House Ltd., 1971), p. 43.

[৬৪] বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫) পৃ.৪০।

[৬৫] Safdar Mahmood, Pakistan Divided (Islamabad: Alpha & Brao, 1988), pp. 6-7.

Dhaka University Institutional Repository

বরং ঐ পদগুলোতে অবাঙালি মুসলিমরা নিয়োগ লাভ করেন। অধিকন্তু, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালি মুসলিমদের যোগদানের ক্ষেত্রে ছিল অনেক প্রতিবন্ধকতা। এ সিভিল সার্ভিসটি একজন বাঙালি মুসলিমও ৮২ জন অবাঙালি মুসলিম সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলে[৬৬] বাঙালিদের জন্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বাঙালি-অবাঙালি ভারসাম্যহীনতা দূর করার আশু উদ্যোগ ও মনোভাব কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না। বাঙালিদের "পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস"-এ প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য যে কোটা পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে মানা হয়নি; অনেক অবাঙালি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে পূর্ববাঙলা থেকে ডমিসাইন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ঐ সার্ভিসে প্রবেশ করে।[৬৭] আবার সরকারিভাবে কোটা হ্রাস করে শতকরা ২০ ভাগ মেধারভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার বিধান চালু করলে কোন বাঙালি পরীক্ষায় প্রথম হয়েও শীর্ষপদে নিয়োগ পাননি।

১৯৪৭ সাল থেকে এ অবস্থা চলতে থাকে এবং ১৯৫৩ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয় তখন ওই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৫৬ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন পদে বাঙালিদের উপস্থিতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় অনেক কম।

সারণি ১৫

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যের খতিয়ান

পদবী	সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
সচিব	১৯	-	১৯
যুগ্ম-সচিব	৪১	৩	৩৮
উপ-সচিব	১৩৩	১০	১২৩
সহকারী সচিব	৫৪৮	৩৮	৫১০
মোট	৭৪১	৫১	৬৯০

উৎস : Muzaffar Ahmed Chaudhuri, *The Civil Service in Pakistan*, 2nd Edn. (Dacca: National Institute of Public Administration, 1969), p. 86.

[৬৬] Khalid Bin Sayeed, Pakistan, *The Formative Phase*, p. 275.
[৬৭] A. K. Chowdhury, *The Independence of East Bengal*, (Dhaka: Jatya Grantha Kendra, 1984), p. 213.

বাঙালিদের এ আনুপাতিক হার কম হওয়ার একটি কারণ ছিল যে, দেশ বিভাগের (১৯৪৭) সময় সাবেক ভারত সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত যে সকল মুসলিম সদস্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য চলে আসেন এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন তারা নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে হওয়ার কারণে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকনে। ফলে ওই সিভিল সার্ভিসে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা বাঙালিদের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি হয়। এছাড়া অনেক বাঙালির ক্ষেত্রে প্রায় এক হাজার মাইল বিদেশি রাষ্ট্রসীমা অতিক্রম করে করাচীতে গিয়ে ওই সিভিল সার্ভিসে যোগদান ও একটি কঠিন ব্যাপার ছিল।[৬৮] সিভিল সার্ভিস ছাড়া অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রেও পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ১৬

১৯৪৭-৫৬ সময়ে সামরিক বিভাগে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব

পদের নাম	পূর্ববাঙলা	পশ্চিম পাকিস্তান
লে. জেনারেল	-	৩
মেজর জেনারেল	-	২০
বিগ্রেডিয়ার	১	৩৪
কর্নেল	১	৪৯
লে. কর্নেল	২	১৯৮
মেজর	১০	৫৯০
বিমান বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা	৬০	৬৪০
নৌ বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা	৭	৫৯৩
মোট	৮১	২,১২৭

উৎস : Ram Krishna Mukherjee, "The Social Background of Bangladesh" in Kathleen Gough and Hari P. Sharma (ed.) Imperialism and Revolution in South Asia, (New York and London, Monthly Review Press, 1973), p. 410

[৬৮] Muzaffar Ahmed Choudhuri, *The Civil Service in Pakistan* 2nd Ed n, (Dacca : National Institute of Public Administration 1969), p. 58.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ববাঙলা থেকে ভাল ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের কেবল পাঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করা যেতো তাহলে পূর্ববাঙলা অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত। পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র আলাদাভাবে দেখানো সম্ভব না হওয়ায় এবং তা বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে এক কথায় পশ্চিম পাকিস্তান নামে উল্লেখ করায় পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম স্পষ্ট হয়েছে বলে অনুমেয় হয়। এভাবে দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর থেকে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাঙলার অর্থনীতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাঙালিরা অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি নিয়ে যে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এখন তাঁরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ওপর আর আস্থা রাখতে পারলেন না। আবার বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের আগ্রাসন নীতি এ অবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেয়।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

রওনক জাহান তাঁর *Pakistan Failure in National Integration* বইতে Joseph R. Strayer উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে,

> . . . those which correspond closely to old political units; those where the experience of living together for many generations within a continuing political framework has given the people some sense of identity; those where the political units concide roughly with a distinct cultural area; and those where there are indigenous institutions and habits of political thinking that can be connected to forms borrowed from outside.[69]

আবুল মনসুর আহমদ বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান একদম জোট বাঁধা এক-রংগা একটি ভূখণ্ডের একটি প্রদেশ। আর পশ্চিম পাকিস্তান পাঁচ ভাগে বিভক্ত পাঁচ রংগা একটি প্রদেশ।[৭০]

[৬৯] Joseph R. Stayer, ''The Historical Expereience of Nation-building in Europe," p. 25. See also, Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, Columbia University Press, USA, 1972. p. 9.

[৭০] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর প্রথমেই পূর্ববাঙলার মানুষের ওপর ভাষা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ বহু ভাষাভাষীর দেশ পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। (সাবেক) পাকিস্তান-পূর্বকালেই মুজীবুর রহমান খা তাঁর পাকিস্তান শীর্ষক গ্রন্থে পাকিস্তানের (সাবেক) রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। হাবীবুল্লাহ বাহার, তালেবুর রহমান প্রমুখের পাকিস্তান সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং আব্দুল হক ফররুখ আহমদ প্রমুখ আরও অনেকের রচনায় বিভাগ পূর্ব কালেই (সাবেক) পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৯৫০ সালে (১৯৪৩) একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৫০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীর্ষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বিভাগ-পূর্বকালেই বলেন : "মুসলিম লীগ রাজনীতিতে 'জাতীয়তার' যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে।"[৭১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে চাপিয়ে দেয়ার বিপদ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৩ সালেই বলেছিলেন :

"এতে করেও বাংলার চার কোটি বাঙলাভাষী মুসলিম জনসাধারণ হাজার বছরেও উর্দু ভাষী হবে না ... লাভের মধ্যে হবে এক শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগ থাকবে না, এ কথাও আগে বলেছি। কিন্তু এরা পশ্চিমাদের গলার সুর মিলিয়ে উর্দুর মাহাত্ম গেয়ে যাবেন। কারণ এরাই হবেন পশ্চিমাদের এদেশী আত্মীয় এবং পূর্ব-পাকিস্তানের এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শাসক শ্রেণী। শাসক শ্রেণীর ভাষা থেকে জনসাধারণের ভাষা পৃথক থাকার মধ্যে মস্ত বড় একটি সুবিধে আছে। তাতে অলিগার্কী ভেঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনদিন আসতে পারে না; সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রোকাওট হিসাবে রাজনৈতিক মতলবে এই অভিজাত শ্রেণী উর্দুকে বাঙলার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবেন। শুধু চাকরিতেই নয়, আইনসভার মেম্বারগিরিতেও যোগ্যতার মাপকাঠি হবে উর্দু-বাগ্মিতা। সুতরাং সেদিক দিয়েও এই

[৭১] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাগত আভিজাত্যের স্টিলফ্রেম ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করবার চেষ্টার বিপদ এই খানে। ... অথচ উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়নে হাত দিতে পারব। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করব। জাতির যে অর্থ শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।" (পূর্ব-পাকিস্তানের জবান, *মাসিক মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৫০)।[৭২]

দেশ বিভাগ এবং সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত ১৩৫১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্টতই বলেছিলেন:

"রাজনীতিকের বিচার (সাবেক) 'পাকিস্তানের' অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারেল অটনমি। রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পারে কি না সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য .... বাঁচাত পরের কথা .... জন্মাতেই পারে না। – পাকিস্তান (সাবেক) ও একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষত: রবীন্দ্রনাথ এ সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছেন। তবুও এ সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ প্রাণ প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এ সাহিত্যের স্রষ্টাও

[৭২] *ঐ*, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয় এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়। প্রথমত এ সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ সাহিত্য হিন্দু মনীষার সৃষ্টি। সুতরাং স্বভাবতই হিন্দু-সংস্কৃতিকে বুনিয়াদ করে তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা করেছেন। নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না ... কিন্তু সত্য কথা এই যে, ঐ সাহিত্যকে মুসলমানেরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করে না। কারণ, ত্যাগ বৈরাগ্য ভক্তি প্রেম যত উঁচু দরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। – সাহিত্য স্পিরিট সম্বন্ধে যা বলেছি বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্মভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো তবে যে সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কিরূপে? আমার ঐতিহ্য আমার ইতিহাস আমার ইতিকথা এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে সাহিত্য আমার জীবন উৎস হবে কেমন করে? ... সব জাতীয় চেতনাই তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে। ততদিন সে সাহিত্য থেকে কখনো জাতি প্রেরণ পাবে না। একটা অতি আধুনিক নজির দিচ্ছি। ইংরেজি সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন শেক্সপিয়র স্কট শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অতবড় সাহিত্য ও আইরিশ জাতির প্রেরণা জাগাতে পারেনি। সুইফট, বার্কলে, গোল্ড স্মিথ ও বার্নাডশ'র মতো অনেক প্রতিভাবান আইরিশ ইংরেজি সাহিত্যের সেবা করেছেন। বিশ্বজোড়া নামও করেছেন।

কিন্তু তাদের সাহিত্য সেবা হয়েছে লন্ডনে বসে আয়র্লন্ডের মাটিতে নয়। আয়ারলন্ড বাসীর জাতীয় জীবনে যে সাহিত্য কোন স্পন্দন সৃষ্টিও করতে পারেনি। তাই পার্নলে, ড্যাভিট, রেডমন্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ, কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তি আন্দোলন সফল করতে পারেনি। অথচ যে দিন আয়র্লন্ডের জাতীয় কবি ডব্লিউ বি, ইয়েটস ইংরেজ প্রভাবমুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ সাহিত্য সাধনাকে কেলন্টিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রূপ দান করলেন, সেদিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল; নবজন্মের আনন্দে সে মেতে উঠল; নিজের ভাগ্য-নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হয়ে গেল, তার ফল এই যে, আইরিশ জাতির দু'শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা আন্দোলন ডিভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।[৭৩]

[৭৩] ঐ, পৃ. ১৪।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ওই বছরের জুলাই মাসেই ভাষা সংক্রান্ত বিরোধের সূচনা হয়।[৭৪] বাংলা ভাষার সংগ্রামকে সক্রিয় করার উদ্দেশে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকার ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যথা : তমুদ্দন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হলসহ অন্যান্য ছাত্রাবাস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্র ফেডারেশন নামক কমিউনিস্ট দলের ছাত্র সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।[৭৫] এরপর ১৯৪৮ সালের ২৩ মার্চ পূর্ববাঙলার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও সরকারি ভাষা করার দাবি জানালে এ বিরোধের নতুন মাত্রা যোগ হয়।[৭৬] এর কারণ গণপরিষদের অবাঙালি সদস্যরা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে ও ভোটের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও বিষয়টি পুরোপুরি নাকচ করে দেন। এতে পূর্ববাঙলায় প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। যদিও পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% ভাগ লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দু তথাপি উর্দুকেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার এক চেষ্টা চলছিল।[৭৭] পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়।

এ আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করলে তা শান্ত করার উদ্দেশে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকায় আসেন এবং ২১ মার্চ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক জনসভায় ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে ঘোষণা দেন।[৭৮]

---

[৭৪] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৭।

[৭৫] সাপ্তাহিক নওবেলালের প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত সম্পাদকীয় -এর উদ্বৃতি দেখুন, স্বাধীনতার দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬।

[৭৬] Safdar Mahmood, *Pakistan Divided*, (Islamabad: Alpha a Bravo, 1983), p. 8 and Rounaq Jahan, *op. cit*., p. 43.

[৭৭] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, পৃ. ৮৭।

[৭৮] বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষার দাবি বিষয়ক স্মারকলিপি পেশ করা হয় এই সাক্ষাতকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি পেশ করা হয় –

প্রথমত : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমত: তাঁহারা মনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ায় অধিকাংশ লোকের দাবি মানিয়া লওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়: বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যান্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজি ও আফ্রিকান ভাষা), মিশর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজি ভাষা), এতদ্ব্যতীত সোভিয়েত রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়ত: এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্র ভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেয়া হইয়াছে।

চতুর্থত: আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনা সম্ভার দ্বারা এ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

পঞ্চমত: বাংলার সুলতান হুসেন শাহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।

উপসংহারে আমরা বলিতেছি যে, যেকোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্যে এ আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।[৭৯]

[৭৯] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন এক পর্যায়ে স্থিমিত হয়ে যায় এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। এখানে উল্লেখ্য, পূর্ববাঙলায় এ ধরনের শান্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নতুন করে আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশে ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ মওলানা আকরাম খার নেতৃত্বে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করে বাংলা বর্ণমালাকে আরবীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এমনকি ওই সরকার মুদ্রা, ডাক টিকেট ও চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় 'উর্দু' চালু করে। এতে পূর্ববাঙলায় আন্দোলন দানা বাধলেও তেমন উল্লেখযোগ্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর খাজা নাজিমুদ্দীন ২৭ জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় এসে "উর্দুই হবে পাকিস্তানর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে ঘোষণা দিলে পূর্ববাঙলায় এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল, সভা, পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে ছাত্রসহ কয়েকজন যুবক নিহত হয়।[৮০] এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে এক মারাত্মক হুমকি স্বরূপ দেখা দেয়। গ্রামের সাধারণ মানুষও এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এ কথা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলা যায় যে ভাষাগত বিরোধ বাঙালি ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অবিশ্বাস ও তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে এর ওপর ভিত্তি করে পূর্ববাঙলায় এক ভাষাগত জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন শাসন-শোষণ এবং অগণতান্ত্রিক ও অনুদার নীতিই পূর্ববাঙলার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে জোট বেঁধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে তাঁরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ইউনুস সামাদের ভাষায়,

> Karachi's efforts to impose central authority on the province were also responsible for the re-emergence of Bengali ethnicity. The centre's control of the economy and its inflexibility or the language and constitutional controversies became key issues in East Pakistan. The centre's policies on these questions eroded the credibility of the provincial Muslim League and acted as a catalyst for the centrifugal forces.[81]

[৮০] বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩-২০১।

[81] Yunas Samad, *A Nation in Turmoil Nationalism and Ethnicity in Pakistan, 1937-1958,* (New Delhi: Sage Publications, 1995), p. 153.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পূর্ববাঙলায় সাধারণ নির্বাচন হবে ঘোষণা করা হল। আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এ সমন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।[১] কারণ ১৯৪৫-৪৬ সালে নির্বাচিত সদস্যরা ১৪ আগস্ট (১৯৪৭) Provincial Legislative Assemblies Order ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ববাঙলার বৈধ আইন পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন।[২] তাঁদের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই পূর্ববাঙলার সাধারণ লোক বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের মাঝে পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক দল নামে একটা রাজনৈতিক দল করা হয়েছিল তা কাগজপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তখন পর্যন্ত এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের। পাকিস্তান হওয়ার পর আর তিনি কোনো রাজনীতি করেন নাই। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।[৩] অন্যদিকে মওলানা ভাসানী ও জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এবং ছাত্র-তরুণদের সক্রিয় সমর্থনে ইতিমধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ খুবই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মুসলিম লীগের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়েছিল ভীষণভাবে। মোহন মিয়া সাহেব নুরুল আমিন সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রুপ সৃষ্টি করেন এবং হক সাহেবকে মুসলিম লীগে সভাপতি করতে চেষ্টা করে পরাজিত হন। কার্জন হলে দুই গ্রুপের মধ্যে বেদম মারপিটও হয়। নূরুল আমিন সাহেবের দলই জয়লাভ করে। ফলে মোহন মিয়া ও তার দলবল লীগ থেকে বিতাড়িত হলেন। এরপর আমি (শেখ মুজিবুর রহমান) হক সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে তাকে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে অনুরোধ করলাম চাঁদপুরের এক জনসভায় তিনি যোগদানও করলেন। সেখানে ঘোষণা করলেন, "যাঁরা চুরি করবেন তাঁরা মুসলিম লীগে থাকুন, আর যাঁরা ভাল কাজ করতে চান তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।" আমাকে ধরে জনসভায় বললেন, "মুজিব যা বলে তা আপনারা শুনুন। আমি বেশি বক্তৃতা করতে পারব না, বুড়া মানুষ।" এ বক্তৃতা

[১] Najma Chowdhury, *op. cit.*, p. 165.
[২] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০১২, পৃ. ২৪৪।
[৩] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

খবরের কাগজেও উঠেছিল।[৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত হক সাহেব কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে একটি পার্টি গঠন করলেন।[৫] সুতরাং হক সাহেবের সহযোগিতার খাতিরে একাধিক পার্টির সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করা ছাড়া উপায় থাকল না। যতই দিন যেতে লাগল, ছাত্র-তরুণ প্রভৃতি প্রগতিবাদী চিন্তাশীলদের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত জন-সাধারণের মধ্যে এরূপ যুক্তফ্রন্ট গঠন করার দাবি সার্বজনীন হয়ে উঠল।[৬]

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত যৌথ (গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট) পরিষদ জয়লাভ করার পর থেকেই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলে দেশের বৃহত্তর রাজনীতি থেকে স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায় :

> জনতা একদিনের জন্যও মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ববাঙলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য[৭] একটি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করার আওয়াজ তুলেছিল আর এই আওয়াজটি প্রথমে তুলেছিল পূর্ববাঙলার ছাত্র সমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট এ ব্যাপারে পথ দেখায়। দেশের বিবাদমান রাজনীতিতে অনৈক্য এবং বিভেদের কারণে সরকার ও মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এই অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথমে কতগুলি সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ছাত্রলীগ নেতৃত্বে তখনো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ মূল দল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে তখনো এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তৎকালীন আওয়ামী লীগ একজন নেতৃস্থানীয় নেতা অলি আহাদের ভাষ্যে তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে, "আমি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার বিরুদ্ধে আবার দৃঢ়মত প্রকাশ করি। ... আলোচনাকালে মজলুম জননেতা আমার সহিত একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নাই।"[৮]

ছাত্রলীগকে সক্রিয়ভাবে তৎপর হতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই কাউন্সিলেই আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে

---

[৪] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪।

[৫] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

[৬] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

[৭] শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫। আরও দেখুন, ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, পৌষ ১৪০৫, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৮৯।

[৮] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, ঢাকা, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

যোগদানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পূর্ব পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট বিরোধী লবিকেই আওয়ামী লীগে শক্তিশালী মনে হচ্ছিল।

তবে দলগতভাবে যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বেশি বিরোধী ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং তার নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ছাত্ররা এ ব্যাপারে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং শেরে বাংলার বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে তাঁর মতামত পরিবর্তন করলে ছাত্ররা তাঁকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করতে করতে ফিরে। ছাত্ররা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকেও রাজি করাতে দলীয় কার্যালয় ও বাসভবনে ধরনা দেয় এবং সম্মতি আদায় করে আনে। এই সময় ছাত্রলীগও সাংগঠনিকভাবে এ ধরনা দেয়া আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবির গড়ে তোলে। বলতে গেলে নির্বাচনের পুরো সাংগঠনিক কাজটা ছাত্ররা একাই করে।[৯]

ছাত্র-ইউনিয়ন ঘেরাওকারীদের কাছে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ফজলুল হকের সম্মতি এবং আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে জোট গঠনের বিষয় অনেকখানি এগিয়ে গেলেও ফজলুল হক নতুন জটিলতার অবতারণা করেন। তিনি নতুন করে প্রস্তাব দেন, যুক্তফ্রন্টে নেজামে ইসলাম দলকে নিতে হবে। এ দলকে ছাড়া তিনি যুক্তফ্রন্টে যাবেন না।

বস্তুত সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হতে যাচ্ছিল তাতে নেজামে ইসলামকে নেয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হককে ছাড়াও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ফলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সঙ্গে জড়িত দলগুলো নেজামে ইসলামকে নিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। তবে মুসলিম লীগ বিরোধী এই জোটে একটি ইসলাম দল থাকায় প্রচার কাজে তা কৌশলগত সুবিধা লাভ করে।[১০] কিন্তু নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্ট গঠনে সদস্য হয়েই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। নেজাম নেতা মাওলানা আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে আপত্তি তুললে শেরে বাংলা ফজলুল হক তাঁকে সমর্থন করেন। ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াই সম্পর্কে জটিলতার উপাখ্যানের অবতারণা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের মাওলানা ভাসানী, খেলাফতে রব্বানী পার্টির আবুল হাশিম, গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিকে জোটে নেয়ার পক্ষে জোর প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা অভিমত প্রকাশ

[৯] সাক্ষাতকার, আবদুল মতিন, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৫৪-৫৬)। আরও দেখুন, ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০।
[১০] ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

করেন, এছাড়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করে লাভ নেই। এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মুখে নতুন কর্তব্য এসে হাজির হয়। কারণ যুক্তফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে মূল কাজটিই সম্পাদন করে যাচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। প্রকাশ্য রাজনীতিতে কার্যত নিষিদ্ধ এই পার্টি যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তার মতাদর্শ প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কর্মরত শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা।[১১]

এই অবস্থায় আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, কোনকিছুর বিনিময়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনকে সফল করে তুলে মুসলিম লীগের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করে তুলতেই হবে। ফলে সিদ্ধান্ত হয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বাইরে রেখে তবু যুক্তফ্রন্ট গঠিত হোক। পার্টি নিজ প্রচেষ্টায় প্রার্থী দেবে এবং যুক্তফ্রন্টকেও সমর্থন করবে। কমিউনিস্ট পার্টির এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সফল গণতন্ত্রকামী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এ না হলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যেত। কমিউনিস্ট পার্টি স্বনামে ৫টি হিন্দু আসনে এবং ৩টি মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়। অন্যান্য কয়েকটি দলেও কমিউনিস্ট প্রার্থী ছিলেন। যুক্তফ্রন্টে সিদ্ধান্ত হয় যশোরের একটি আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবদুল হকের বিরুদ্ধে জোট কোনো প্রার্থী দেবে না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তা সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেন।[১২] আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতারা যুক্তফ্রন্ট গঠনে মূল নেপথ্য ভূমিকা পালন করলেও আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এই জোটের প্রধান সাংগঠনিক রূপকার। এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রধান ব্যক্তিত্ব। মাওলানা ভাসানী এই দুই ব্যক্তিত্বের মাঝে উভয় কুল রক্ষা করতেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের উদ্দেশে সমমনা দলসমূহ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৩]

---

[১১] ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

[১২] সাক্ষাতকার, মনি সিংহ, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি।

[১৩] ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় 'আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠন'।[১৪] মওলানা ভাসানীর ও জনাব ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি:

> "আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য মোছলেম লীগের বিরোধী দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি নূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে – একথা জানাইতে পারায় আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি। আমরা এক্ষণে মোছলেম লীগের বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের সহিত সংযোগ স্থাপনের এবং ঐ সকল দলের সহযোগিতায় একটি সম্প্রসারিত সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করিব। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আমরা অতঃপর সিলেকশন কমিটি অথবা পার্লামেন্টারি বোর্ডের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিব এবং বিস্তারিত কার্যসূচি নির্ধারণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভোটারগণ এই যুক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিবেন এবং সে মোছলেম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত কয়েক বছরে কুশাসনের দ্বারা দেশকে প্রায় দেওলিয়া এবং জনসাধারণকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহার মনোনীত প্রার্থীদিগকে পরাজিত করিবেন।"[১৫]

যুক্তফ্রন্টের আরেক শরিকদল – নিজামে এছলাম-এর পূর্ব নাম 'জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম'। ১৯৫৩ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্বপাক জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের দুদিন ব্যাপী অধিবেশন শেষে তাদের ধর্মীয় সংগঠনটিকে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করে এর নাম 'নিজামে এছলাম' রাখা হয় এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৬] অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজামে এছলাম ও উহার কার্যক্রম স্বীকার করিয়া নিজামে এছলাম দলের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাদের সহিত 'নিজামে এছলাম দল' যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে রাজি আছেন।[১৭]

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তে জনাব এ. কে. ফজলুল হক এক সাক্ষাতকারে বলেন, তিনি এবং ভাসানীর মওলানা এক তারে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতি মওলানা

---

[১৪] *আজাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৩।

[১৫] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭২।

[১৬] *আজাদ*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৩।

[১৭] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

আতাহার আলীকে এই যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অনুরোধ করিয়াছেন।[১৮] মওলানা আতাহার আলী যুক্তফ্রন্টে যোগদানে অমত করিবেন না বলিয়া জনাব ফজলুল হক আশা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝতে পেরে নেজামে এছলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল সেন মন্তব্য করেছেন,

> "However, as the political situation developed in favour of the UF, the conservative party, the NIP which was led by Maulana Atahar Ali, somehow managed to enter the said alliance." [১৯]

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নিজামে এছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[২০]

যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ। কিন্তু ফ্রন্টের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজামে এছলামীর নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় এই দলগুলিকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে কিথ ক্যালার্ড উল্লেখ করেছেন যে,

> The Ganatantri Dal had aligned itself with the United Front during the campaign and some of its members had secured United Front nominations for Muslim seats. It seems probable that a few members of the communist party also secured United Front nominations although this was not publicly announced.[21]

এ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল সেন উল্লেখ করেছেন, ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হয়।[২২] নাজমা চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, অনেক বামপন্থী নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[২৩]

---

[১৮] Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh* (Dhaka: UPL, 1986), p. 118.
[১৯] এ বিষয়ে মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি দেখুন, *আজাদ*, ৫ ডিসেম্বর।
[২০] Keith Callard, Pakistan – A Political Study (London: George Allen & Unwin Ltd., 1958), p. 58.
[২১] Rangalal Sen, *op. cit.*, p. 119.
[২২] Najma Chowdhury, *op. cit*., p. 169.
[২৩] *আজাদ*, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩। Najma Chowdhury, *op. cit*., p. 169. ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

নির্বাচনে খেলাফত রব্বানী পার্টিরও ইচ্ছে ছিল 'যুক্তফ্রন্ট'-এর শরিক দল হওয়ার। এই উদ্দেশে ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগ থার্ড লেনে পার্টির সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়ামের এক সভায় লীগ বিরোধী সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু খেলাফতে রব্বানী পার্টিকে 'যুক্তফ্রন্ট' ভুক্ত করা হয়নি। অগত্যা এই পার্টি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা মাত্র ১০টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং ২২৬টি আসনের জন্য রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।[২৪] তবে যুক্তফ্রন্ট দুটো, চারটি বা ছয়টি দল নিয়ে গঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ একে পাকিস্তান ধ্বংসকারী এক আঁতাত বলে প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে এবং সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ একে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের বিরোধী এক ঐক্যবদ্ধ নতুন শক্তির উত্থান বলে মনে করেন। "সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট" গঠনেও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এর কারণ হলো, তাঁরা মনে করেন যে, নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্য থেকে কারোরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না হতে পারে। এর ফলে নির্বাচনোত্তর কালে সরকার গঠনে ৭২টি অমুসলিম আসন থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে। এ কথা বিবেচনা করে যুক্তফ্রন্টের নেতারা গণসমিতি, কুমিল্লার অভয় আশ্রম এবং পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দকে "সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট" গঠন করতে পরামর্শ দেন।[২৫] উল্লেখ্য যে, এ সময় সংখ্যালঘুদের পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস গণসমিতি এবং তফসিলি জাতি ফেডারেশন প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অধিকন্তু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মিলে জোট গঠন করলে যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাকে সমর্থন করেন। তবে তাঁরা জানতেন যে, প্রধান নির্বাচনী লড়াই মুসলিম আসনেই হবে এবং তা নির্বাচনোত্তরকালে সরকার গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়টি ভালোভাবে জেনেও যুক্তফ্রন্টের নেতারা একেবারে চিন্তামুক্ত ছিলেন না। তাঁদের মনে প্রচণ্ড ভয় ছিল; মুসলিম আসনগুলো চরমভাবে যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। এর কারণ হলো, মুসলিম লীগ যেভাবে তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় জাতীয় ঐক্য ও সকল

[24] ড. মোহাম্মদ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি* ১৯৫৩-১৯৬৬, জোনাকী প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৪৬।
[25] Najma Chowdhury, *op. cit*., p. 164.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের সাহায্য সহযোগিতা চাচ্ছে তাতে নির্বাচনোত্তরকালে পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম লীগকে সমর্থন করবে এবং যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সরকার গঠন আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।[২৬] সুতরাং যুক্তফ্রন্টের নেতারা মনে করেন যে, যদি তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্বাচনী জোট গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তবে সম্ভবত নির্বাচনোত্তর কালে সরকার গঠনে যেমন নিজেদের কাজে লাগাতে পারবেন ঠিক তেমনি মুসলিম লীগের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে সমর্থন লাভ করে সরকার গঠনের সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দিতে পারবেন। নভেম্বর (১৯৫৩) মাসে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস পার্টি অন্যান্য সংখ্যালঘু দল নিয়ে জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়ে একটি পারস্পরিক সহযোগিতাবিষয়ক কমিটি গঠন করে। কিন্তু ওই দলগুলোর পক্ষে সম্মিলিত জোট গঠন করা সম্ভবপর হয়নি।[২৭] একইভাবে গণসমিতি, অভয় আশ্রম, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল নিয়ে সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে তার ওপর গণসমিতি ও নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলে।

এদিকে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে সংখ্যালঘু ফ্রন্টের কোনো সংযোগ ছিল কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন লক্ষণ ও উভয় জোটের তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছিল যে, সংখ্যালঘু ফ্রন্ট হলো যুক্তফ্রন্টের একটি অঙ্গ জোট।[২৮] অপরদিকে পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি সংখ্যালঘু জোটকে সমর্থন করে। তবে এ সংখ্যালঘু জোট যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা, সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দেশের শাসনকার্য সমান সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্যই যে জোট গঠন করেছে তা জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য, এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য যে পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু ছিল তা বাতিল করে। এর ফলে নির্বাচন প্রাক্কালে তাঁদের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কটা আরো সুদৃঢ় হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাচনী কাজ চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ও সৃষ্টি হয়। বস্তুত, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুক্তফ্রন্ট নেতাদের কাছাকাছি ছিলেন। তাছাড়া জনসংখ্যার দিক দিয়ে তাঁরা এক কোটি থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এজন্যই তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কিছুটা করলেও তাঁর

[২৬] Mohammad Ghulam Kabir, Minority Politics in Bangladesh (New Delhi: Vikas Publishing House Ltd., 1980), p. 43.

[২৭] ড. মোহাম্মদ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।

[২৮] *আজাদ* (ঢাকা), ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরসুরিরা কেউই এ ব্যাপারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাব জেগে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তা তাঁদেরকে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তোলে। তবে ডি. এন বারুইর নেতৃত্বে তফসিলী জাতি ফেডারেশনের একটি অংশ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয় এবং রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বাধীন অপর অংশটি যুক্তফ্রন্টের সমর্থন লাভ করে। জানা যায়, রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে এক সম্মেলনের আয়োজন করে ডি. এন. বারুইকে গণসমিতি থেকে বহিষ্কার করে। তবে ওই সম্মেলনের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যে, তা উদ্বোধন করেন এ. কে. ফজলুল হক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত থাকেন।

পূর্ববাঙলার প্রধান বিরোধী দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করলে তারা পাল্টা নির্বাচনী জোট মুসলিম লীগ ও তার সমর্থক দলগুলো করেনি। তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে দেখা গেল, ইসলামপন্থী কয়েকটি দল মুসলিম লীগকে সমর্থন করছে। এমনকি পাকিস্তানের বৌদ্ধ লীগের প্রেসিডেন্ট কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দী ও দেশের সকল বৌদ্ধদের মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে আহ্বান জানান।[২৯] অধিকন্তু, শর্ষীনার পীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহসহ কতিপয় ইসলামী ব্যক্তির মুসলিম লীগকে সমর্থন করলে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমসহ অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সদস্যরা মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। এর ফলে যুক্তফ্রন্টকে নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও তার সমর্থক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবেলা করতে হয়। অবশ্য যুক্তফ্রন্টের নেতারাও এজন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বভাবতঃই এ নির্বাচনী জোট গঠনের পরে যুক্তফ্রন্টের শীর্ষস্থানীয় নেতারা মনোনয়ন প্রদানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নির্বাচনের জয়-পরাজয় অনেকটা এর ওপর নির্ভরশীল হয় তার জন্য তাঁরা এক সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়ন করেন।

[২৯] *আজাদ* (ঢাকা), ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

যুক্তফ্রন্টের দলসমূহ ও তাদের আদর্শগত অবস্থান

১৯৫৪ সালের পূর্ববাঙলা আইন পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।[১] এর মধ্যে মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলির মধ্যে মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অমুসলমান আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলির মধ্যে ছিল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলি জাতি ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল, গণসমিতি, কুমিল্লা অভয় আশ্রম এবং সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট উল্লেখযোগ্য।[২] এর বাইরেও কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয় যাদের দলগত অবস্থান উল্লেখ করার মতো ছিল না। তবে নির্বাচন মূলত মুসলিম লীগ এবং মুসলিম বিরোধী নির্বাচনে পরিণত হয়। মুসলিম লীগ বিরোধী দলে ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, খেলাফতে রাব্বানী ও কমিউনিস্ট পার্টি। মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মুসলমান আসনগুলির জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম একত্রিত হয়ে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনী মোর্চা, যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।[৩] মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাবাপন্ন দলগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেয়। অন্যদিকে অমুসলমান আসনগুলির জন্য গণসমিতি, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল ও কুমিল্লার অভয় আশ্রম ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট গঠন করে।[৪] এখানেও ঠিক একইভাবে মুসলিম বিরোধী মনোভাবাপন্ন দলগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেয়। সুতরাং মোটামুটি হিসেব দাঁড়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী গ্রুপ হলো দুটি যার একটি হলো মুসলিম লীগ এবং অন্যতি যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের

---

[১] Keith Callard, Pakistan – *A Political Study*, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1958), p. 58.

[২] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এস. এম. রেজাউল করিম, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ববাঙলায় এর প্রতিক্রিয়া", সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, নং ৮৭, মে-আগস্ট ২০০৩, পৃ. ৪৮-৪৯।

[৩] যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রেক্ষাপট, যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রক্রিয়া ও যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান, বার্ষিক রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫ সন (ঢাকা: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ), পৃ. ৬-১০। আরো দ্রষ্টব্য, আবুল কাশেম (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ, ঐতিহাসিক দলিল*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৬২-৬৫। বিস্তারিত দেখুন, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

[৪] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের শুরু থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন এলিট শ্রেণীর। এই এলিট শ্রেণীর অধিকাংশই ছিলেন সামাজিকভাবে অনেক উঁচু স্তরের এবং জনবিচ্ছিন্ন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী খালিদ বি. সাইদ যথার্থই বলেছেন,

> The Principal leaders and group representing East Bengal in Muslim League come from the upper-class, landowning, under-speaking families of Dacca or the mercantile groups of Calcutta. Even Jinnah, the Quaid-i-Azam, had been criticized by Bengali leaders for paying heed to the wishes and representations of there groups. However, under Suhrawardy, Abul Hasham had organized the Muslim League at the grass-roots level with some left wing support, and it appeared that the leadership had been wrested from the conservative groups led by Khwaja Nazimuddin.[5]

কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ দলের ত্যাগী নেতাদের ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত, পূর্ববাঙলার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অনেক নেতা মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। এ সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে অনেক নতুন নেতা রাজনীতিতে যোগ দেন। একদিকে এই দলত্যাগী নেতা এবং অন্যদিকে এই নতুন প্রজন্মের নেতা এই দুইয়ে মিলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের এলিট শ্রেণীর বিপরীতে পূর্ববাঙলার এই শ্রেণীর নেতাদের পরিচিতি ছিল 'ভার্নাকুলার এলিট'[৬] হিসেবে। এই ভার্নাকুলার এলিট শ্রেণীর উত্থান হয়েছিল পূর্ববাঙলার সাধারণ কৃষক শ্রেণীর ঘর থেকে তাই তাদের জনপ্রিয়তা ছিল মুসলিম লীগ নেতাদের থেকে শীর্ষে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট দলের নেতাদের সামাজিক অবস্থানগত কারণে পূর্ববাঙলার জনগণের নিকট উভয়ের গ্রহণযোগ্যতা ছিল বিপরীতধর্মী।

---

[৫] Khalid B. Sayeed, "Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change" (New York: Pradger, 1980), p. 66.

[৬] Rounaq Jahan, "Pakistan: Failure in National Intergration", (USA Columbia University Press, 1972), pp. 38-41.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারসহ অবস্থান

মুসলিম লীগ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। মুসলিম লীগের অন্যতম বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করা, পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি।[৭] মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্ববাঙলায় নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার, পাকিস্তানি আদর্শ মোতাবেক মৌলিক অধিকার দেয়ার, মসজিদকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষাদান, কোরআন সুন্নাহভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ইসলামী সমাজ গঠনের ও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এছাড়াও ইশতেহারে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মোহাজের সংখ্যালঘু, বেকার, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও পাট সমস্যার সমাধানেরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৮] পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ঢাকার এক নির্বাচনী সভায় বলেন, 'মুসলিম লীগই একমাত্র দল যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অটুট রাখতে সক্ষম। 'খোদা না করুন, সামনের নির্বাচনে যদি অন্য কোনো দল নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হবে'।[৯] পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বলেন, 'যারা স্বাধীন পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না। যারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে তারা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।' বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এক জনসভায় বলেন, 'যদি পূর্ববাঙলা প্রদেশের জনগণের এই ইচ্ছে হয় যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে তাহলে তিনি গণপরিষদে তা সমর্থন করবেন।[১০] পূর্ববাঙলার ধর্মপ্রাণ নিরীহ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মুসলিম লীগ ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট রাখার আহ্বান জানান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের ভগ্নী মিস ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলিম লীগের পক্ষ নেন। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে ভিন্ন

[৭] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ১১৪।
[৮] *The Morning News*, 15 December, 1953.
[৯] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি., ১৯৮১), পৃ. ৪৮-৪৯।
[১০] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

জনসভায় বলেন, 'মুসলমান ভোটারদের উচিত কমিউনিস্ট ও হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেয়া।' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিবস উপলক্ষে এক বেতার বক্তৃতায় পূর্ব বঙ্গবাসীর উদ্দেশে মিস জিন্নাহ বলেন, "আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনাদিগকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফলের ওপরই পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যত চিন্তা করুন এবং অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।"[১১] মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন, "এই নির্বাচন অনেকটা গণভোটের মতো। নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ হবে যে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। না ভারতভুক্ত হবে।"[১২] নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে আজাদ পত্রিকায় একটা দীর্ঘ নির্বাচনী ইশতেহার প্রচারিত হয়। ইশতেহারটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৭ জানুয়ারি ১৯৫৪ তারিখে এবং এটি ৮ মার্চ পর্যন্ত তা মাঝে মধ্যেই ছাপানো হয়।[১৩] মুসলিম লীগের ইশতেহার ছিল অস্পষ্ট এবং গোজামিল প্রকৃতির। তাছাড়া মুসলিম লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় গেলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির যে বাস্তবায়ন হবে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কেননা মুসলিম লীগের এই নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের অনুমতি ছিল না। এটা ছিল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দান। মুসলিম লীগের এই নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন নিয়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার সংক্রান্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতাদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় যখন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ও মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বলেন,

> পাকিস্তান মোছলেম লীগ গত সপ্তাহে নির্বাচনী মেনিফেস্টো প্রচারের পূর্বে তাঁহার সহিত কোন রূপ পরামর্শ করেন নাই কিংবা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ করা সাধারণ নিয়ম কিনা সে সম্পর্কে আমি এই বিশেষ বিষয়ে মোছলেম লীগের গঠনতন্ত্র দেখিব।[১৪]

[১১] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[১২] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।
[১৩] *ঐ*, পৃ. ১৪৫।
[১৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী মুসলিম লীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৫] এর পর থেকে এ দল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে এবং জনসমর্থন ও সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে পূর্ববাঙলায় মুসলিম লীগের পরেই নিজের অবস্থান করে নেয়। কিন্তু ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে মুসলিম লীগের কাছে এ দল শোচনীয়ভাবে হেরে যায়।[১৬] তাই পূর্ববাঙলায় মুসলিম লীগের বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন যেমন গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ও পীস কমিটি ইত্যাদির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার যে রীতি মেনে চলত[১৭] তা অব্যাহত রেখে এবং একাকী মুসলিম লীগকে পূর্ববাঙলার নির্বাচনে (১৯৫৪) হারাতে সক্ষম হওয়ার বিষয় নিয়ে যে তার সন্দেহ ছিল তা দূর করার লক্ষ্য নিয়েই নির্বাচনী জোট গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এ. কে. ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পূর্ববাঙলার রাজনীতিতে পুনরায় প্রবেশ করার সময় আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ না দিয়ে নতুন পার্টি গঠন ও অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেললে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্য এ. কে. ফজলুল হক ও তাঁর দল কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে জোট গঠন করা অতি জরুরি হয়ে পড়ে।[১৮] এর ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ মে মাসে (১৯৫৩) আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ শহরে এক বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ডাকে এবং সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জোট গঠনের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে মোমেনশাহীতে (বর্তমান ময়মনসিংহ) অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে ৪২ দফা নির্বাচনী ইশতেহার গৃহীত ও প্রকাশিত হয়।[১৯] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় গেলে ইশতেহারে বিবৃত

---

[১৫] Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, (Dhaka: Academic Publishers, 1991), pp. 3-4.

[১৬] Allen Mc Grath, *The Destnuction of Pakistan's Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996), p. 110. আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৯৫৩-১৯৬৬।

[১৭] Yunas Samad, *A Nation in Turmoil Nationalism and Ethnicity in Pakistan, 1937-1958*, (New Delhi: Sage Publications, 1995), p. 156.

[১৮] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০), পৃ. ৩২০।

[১৯] *ঐ*, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এই ইশতেহারে পাট ও চা শিল্প জাতীয়করণ এবং বিনা খেসারতে জমিদারি দখলের জন্য জমিদারি প্রথা রহিতকরণ বিলের আমুল পরিবর্তন সাধনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। সকল নিরাপত্তা আইন রহিতকরণ, সংবাদপত্র, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহার এবং মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হাজার টাকা ধার্য করে শাসনকার্যের ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে এ নির্বাচনী ইশতেহার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাঙলাকে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটে পরিণত এবং প্রাদেশিক সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও মুদ্রা ব্যবস্থা ব্যতীত আর সকল বিষয়ই ন্যস্ত করার প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া হয়। পূর্ববাঙলাকে দেশ রক্ষার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশে দলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ববাঙলায় একটি সামরিক কলেজ এবং একটি অস্ত্র কারখানা স্থাপনের চাপ দেয়ার প্রতিশ্রুতিও ইশতেহারে দেয়া হয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণকে ১৯৪০ সাল হতে তাদের টাকা পয়সা ও সম্পত্তির হিসেব দাখিল করতে নির্দেশ এবং যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশে দলটি বর্তমান পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একযোগে কাজ করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে। প্রাদেশিক পরিষদে কোন সদস্যপদ শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের মনোনীত কোন প্রার্থী উপর্যুপরি ৩টি উপ-নির্বাচনে পরাজিত হলে এই দলের মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কথাও ইশতেহারে বলা হয়। কুটির শিল্পের উৎসাহদান মহাজেরদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ তুলে দেয়া, ২১ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা স্কুলসমূহের ওপর থেকে হুকুম দখল প্রত্যাহার এবং অল্প খরচে ও বিনা বেতনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও ইশতেহারে দেয়া হয়।[২০] বস্তুত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করে। পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এই ইশতেহারেরই প্রধান প্রধান ধারা নিয়ে

[২০] *দৈনিক আজাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচি প্রণীত হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে এই ২১ দফা কর্মসূচিটি পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা নির্বাচনের ফলাফল থেকেই স্পর্শ প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, ইশতেহারটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৭ জানুয়ারি ১৯৫৪ তারিখে। পরবর্তীকালে ৮ মার্চ পর্যন্ত তা মাঝে মধ্যেই ছাপানো হয়।[২১]

কৃষক শ্রমিক পার্টি

১৯৫৩ সালে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] এর আগে এ. কে. ফজলুল হক পূর্ববাঙলার ১৯৪৬-৪৭ নির্বাচনে নিজ দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটলে রাজনীতি থেকে একেবারে সরে দাঁড়ান ও পরে ১৯৫১ সাল থেকে পূর্ববাঙলার এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে চাকরি করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের প্রথমদিকে পূর্ববাঙলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং রাজনীতিতে পুনরায় প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি প্রথমেই ১৯৫৩ সালের ২২ মার্চ তাঁর ঢাকার বাসভবনে স্বীয় রাজনৈতিক ভক্ত অনুসারীদের এক সভা ডাকেন। এ সভায় পূর্ববাঙলার সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নতুন পার্টি গঠনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ফজলুল হককে একটি নতুন পার্টি গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর পূর্বেকার কৃষক-প্রজা-পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন মাত্র। এ প্রসঙ্গে নাজমা চৌধুরী বলেন,

> The party was undoubtedly named with the Krishok Proja Party of the thirties in mind, which had attained some amount of popularity in Bengal also, primarily organised to provide a platform for the coming election, it was directed to the voters the masses, the ill-fed, ill-clad and ill-housed peasants (who) pass their days on the bread of sorrow and the water of affection. These unfortunate specimens of humanity may be classed as the Krishak (Peasants) Sramik (Labourers) and Projas (Tenants) of the country, and it is for the purpose of emphasising that the interest of this

[২১] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

[২২] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৪৬৭-৪৮৩।

> class of people will allways be closest to our heart, that we have named our new party Krishak Sramik Party.[23]

কৃষক-শ্রমিক পার্টি ১২ দফা কর্মসূচি দেয় যার মধ্যে ছিল– তাড়াতাড়ি বন্দি মুক্তি, পাটের বাণিজ্য জাতীয়করণ, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, শ্রমিকদের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, দেশকে শিল্পায়ন করা এবং কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা।[২৪] এছাড়াও পার্টির ইশতেহারে যুব সমাজের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বলা হয় এটি হবে 'The achievement of measures for their prosperity, happiness and welfare.'[২৫] অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক পার্টির ইশতেহারে জোর দেয়া হয় 'on a man rather than a policy.'[২৬]

কৃষক শ্রমিক পার্টির সাংগঠনিক অবকাঠামো গঠনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ না করে কেবল নির্বাচনেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে। এটা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ফজলুল হক অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন এবং নিজ দলের কর্মসূচির সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম বা খেলাফতে রব্বানী পার্টির কর্মসূচির সামঞ্জস্য থাকায় ওই দলগুলো নিয়ে মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচনী জোট গঠন করতে উদ্যোগী হন। তিনি ১ সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) ময়মনসিংহের এক জনসভায় বিরোধী দল নিয়ে জোট গঠনের ঘোষণা দেন।[২৭] এজন্য এ. কে. ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখে তার বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভায় যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে এ ব্যাপারে অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন।[২৮] ইতোমধ্যে ফজলুল হক নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা চালিয়ে যান এবং একপর্যায়ে তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ফেলেন। এরপর অবশ্য তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

---

[২৩] Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functinging of the East Bengal Legislature, 1947-58*, Publishers The University of Dacca, The City Press, Dacca, 1980, p. 148.

[২৪] *দৈনিক আজাদ*, ৩০ জুলাই, ১৯৫৩।

[২৫] *প্রাগুক্ত*।

[২৬] Keith Callard, *The Political Stability of Pakistan*, *op. cit*., p. 11.

[২৭] *দৈনিক আজাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩।

[২৮] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্ট

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রেরণাশক্তি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। তাই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরণীয় করার অতিরিক্ত উপায় হিসেবে ২১ দফার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। সমাজের বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ভোটারদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ৪২ দফা কর্মসূচির প্রধান প্রধান ধারা নিয়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। যুক্তফ্রন্টের এই ২১ দফা ইশতেহার প্রণয়ন প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন,

> শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার অনুমতি দেন। অতঃপর হক সাহেব ও ভাসানী সাহেব যুক্ত বিবৃতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার আমার ওপর পড়ে। আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের ৪২ দফার একটি নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করিয়াছিলাম। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফাও ছিল। কাজেই ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরণীয় করার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচিকে ২১ দফার কর্মসূচি করিলে কেমন হয়? অতঃপর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইয়া গেল।[২৯]

খেলাফতে রব্বানী পার্টি

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে খেলাফতে রব্বানী পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩০] ১৯৫৩ সালে প্রাক্তন বেঙ্গল মুসলিম লীগ এর সভাপতি আবুল হাসেম পাকিস্তান থেকে চলে আসেন এবং রব্বানী পার্টিতে যোগ দেন। আবুল হাসেম রব্বানী পার্টি সম্পর্কে বলেন,

> ‘if the people of Pakistan by their own free choice adopted any pattern other than Islamic, then the partition of the subcontinent would be wholly

[২৯] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২।

[৩০] Nazma Chowdhury, “The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58”. Publishers The University of Dacca, The City Press, Dacca, 1980, p. 154.

Dhaka University Institutional Repository

unjustified', `the creation of an Islamic social' order', he maintained was', 'the sine gua non for Pakistan.'[31]

খেলাফতে রাব্বানী পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তমুদ্দনিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ, ইঙ্গ-মার্কিন ও রাশিয়া এই 'জড়বাদী' ব্লকের দম্ভে পাকিস্তানের নিরপেক্ষতা রক্ষা, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনা বিচারে আটক রাখার নীতি বাতিল। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, বিনা বিচারে আটক রাজবন্দিদের মুক্তি, পাটসহ সমস্ত একচেটিয়া ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রায়াত্তকরণ, বিনা খেসারতে সমস্ত কর আদায়, ভূমিস্বত্বের বিলোপ সাধন, ভূমি নির্ভর ভূস্বত্বের বিলোপ সাধন, ভূমি নির্ভর ভূস্বত্বচ্যুত নাগরিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টন; লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের কর বাতিল, অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাধীনতা এবং শিক্ষা ও নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী শাসনবিভাগীয় সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার এবং ঘুষ-দুর্নীতি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়।[৩২] বস্তুত খেলাফতে রাব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নির্বাচনী মোর্চা গঠন না করলে ও বাইরে থেকেই দলটি যুক্তফ্রন্টকে সাহায্য করেছিল। খেলাফতে রব্বানী পার্টির নির্বাচনী প্রচারের মূল সূর ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী। এ কারণে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচির সঙ্গে খেলাফতে রাব্বানী পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৩৩]

---

[৩১] *Statesman*, June 13, 1953.

[৩২] *দৈনিক আজাদ*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৫৩।

[৩৩] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রী দল

১৯৫৩ সালে জানুয়ারি মাসে একটি কনভেনশনের মাধ্যমে গণতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩৪] গণতন্ত্রী দল সম্পর্কে Keith Callard বলেন, 'to adopt a secular policy and admit non Muslims on equal terms.'[৩৫] ১৯৫৪ সালের গণতন্ত্রী দল নির্বাচন উপলক্ষে সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। গণতন্ত্রী দল 'দশ দফা' ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। এতে বলা হয় :

১. ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ ও পাকিস্তানকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।

২. পাকিস্তানে বাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত বিদেশি মূলধন ও সুদ বাজেয়াপ্তকরণ।

৩. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। জমিদারদের দখলি অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে উহার পুনর্বণ্টন।

৪. পাটের রফতানি ব্যবসা জাতীয়করণ উহার বাজার সম্প্রসারণ ও পাটের সর্বনিম্ন ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা দান।

৫. দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি জাতীয় মূলধন নিয়োগে সক্রিয় উৎসাহ দান।

৬. দেশবাসীর ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিদান, অভ্যন্তরীণাদেশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার, সকল কালাকানুন ও অর্ডিন্যান্স রদকরণ এবং ধর্মচর্চা, সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান।

৭. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান।

৮. বেকারত্ব ও ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশবাসীর বাঁচার অধিকার কায়েম করা।

৯. জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।

১০. পাকিস্তান-ভারত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।[৩৬]

এখানে উল্লেখ্য, যুক্তফ্রন্টের মতো গণতন্ত্রী দল ও পূর্ববাঙলার জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করে জনগণের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার নির্বাচনী ইশতেহার ১০ দফা ঘোষণা করে।

---

[৩৪] Nazma Chowdhury, *Ibid*, p. 150.

[৩৫] Keith Callard, Pakistan: A Political Study, London. George Allen & Unwin Ltd., 1957, p. 74. Najma Chowdhury, Ibid, p. 150.

[৩৬] *দৈনিক আজাদ*, ২৮ নভেম্বর, ১৯৫৩।

নিজামে-এছলাম

Hugh Tinker পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে বলেন, "impact of religion was made through two opposed approaches political parties, claiming to speak with the authority of religion; and the religions groups, exercising an external pressure upon political activity."[৩৭]

১৯৫২ সালে নিজামে ইছলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ধর্মীয় অনুশাসনকে মাথায় নিয়ে কিন্তু জামাত-ই-ইছলামের মতো এতটা মৌলবাদী ধ্যান-ধারণাতে অনড় ছিল না।[৩৮] অন্যদিকে নিজামে-ইছলামের নেতা মাওলানা আতহার আলী বলেন, জমিয়তে উলেমা ইছলামের ই রাজনৈতিক শাখা ছিল নিজামে ইছলাম।[৩৯] এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের সহযোগিতায় জমিয়তে ওলামায়ে ইছলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।[৪০]

নির্বাচনে ইসলামী দল সমূহের ভূমিকা

কিছু ইসলামী দল বা সংগঠন এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিজেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও মুসলিম লীগকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন।

জমিয়তে হেজবুল্লাহ

এটি ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচন সম্পর্কে এ দলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ:

জমিয়তে হেজবুল্লাহ আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে প্রার্থী খাড়া করাইবে না বা দল বিশেষকে সমর্থন করিবে না। দ্বিজাতি তত্ত্বে ও নেজামে এছলাম সমর্থক কোনো নির্বাচন প্রার্থী জমিয়তে হেজবুল্লাহর 'একবার নামায়' দস্তখত করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উক্ত ব্যক্তির জনসমর্থন ও তাঁহার নিজস্ব যোগ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া জমিয়ত তাহাকে সমর্থন করিবে।[৪১]

---

[৩৭] Hugh Tinker, India and Pakistan: A Political Analysis, New York Frederick A. Praeger Inc., p. 118.
[৩৮] Nazma Chowdhury, *Ibid*, p. 153.
[৩৯] Aziz K. K., The Maling of Pakistan: "A Study in Nationalism, London: Chatto & Windas", 1967, pp. 178-181.
[৪০] Aziz K. K., *Ibid*, pp. 178-181.
[৪১] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ঘোষণা কর। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর সম্পাদক মওলানা আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন:

> পাকিস্তানে আদর্শ ইছলামী শাসন কায়েম, জাতীয় সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য দীনদার মুসলমানদের পক্ষে মোছলেম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া বর্তমানে শরীয়ত সম্মত অন্য কোনো পথ নাই। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে জমিয়তে হেজবুল্লাহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকেই সমর্থন করিবে।[৪২]

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে এই দল ঘোষণা করে যে, 'লীগকে সমর্থন করা ওয়াজেব'।[৪৩]

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র-হেজবুল্লাহ

এটি জমিয়তের হেজবুল্লাহর ছাত্রফ্রন্ট। নির্বাচনে এ দলের ভূমিকা সম্পর্কে দলের প্রচার সম্পাদক মওলানা ছাহেব আলী ঘোষণা করেন:

.... মুসলমানদের একমাত্র খালেছ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের স্থান বিরোধী খিচুড়ি দলের অনেক ঊর্ধ্বে। মরহুম ফুরফুরা ও শষীনার পীর ছাহেবদ্বয় ও হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব প্রমুখ অলীগণও জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ... জাতীয় বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের দীনদার ছাত্রদের নীরব থাকিলে বা কংগ্রেসী ওলামাদের এশারায় ভুলপথে চলিলে দেশ ও জাতির পক্ষে তাহা মারাত্মক হইবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই আজ আমি খোলাখুলিভাবে দীনদার ছাত্রদের প্রতি আবেদন করি যে, পাকিস্তানে নেজামে এছলাম কায়েম, জাতির সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানকে গুপ্ত শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।[৪৪]

জমাইয়াতে তোলাবায়ে আরাবিয়া

এটিও একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও পূর্ববাঙলার ওলামায়ে কেরামের উদ্দেশে এক আবেদনে এই দলের সম্পাদক মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান

---

[৪২] *দৈনিক আজাদ*, ৫ জানুয়ারি, ১৯৫৪।
[৪৩] *দৈনিক আজাদ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।
[৪৪] *দৈনিক আজাদ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানে নেজামে ইছলাম কায়েম করার উদ্দেশে নিজেদের মধ্যকার খুঁটিনাটি মতানৈক্য ভুলিয়া এক কর্মপন্থা অবলম্বন করুন।'[৪৫]

জামায়াতে ইছলামী

এ দলটি ইসলামী রাজনৈতিক দল হয়েও পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'অনৈছলামিক' বলে অভিহিত করে।[৪৬] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামাতে এছলামীর আমির চৌধুরী আলী আহমদ খান নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, 'ইহা দেশে অসাধুতার বিষ ছড়াইতে সাহায্য করিবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সকল অনর্থের মূল।[৪৭]

বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের মনোভাব

শর্ষীনার পীর সাহেব তাঁর অনুসারীদেরকে মুসলিম লীগকে সমর্থনের আহ্বান জানায়।[৪৮] মহামান্য আগা খান তাঁর পাকিস্তানস্থিত বিভিন্ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবর্গ এবং জামাতের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত বাণীতে পূর্ববাঙলার নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মন্তব্য করেন, 'লীগ জয়ী না হলে পাকিস্তানে ইসলাম দুর্বল হবে'।[৪৯] পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফি তাঁর অনুসারীদেরকে আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদেরকেই জয়যুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।[৫০] এভাবে বিভিন্ন ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্ব প্রকারন্তরে মুসলিম লীগকে সমর্থন জানান।

[৪৫] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩, ৮ জানুয়ারি ১৯৫৪।
[৪৬] *দৈনিক আজাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[৪৭] *দৈনিক আজাদ*, ২৮ নভেম্বর, ১৯৫৩।
[৪৮] *দৈনিক আজাদ*, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৪।
[৪৯] *দৈনিক আজাদ*, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।
[৫০] *দৈনিক আজাদ*, ৪ মার্চ, ১৯৫৪।

পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল

ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনতার সময় ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল নিজেকে দুটি স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন হিসেবে বিভক্তির ঘোষণা দেয়।[৫১] পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল কখনই পুরোপুরি উন্নতি করা বা সংগঠিত হতে পারেনি। পাকিস্তানের দুই শাখার মধ্যে সমন্বয়ের অনেক অভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের প্রেসিডেন্ট বলেন, lack of finance accounted for the party's lack of growth; there were no funds for propagating its views and creating a `socialistic atmosphere' – the party was too poor to even maintain an office.[৫২]

পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল ২৬ দফা[৫৩] ভিত্তিক ইশতেহার ঘোষণা করে যার মধ্যে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান, সকল প্রকার নিরাপত্তামূলক আইন বাতিল, পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ আওতাভুক্তকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৫৪] পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের এই নির্বাচনী ইশতেহারে বামপন্থী ভাবধারা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এ দলের ইশতেহারে পূর্ববাঙলার জনগণের সামগ্রিক সমস্যার প্রতিফলন অস্পষ্ট। তবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

সাম্যবাদী দল

১৯৪৮ সালে মার্চ মাসে সর্বভারতীয় সাম্যবাদী দলের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, এই কংগ্রেসে দলের কমিটি পাকিস্তান সাম্যবাদী দলকে সংগঠন হিসেবে স্বাধীনতা প্রদান করে।[৫৫] সাম্যবাদী দলের সদস্য পাকিস্তানে স্বাধীনতার পর অল্প পরিমাণে ছিল এবং সাংগঠনিকভাবে দুর্বল

---

[৫১] Nazma Chowdhury, *Ibid*, p. 155.

[৫২] Troilakya Nath Chakravarty, "Thirty Years in Prison and the Independence Struggle of Pakistan India". (Bengali-Jele Trish Basar O Pak Bharater Swadhinata Sangram) (Dacca: Modern Printing Works Limited, 1968), pp. 362-63. T. N. Chakravarty Served as President of the East Pakistan Socialist Party. This Work is of autobiographical nature and mainly devoted to his years of terrorist activities during British rule. Nazma Chowdhury, *op cit.*, p. 156.

[৫৩] Nazma Chowdhury, *op cit.*, p. 156.

[৫৪] *The Morning News*, 28 November, 1953.

[৫৫] *দৈনিক আজাদ*, ৮ মার্চ, ১৯৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে ২০,০০০ বাঙালি সদস্য ছিল।[৫৬] ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সাম্যবাদী দলকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বন্ধ করা হয়নি তবে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারি দমন পীড়নের মধ্যে ছিল। দমন পীড়নের কারণে বেশি পরিমাণে পার্টির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পার্টির সদস্য সংখ্যাও কমতে থাকে বিশেষ করে ১৯৫০ এর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দাঙ্গা এতে প্রভাব ফেলে।[৫৭] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সাম্যবাদী দল নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী দেয়।

নির্বাচনে হিন্দুদল ও জোট

তৎকালীন পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদে অমুসলমান আসনের সংখ্যা ছিল ৭২। এর মধ্যে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ১।[৫৮] নির্বাচনে মুসলমান আসনগুলো মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য হিন্দু-আসনের নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন হবে – এই বিবেচনায় যুক্তফ্রন্টের ইঙ্গিতে 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো ছিল 'গণসমিতি', কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল।' 'গণসমিতির নেতৃবৃন্দই এই ফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেন। 'গণসমিতি' হচ্ছে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সময় কিছু নেতা 'কংগ্রেস' বাদে অন্য নামে দল গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হলে তারা ১৯৪৮ এর জুলাই মাসে 'গণসমিতি' গঠন করেন। এই দলে শুধু কংগ্রেস সদস্যরাই যোগ দেননি, 'সমাজতন্ত্রী দল', 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল', 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং অন্যান্য সংগঠনের কিছু হিন্দু-নেতাকর্মীও যোগ দেন।[৫৯]

---

[৫৬] Marcus F. Franda, "communism and Regional Politics in East Pakistan", Asian Survey, vol. X, No. 7 (July, 1970), pp. 588-606. Franda estimates the membership of the party in 1970 to be approximately 3.000 in East Pakistan. Robert A. Scalapino in The Communist Revolution in Asia: Tactics, Goals and Achivements (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965) also puts the membership (in 1965) to be between 2,000-3,000 (200-300) only in West Pakistan). See pp. 29-32 chart 6. Nazma Chowdhury, *op cit.*, pp. 156-157.

[৫৭] Marcus F. Franda, *op. cit*., T. Maniruzzaman, Radical Politics, pp. 3-11, Najma Chowdhury, *op. cit*., p. 157.

[৫৮] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, পৃ. ১১১।

[৫৯] Najma Chowdhury, *op. cit*., p. 157, ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ এর পর কংগ্রেস ও গণসমিতি প্রধানত বর্ণ-হিন্দুদের সংগঠন ছিল। সে সময় তফসিলী হিন্দুদের সংগঠন ছিল 'তফসিলী জাতি ফেডারেশন'। ১৯৪৭-এর পূর্বে এবং পরে এই সংগঠনের নীতি ছিল মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করা। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালে পূর্ববাঙলা সরকারের কেবিনেটে এই দল থেকে দলের প্রেসিডেন্ট মি. ডি. এন. বারুই মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হবে, না যৌথ নির্বাচনব্যবস্থা হবে – ইস্যুতে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে দল বিভক্ত হয়। ডি. এন. বারুই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধ অংশের নেতৃত্ব দেন মি. রসরাজ মন্ডল।[৬০] অবশেষে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় বিরোধী অংশের সম্মেলন হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী উক্ত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়াও কংগ্রেস এবং পূর্ববঙ্গ তফসিলি জাতি ফেডারেশন (রসরাজমন্ডল গ্রুপ) দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা ছিল উল্লেখ করার মতো। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। কংগ্রেসের ইশতেহারে বলা হয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ধর্ম-সংস্কৃতি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা এবং সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতিবাদ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষাই ছিল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয়।[৬১] আর তফসিলি জাতি ফেডারেশনের (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ) নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন এবং তফসিলিদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচনের দাবিতে পূর্ববঙ্গ তফসিলি জাতি ফেডারেশন আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।[৬২] বস্তুত কংগ্রেস এবং পূর্ববঙ্গ তফসিলি জাতি ফেডারেশনের (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ নির্বাচনী ইশতেহার সমগ্র পূর্ববাঙলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থকে উপলক্ষ করে রচিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। বরং একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দুটি দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণীত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না।

[৬০] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।
[৬১] *দৈনিক আজাদ*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[৬২] *The Morning News*, 24 December, 1953.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে ঘোষিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার বিশ্লেষণ শেষে বলা যায় যে, একমাত্র মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের সময় পূর্ববাঙলার জনগণের ভাবাবেগের প্রতি যত্নসহকারে গুরুত্ব দেয়। বস্তুত মুসলিম লীগ সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সময় যেসব দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং বৈষম্যের কারণে পূর্ববাঙলার জনগণ অতিষ্ট হয়ে ওঠে সেই অনুভূতির ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ ব্যতীত) নির্বাচনী বৈতরণী পার পাবার উদ্দেশে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করে। রাজনৈতিক দলগুলির উপস্থাপিত নির্বাচনী ইশতেহারে মূল সুর ছিল পূর্ববাঙলার জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল সুর ছিল ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষা। মুসলিম লীগের এই নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা নেতা আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন,

> পাকিস্তান টিকিবে কিনা, আসন্ন নির্বাচনেই তা নির্ধারিত হইবে। কথাটা বলিতেছেন অনেক শ্রদ্ধেয় নেতাই। তাঁরা নিশ্চয়ই এই অর্থেই কথাটা বলিতেছেন যে, তাঁদের পার্টিকে এবার ভোট না দিলে পাকিস্তান টিকিবে না। যিনি যে উদ্দেশেই কথাটা বলুন না কেন, কথাটা সাংঘাতিক। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পার্টিকে ভোট না দিলে পাকিস্তানের জন্মই হইত না। এ কথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার এতদিন পরে একটা নির্বাচনে ভোটাররা ভুল ভোট দিলেই পাকিস্তান খতম হইয়া যাইবে, এমন মারাত্মক অশুভ সম্ভাবনা যাঁরা কল্পনা করিতে পারেন, তাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থায়িত্বে আজও বিশ্বাস করেন না। অথচ এসব নেতার অধিকাংশই বলিতেছেন, ইসলাম রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। এবার পাঠকরা এসব নেতার কথাটার বিচার করুন। ইসলাম রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি। অতএব পাকিস্তান যেদিন ধ্বংস হইবে, ইসলাম ধর্মও সেদিন শেষ হইবে। ইসলাম ধর্ম কিয়ামত তক জারি থাকিবে, ইহা হরেক মুসলমানের ঈমান। কাজেই যেদিন ইসলাম খতম হইবে। সেদিন কিয়ামত হইবে, এই মনতেক অনুসারে আসন্ন নির্বাচনের ভোটাভুটির উপরই বিশ্বজগতের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। ওই ওই বক্তার পার্টিকে এবার ভোট না দিলে শুধু পাকিস্তান ধ্বংস হইবে না, ওই সঙ্গে ইসলাম ও দুনিয়া জাহান ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাকিস্তানের একজন ভোটারও এমন উদ্ভট অদ্ভুত কথার বিশ্বাস করিবেন না।[৬৩]

[63] আবুল মনসুর আহমদ, শেরে-বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১), পৃ. ১১৯, আরও দেখুন, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আসন বিন্যাস, প্রচার কৌশল, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের জয়লাভের পরিসংখ্যান ও প্রতিক্রিয়া

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ভারত শাসন আইনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,

ক. নির্বাচন হবে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে।

খ. অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে।

গ. পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে নিম্নরূপ :

১. মুসলমান আসন	২৩৭টি (৯টি মহিলা আসনসহ)
২. সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩১টি (১টি মহিলা আসনসহ)
৩. তফসিলী জাতি হিন্দু	৩৮টি (২টি মহিলা আসনসহ)
৪. বৌদ্ধ	২টি
৫. খ্রিস্টান	১টি
	সর্বমোট ৩০৯টি (১২টি মহিলা আসনসহ)[১]

১৯৫১ সালের আদমশুমারী রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। সমস্ত পূর্ববাঙলা সেখানে মুসলমানদের জন্য ২২৮টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। সেখানে বর্ণ-হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩০টি এলাকায় ও তফসিলী হিন্দুদের জন্য ৩৬টি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। স্বভাবতই বর্ণ-হিন্দু বা তফসিলী হিন্দুদের নির্বাচনী এলাকা মুসলমানদের নির্বাচনী এলাকার চেয়ে অনেক বড় ছিল।[২] মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অন্য আসনেও মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে

[১] Election Commission of Bangladesh, Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954 (Dhaka: Secretary- Bangladesh Election Commission, May, 1977), পূর্ববাঙলার প্রথম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭১ জন। এর মধ্যে ১৪১ জন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের যেসব সদস্য পূর্ববাঙলা এলাকা থেকে নির্বাচিত তারা এবং সিলেট জেলা পূর্ববাঙলাভুক্ত হওয়ার কারণে সিলেট জেলা থেকে আসাম আইন পরিষদের নির্বাচিত ৩০ জন। দেখুন, Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functinging of the East Bengal Legislature, 1947-58,* Publishers The University of Dacca, The City Press, Dacca, 1980, pp. 17-19.

[২] নির্বাচিত এলাকার তালিকা (Constituency) এবং Constituency ভিত্তিক রিটানিং অফিসারদের তালিকার জন্য দেখুন, Govt. of East Bengal (Home Dept: Constitutions and Elections), Election Manual, Vol. I, Rules (Dacca: East Bengal Govt. Press, 1953), pp. 76-111, Ibid, vol. II, Appendices, pp. 84-108.

Dhaka University Institutional Repository

পারতেন। মহিলাদের জন্য যে ১২টি আসন সংরক্ষিত ছিল সে আসনসমূহের নির্বাচনে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মহিলাদেরই ভোট দানের অধিকার ছিল।[৩] সুতরাং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বসবাসরত মহিলা ভোটারদের প্রত্যেকের ভোট ছিল ২টি করে – ১টি নিজ সম্প্রদায়ের মহিলা (সংরক্ষিত) প্রার্থীর জন্য অন্যটি নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/ মহিলা প্রার্থীর জন্য। মফস্বল এলাকায় (মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে) বসবাসরত মহিলা ভোটারদের ভোট ছিল একটি – নিজ সম্প্রদায়ের মহিলা পুরুষ প্রার্থীর জন্য। নিম্নে সারণি ১-এ জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টন দেখানো হল।

সারণি ১

জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টন[৪]

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা (১৯৫১)	মোট ভোটার সংখ্যা	আসনপ্রতি জনসংখ্যা	আসন প্রতি ভোটার সংখ্যা
ক) মুসলমান	২২৮	৩,২২,২৬৩৯	১,৫১,৫৯,৮২৫	১,৪১,৩৪৫	৬৬,৪৯০
	সংরক্ষিত মহিলা ৯		সংরক্ষিত মহিলা ১,৬১,৯৬৬		সংরক্ষিত মহিলা ১৭,৯৯৬
খ) সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩০	৪২,২৭,৯৮২	২০,৯৫,৩৫৫	১,৪০,৯৩৩	৬৯,৮৪৫
	সংরক্ষিত মহিলা ১		সংরক্ষিত মহিলা ২৫,৭২৬		সংরক্ষিত মহিলা ২৫,৭২৬
গ) তফসিলী হিন্দু	৩৬	৫০,৫২,২৫০	২৩,০৩৫৭৮	১,৪০,৩৪০	৬৩,৯৮৮
	সংরক্ষিত মহিলা ২		সংরক্ষিত মহিলা ১৪,৭৮৫		সংরক্ষিত মহিলা ৭,৩৯৩
ঘ) বৌদ্ধ	২	৩,১৮,৯৫১	১,৩৬,৪১৭	১,৫৯,৪৭৫	৬৮,২০৯
ঙ) খ্রিস্টান	১	১,০৬,৫০৭	৪৩,৯১১	১,০৬,৫০৭	৪৩,৯১১
মোট	২৯৭+১২	৪,১৯,৩২৩২৯			

[৩] *দৈনিক আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

[৪] Najma Chowdhury, *op. cit.*, p. 167. Kamal Uddin Ahmed, *1954 Elections: Issues of Autonomy*, in S. Islam (ed.), *History of Bangladesh*, 1704-1971, vol. I, Political History (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), p. 471.

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা নির্বাচনী এলাকা ছিল নিম্নরূপ:

ক. মুসলিম মহিলা নির্বাচনী এলাকা

১. দিনাজপুর-কাম-রংপুর-কাম-বগুড়া

২. রাজশাহী-কাম-পাবনা

৩. ফরিদপুর-কাম-কুষ্টিয়া-কাম-যশোহর-কাম-খুলনা

৪. বাকেরগঞ্জ

৫. ঢাকা সিটি পশ্চিম

৬. ঢাকা-কাম-নারায়ণগঞ্জ

৭. মোমেনশাহী

৮. ত্রিপুরা-কাম-সিলেট

৯. চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী

খ. মহিলা তফসিলী নির্বাচন কেন্দ্র

১. রাজশাহী বিভাগ, ২. ঢাকা-কাম-চট্টগ্রাম বিভাগ।[৫]

নির্বাচনে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন এবং বাকি ৩০৪টি আসনের জন্য ১২৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৬] মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২২৮টি আসনে ৯৮৬ জন প্রার্থী এবং ৯টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৩২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩০টি সাধারণ (অমুসলমান) আসনে ১০১ জন প্রার্থী, তফসিলী হিন্দুদের ৩৬টি আসনে ১৫১ জন প্রার্থী এবং ১টি সংরক্ষিত মহিলা তফসিলী হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসন মোট ২টি, তন্মধ্যে ১টি আসনে ১জন মাত্র প্রার্থী থাকায় (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) আসনে ৩জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়াও ২টি বৌদ্ধ আসনে ১২জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আজ থেকে ৪৯ বৎসর পূর্বে ১০টি মহিলা আসনের (মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসন ৯টি এবং তফসিলী হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসন ২টির ১টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় ১টি বাদে অবশিষ্ট ১টি

[৫] *দৈনিক আজাদ*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

[৬] বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন – নেলি সেনগুপ্ত (কংগ্রেস), বাটার পল গোমেজ (খ্রিস্টান), নিবেদিতা মণ্ডল (তফসিলি ফেডারেশন), বিজয় চন্দ্র রায় (কংগ্রেস), ক্ষেত্রনাথ মিত্র (কংগ্রেস)। দ্রষ্টব্য, *দৈনিক আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪। আরও দেখুন, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, '১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার ও পূর্ববাঙলায় এর প্রতিক্রিয়া', সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আসন) জন্য ৩৫ জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৭] ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন।[৮] ভোটার তালিকায় অসংখ্য ভুলভ্রান্তি ছিল। অনেকের নামই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আহমদ রাজা -এর নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিল না বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন।[৯] ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি পেশের মোট সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম ছিল।[১০] ভোটার তালিকা সম্পর্কে ফজলুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, '. . .প্রকাশিত খসড়া তালিকায় শতকরা ৫০ জনের নাম স্থান পাইয়াছে। যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহাদের এক ভাগ আপত্তি দাখিল করিয়াছেন। অতএব তখনও প্রায় শতকরা ৪৯ জন ভোটারের নাম তালিকার বাইরে রহিয়াছে।[১১] চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬-এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১,০৫,৭১,৯৪৯ জন। ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৪। মনোনয়নপত্র বাছাই ১৬, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি (১৯৫৪) এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১ জানুয়ারি (১৯৫৪)।[১২]

নির্বাচনের প্রস্তুতি

২৪ ডিসেম্বর (১৯৫৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় এবং জনগণের অবগতির জন্য তা রেজিস্ট্রি অফিসে রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যেক মৌজার সরদারের অফিসে সিলেট জেলায় সার্কেল সাব-ডেপুটি কালেক্টরের অফিসে, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে, মহকুমা হাকিমের অফিসে, জেলা জজের, সাব জজের ও মুন্সেফের অফিসে, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়।[১৩] কেউ ইচ্ছে করলে ভোটার তালিকা কিনতে পারতেন।

---

[৭] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

[৮] "The East Bengal Legislative Assembly Election (preparation, Revision and Publication of Electoral rolls) Rules 1953, এবং Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, *op.cit*, pp. 4-9.

[৯] *প্রাগুক্ত*, ৩১ অক্টোবর ১৯৫৩।

[১০] *দৈনিক আজাদ*, ১ নভেম্বর ১৯৫৩ ও ১১ নভেম্বর ১৯৫৩।

[১১] *দৈনিক আজাদ*, ১২ নভেম্বর, ১৯৫৩।

[১২] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬।

[১৩] *দৈনিক আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ভোটার তালিকার প্রতি পৃষ্ঠার মূল্য চার আনা নির্ধারিত হয়। একটি নির্বাচনী এলাকার পুরো ভোটার তালিকার মূল্য নিম্ন ১৮ টাকা উর্ধ্বে ৩১৮ টাকা নির্ধারিত হয়।[১৪]

ছাপানো কিংবা টাইপ করা কিংবা হাতে লেখা ফরমে মনোনয়ন জমা দেয়ার নিয়ম করা হয়। তফসিলী নির্বাচনী এলাকা ছাড়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণকে ২৫০ টাকা জামানত দাখিল করতে হতো। তফসিলী নির্বাচন এলাকার প্রার্থীগণকে ১০০ টাকা জামানত দাখল করতে হতো। রেভিনিউ ডিপোজিট খাতে টাকা জমা দিতে হতো।[১৫]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালটবাক্স ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরূপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন।[১৬] নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'হারিকেন' প্রতীক এবং যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক গ্রহণ করে। মোট প্রতীকগুলো ছিল : নৌকা, গরুর গাড়ি, ফুল, হারিকেন, দাঁড়িপাল্লা, ছাতা, পুস্তক, সাইকেল, হুকা, খেজুরগাছ, ধানের শীষ, দোয়াতকলম, ঘড়ি, কাঠের চেয়ার, আম, টেবিল, আনারস, সাইকেল, তলোয়ার, তালাচাবি, কুড়াল, কাঁচি, হাঁস ও ঢোল।[১৭]

পূর্ববাঙলায় প্রায় ৫ হাজার ১০টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য রিজার্ভসহ ৭ হাজার ৪শত ৮৩ জন প্রিসাইডিং অফিসার। কলেজের প্রফেসর, হাইস্কুল ও হাই মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। কোনো ভোটার যাতে একবারের বেশি ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদানকালে তার আঙুলে অমোচনীয় (যা সহজে ওঠে না) কালির ছাপ দেয়ার বিধান করা হয় এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।[১৮] ভোট দেয়ার জন্য ভোটারকে যাতে পাঁচ মাইলের বেশি হাঁটতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে বুথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য দেড় লক্ষাধিক ব্যালটবাক্স ব্যবহার করা হয় এবং প্রায় দুই কোটি ব্যালট পেপার ছাপানো হয়।[১৯] নিয়ম করা হয় যে, ভোটগ্রহণ ৫ দিনে (৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ) সমাপ্ত হবে।[২০] ভোট গ্রহণকার্য সকাল ৯:৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকেল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে; মাঝখানে ১২:৩০ মিনিট থেকে

---

[১৪] Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, *op.cit.*, p. 8, para-18.
[১৫] *দৈনিক আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[১৬] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩। আরও দেখুন, Govt. of East Bengal (Home Dept: Constitutions and Elections), Election Manual, Vol. I, Rules (Dacca: East Bengal Govt. Press, 1953), p. 56.
[১৭] *প্রাগুক্ত*। আরও দেখুন, ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, পৃ. ১১৯।
[১৮] *দৈনিক আজাদ*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[১৯] *দৈনিক আজাদ*, ৮ মার্চ, ১৯৫৪।
[২০] *দৈনিক আজাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

১:৩০ মিনিট – এই এক ঘণ্টাকাল ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকবে। বিকেল ৫:৩০ মিনিটে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আবেষ্টনী বন্ধ করা হবে। ওই সময়ের পর আর কোনো নতুন লোককে আবেষ্টনীর মধ্যে যারা থাকবেন, ৪:৩০ মিনিটের পরও তাদের ভোট নেয়া হবে।[২১] এই নির্বাচনে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্য ডাকযোগে ভোট দেয়ার সুবিধা দেয়া হয়। সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় : যেসব ভোটার কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কাজে নিজ এলাকা হইতে দূরে আছেন অথবা যাহারা নিবর্তনমূলক আইনে আটক আছেন, তাহারা ডাকযোগে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।[২২]

এখানে উল্লেখ্য, নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য বিরোধী দলসমূহের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এই উদ্দেশে বিভিন্ন বিরোধী দল নানা রকমের দাবি উত্থাপন করে। জনাব ফজলুল হক প্রদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী কমিশনারের নিকট নিম্নলিখিত দাবিগুলো পেশ করেন :

১. মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করিতে এবং নির্বাচনের পূর্বে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২. কোন লোক যাহাতে দুইবার ভোটদান করিতে না পারে, তাহার জন্য ভোটারদের হাতের নখে যে কালির দাগ শ্রীঘ্রই মুছিয়া না যায় সেরূপ কালির চিহ্ন দিতে হইবে।

৩. ... দলসমূহ যাহাতে গুণ্ডামির আশ্রয় লইতে না পারে, তাহার জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সিকি মাইলের মধ্যে স্লোগান উচ্চারণ এবং অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোটা বহন নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৪. ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করিতে এবং ভোটদাতাদের যাতায়াতের এবং স্থান সংকুলানের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫. পুলিশ কর্মচারীসহ সকল সরকারি অফিসার যাহাতে পক্ষপাতমূলক তৎপরতা শুরু না করেন, তজ্জন্য এখনই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে।[২৩]

নির্বাচন কমিশনার জনাব আজকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি নিয়ে পূর্ববাঙলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। গভর্নর মওলানা সাহেবকে

[২১] *দৈনিক আজাদ*, ৬ মার্চ, ১৯৫৪।
[২২] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৫৪।
[২৩] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ নভেম্বর, ১৯৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি দেন।[২৪] যে নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মোছলেম লীগ ও বিরোধী দলগুলোকে সমান সুযোগ দেয়া হইবে এবং কোনো সরকারি কর্মচারি মোছলেম লীগের প্রচার কার্যে সহায়তা করিতেছে। এরূপ সংবাদ পাইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। গভর্নর আরও বলেন, নির্বাচন যাহাতে শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুতার সহিত সম্পন্ন হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে।[২৫] সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে নিজামে এছলাম তার কাউন্সিল অধিবেশন শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস করে:

সরকারি খরচে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনী প্রচারণা চালানো সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেয়ার দাবি জানাইয়া দলমত নির্বিশেষে সকলকেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাইবার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে মাইক ইত্যাদি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্নরের নিকট দাবি জানানো হয়।[২৬]

প্রচার কৌশল

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত এর ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। যদিও ২১ দফা মূলত বাঙ্গালি এলিট গোষ্ঠীরই কর্মসূচি ছিল, তবু এতে শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি-দাওয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এ কর্মসূচি খুব সহজেই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ কর্মসূচি পূর্ববাঙলায় যারা মুসলিম লীগ শাসনের অবসান কামনা করছিলেন তাদের জন্য ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। সরকারপন্থী লোকজন কর্তৃক ২১ দফাকে একটি অবাস্তব কর্মসূচি প্রচার করা সত্ত্বেও জনগণ একে পূর্ববাঙলার 'মুক্তি সনদ' হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন।[২৭]

তবুও একথা বলা যায় না যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে বৈপ্লবিক কোন কিছু ছিল না। কোন কোন দফায় অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগ ছিল বেশি।[২৮] তা সত্ত্বেও ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পূর্ববাঙলার জনগণের জন্য ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

---

[২৪] ঐ, আরও দেখুন, ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।
[২৫] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[২৬] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।
[২৭] M. Rashiduzzaman, "The Awami League in the Political Development of Pakistan", Asian Survey, X:7 (1970), 576.
[২৮] Abu Jafor Shamsuddin Sociology of Bengal Politics, (Dacca 1973), p. 33.

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের সুদক্ষ নির্বাচনী প্রচারণা নির্বাচকমণ্ডলীকে এ ধারণা দিতে সমর্থ হয় যে, মুসলিম লীগ গণবিরোধী, দুর্নীতি পরায়ণ এবং এর শাসন পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া, যুক্তফ্রন্ট যে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী জোট তা মুসলিম লীগ তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনেনি। এমনকি তারা জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন নির্বাচনী কর্মসূচি উপস্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়। ভোটারদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র বক্তব্য ছিল, তারা একটি ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। লীগের মূল স্লোগান ছিল দুটি – এক. 'ইসলাম বিপন্ন', দুই. 'পাকিস্তান বিপন্ন'।[২৯] অর্থাৎ মুসলিম লীগ ভোটারদের কাছে কোন প্রশংসনীয় বিকল্প তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বিমান, বিশেষ ট্রেন ও স্টিমার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এছাড়া মুসলিম লীগ এর প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর ভাড়াটে মওলানাকে নিয়োজিত করে। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পূর্ববাঙলার ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তিকে দাসত্বের চুক্তি বলে সমালোচনা করেন।[৩০] নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলি লীগকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যেমন পাকিস্তান রিভিউ পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে লীগকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয় :

বিরোধীরা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সাধারণ দাবিতে এমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে যাতে মনে করার কারণ রয়েছে যে, তারা কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতেই এভাবে একত্রিত হয়েছে এবং যেকোন প্রকারে ক্ষমতা লাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।[৩১]

অন্যান্য যেসব পত্রিকা নির্বাচনে মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করে সেগুলি হলো *ডন* (করাচি), *মর্নিং নিউজ* (ঢাকা) এবং *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা)। এসব পত্রিকায়ও পূর্ববাঙলার জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানের শত্রুদের সহায়তা করা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন পূর্ববাঙলার জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববাঙলার জনগণ চেয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট যথেষ্ট শক্তি নিয়ে

[২৯] কামাল উদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ' সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯০৪-১৯৭১, ১ম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৭১।

[৩০] Keesings Contemporary Archives, April, 10-17, 1954, 13514. কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

[৩১] The Pakistan Review, 11:3 (1954), 8.

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে জয়লাভ করুক, কেননা তাহলেই তাদের দাবিসমূহ পূরণ করা সম্ভব। মুসলিম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ববাঙলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের তুলনায় শক্তিশালী ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীর মতো অভিজ্ঞ ও সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, পূর্ববাঙলায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন নূরুল আমিন, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সবুর খানের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গ। তাছাড়া, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। মিস ফাতেমা জিন্নাহ, আবদুল কাইউম খান এবং সরদার ইব্রাহিম খান প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর ও নির্ভরশীল ছিল। এরাও নির্বাচনী প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক পত্র-পত্রিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটনা করা হয় এবং বলা হয় যে, "যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য প্রচুর ভারতীয় অর্থ পূর্ববাঙলায় ছড়ানো হয়েছে।"[৩২] যার অর্থ হলো, ভারত আশা করছে যে, যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে সে লাভবান হবে। ২১ দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধেও একই ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ওইসব পত্র-পত্রিকায় এমন অভিযোগও করা হয় যে, পাকিস্তান ও ভারত বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, পাকিস্তানি মুদ্রার অবমূল্যায়ন – যুক্তফ্রন্টে এসব বক্তব্য উত্থাপন বিস্ময়করভাবে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হয়। মুসলিম কর্তৃক ব্যঙ্গচিত্র প্রচার করে তাতে দেখানো হয়, শেরে বাংলা পণ্ডিত নেহেরুর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ফজলুল হক বিড়াল তপস্বী, সোহরাওয়ার্দী আবার বৃহত্তর বাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র করছেন ইত্যাদি এ রকম শত শত মিথ্যা গুজব প্রচারণার মাধ্যমে পূর্ববাঙলায় সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। পুলিশের আইজি সামসুদ্দোহা, অবাঙালি জেলা ম্যাজিস্ট্রেডসহ সরকারি প্রশাসন মুসলিম লীগের পক্ষ হয়ে প্রচারণার কাজ করেন। আদমজী-বাওয়ানী প্রভৃতি শিল্পাপতিরা নির্বাচনে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে এবং মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। এছাড়াও গ্রীন শার্ট নামের এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগের লাঠিয়াল বাহিনী। এ বাহিনীর মূল কাজ ছিল

[৩২] কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন জনসভায় হামলা চালানো এবং দিন দিন তার মাত্রা বাড়তে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন এ বাহিনীর অত্যাচারে অতীষ্ঠ জনগণ পাল্টা আক্রমণ করলে, মুসলিম লীগের এই লাঠিয়াল বাহিনী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আবদুল মালেক[৩৩] জনতার আক্রমণে নিহত হলে মুসলিম লীগ ভিন্ন কৌশল হিসেবে সংঘর্ষের পথ পরিহার করে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার শুরু করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৭০০-৮০০ জনকে গ্রেফতার করে।[৩৪] মুসলিম লীগের এ গ্রেফতার নীতি হিতে বিপরীত হয়ে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা), *মর্নিং নিউজ* (ঢাকা), *ডন* (করাচি) এবং পাকিস্তান রিভিউ পত্রিকা মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার কাজ চালায়। এসব পত্রিকা মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করে পূর্ববাঙলার জনগণকে এই বলে সতর্ক করতে থাকে যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানের শত্রুদের সহায়তা করা। মুসলিম লীগের মুখপত্র *আজাদ* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে পূর্ববাঙলার জনগণকে এ মর্মে সতর্ক করে যে,

> দেশের শাসনভার এহেন নতুন দলের হাতে আজ নূতন পাকিস্তান সত্যই তুলিয়া দিতে পারে কি? পাকিস্তানের ইতিহাসই শুধু নূতন নয়, তার ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশেষত্বপূর্ণ। সুতরাং পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের কথা এখনও ভোটদাতাদিগকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এদিক হইতে প্রতিবেশি ভারতের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কিন্তু গত সাধারণ নির্বাচনে ভারতের ভোটদাতারা কি করিয়াছে? সেখানেও বামপন্থী বহু যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘটা করিয়া নির্বাচন যুদ্ধে নামিয়া ছিল। কিন্তু ভারতীয় ভোটদাতারা সাধারণভাবে সবকে বাতিল করিয়া দিয়া তাদের চির-পরিচিত কংগ্রেসকেই ক্ষমতায় আসীন রাখিয়াছে। সুতরাং মুসলিম লীগ বনাম যুক্তফ্রন্টের লড়াই-এ আগামী নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান কি করিবে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার। এক কথায় আজ দেশের লোক কোনো নবাগত ও অপরীক্ষিত দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার অপরিণামদর্শিতার প্রশ্রয়

[৩৩] *দৈনিক আজাদ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

[৩৪] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি. ১৯৮১), পৃ. ৫০। সমাজ বিজ্ঞানী রঙ্গলাল সেনের মতে প্রায় ১২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়, যাদের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্রষ্টব্য, Rangalal Sen, Political Elites in Bangladesh (Dhaka University Press Ltd., 1986), p. 12. আরও দেখুন, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

> দিতে পারে না। কারণ ইহার অর্থ, জাতীয় স্বার্থকে লড়াই ছিনিমিনি খেলা। ... পাকিস্তানের শত্রুরা আজও ঘরে বাইরে সক্রিয় এবং সুযোগ সন্ধানী। কাজেই আজ পাকিস্তানের প্রত্যেক ভোটদাতাকে এই বিপজ্জনক বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়া তার প্রার্থী নির্বাচন করিতে হইবে। শাসনকার্য পরিচালনায় মোছলেম লীগের দাবিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে অন্য কোনো দল বা ফ্রন্টের কথা বিবেচনা করিয়া দেখার সময়ও আসে নাই এবং কবে তা আসিবে, তাও বলা কঠিন।[৩৫]

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর নেতাকর্মীরাও বেশ চমৎকার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁরাও নিজ নিজ এলকায় নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। তাঁরা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ব্যাপক প্রাদেশিকতা ও দুঃশাসনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করতেন বলে জানা যায়।[৩৬] নির্বাচনী প্রচারণায় ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে। তাঁদের এ অংশগ্রহণের বিষয়টি অনেক বিদেশি পর্যবেক্ষক ভালো চোখে দেখেনি। ঢাকায় অবস্থিত Anglo-American Friends -এ কর্মরত Bernard Lelewellyn নির্বাচনে ছাত্রদের সম্পৃক্ততার তীব্র সমালোচনা করেন।[৩৭] ছাত্রদের এ প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করার কারণ হলো, তারাই যুক্তফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ও পরে সোহরাওয়ার্দীর আহ্বানে সাড়া দেয়।[৩৮] একইভাবে পূর্ববাঙলা থেকে নির্বাচিত পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যরাও এ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। গণপরিষদ নভেম্বর মাসে (১৯৫৩) মূলতবি করা হলে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাঙলায় চলে আসেন এবং স্ব স্ব এলাকায় ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান।[৩৯] বস্তুত, পূর্ববাঙলার অধিবাসীরা বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, একদল যুক্তফ্রন্টের পক্ষ অবলম্বন করে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়।[৪০] তবে পূর্ববাঙলার নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করার জন্য মুসলিম লীগ ২৮ ডিসেম্বর (১৯৫৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সামরিক ও আর্থিক চুক্তি করে ফেলে এবং

---

[৩৫] *দৈনিক আজাদ*, সম্পাদকীয়, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

[৩৬] Safdar Mahmood, *Pakistan Divided* (Islamabad): Alpha & Bravo, 1983), p. 19.

[৩৭] Rangalal Sen, *op. cit.*, p. 126.

[৩৮] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি. ১৯৮১), পৃ. ৫০।

[৩৯] Allen McGrath, The Destruction of Pakistan's Democracy, New York, Oxford University Press, 1990), p. 117.

[৪০] Allen McGrath, The Destruction of Pakistan's Democracy, New York, Oxford University Press, 1996), p. 117.

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চে পিছিয়ে দেয়।[৪১] মুসলিম লীগ সরকারের এটা করার কারণ হলো, তাঁরা মনে করে যে, পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষ তাদের অর্থনৈতিক সচ্চলতার উজ্জল সম্ভাবনা ওই পাক মার্কিন চুক্তির মধ্যে খুঁজে পাবে ও তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করবে। এছাড়া ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ কথাও মনে করে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মিস ফাতেমা জিন্নাহ, মওলানা এহতেশামুল হক থানবীসহ কতিপয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যখন পূর্ববাঙলায় এসে সিলেট, চাঁদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় বিভিন্ন ধরনের জনসভায় "ইসলাম বিপন্ন এবং ইসলামের সংহতি ভ্রাতৃত্ব রক্ষার্থে মুসলিম লীগকে ভোট দেয়া উচিত" বলে ব্যাপক প্রচারিযান চালাচ্ছে তখন সাধারণ জনগণ স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দেবেন। অধিকন্তু, প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী চারবার পূর্ববাঙলায় আসেন এবং নির্বাচনী পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝতে পেরে বগুড়া ও কুষ্টিয়ার জনসভায় পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করে নেন এবং বলেন যে, পুনরায় ক্ষমতায় গেলে পূর্ববাঙলার মুসলিম লীগের নেতৃত্বের রদবদল ঘটাবেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ত করলে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দও তাঁদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, শেখ হিসামুদ্দিন, গোলাম মোহাম্মদ খাঁ লুন্দখোর, মাহমুদুল হক উসমানী ও মিয়া ইফতেখার উদ্দীন প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের নিয়ে নতুন উদ্যোগে প্রচারাভিযান চালাতে শুরু করেন। এ সকল নেতারা আধা বাংলা আধা উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন।[৪২] এ সময়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ উপায়ান্তর না দেখে এক চক্রান্ত শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন ও তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তিনি নির্বাচন এক বছর পিছিয়ে দেবেন ও তাঁকে নুরুল আমিনের স্থলে পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী করবেন যদি তিনি যুক্তফ্রন্ট থেকে সরে দাঁড়ান।[৪৩] কিন্তু ফজলুল হক তাতে রাজি হননি। এ খবর পূর্ববাঙলার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে যুক্তফ্রন্টের জনসমর্থন আরো বৃদ্ধি পায়। যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা তাঁদের প্রচারাভিযান চালানোর সময় অনেক বাধা-বিপত্তি, সমালোচনা ও জেল-জরিমানার শিকার

[৪১] *দৈনিক আজাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

[৪২] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০), পৃ. ৩২০।

[৪৩] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি. ১৯৮১), পৃ. ৫৩। আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

হন। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন নেতাকর্মীকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীকেও গ্রেপ্তার করা হয়।[৪৪]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রচার কৌশলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ১৯৪৬ সালের প্রচার কৌশলের পুনঃব্যবহার। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ব্যবহৃত ফুরফুরা পীর সাহেবের একটি বিবৃতি পুনর্মুদ্রণ করে মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সারাদেশে প্রচার করে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মাওলানা শামসুল হক এবং শর্ষীনার পীর মাওলানা আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসির ফতোয়া দেন যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিলে 'কোরআন ও সুন্নাহর বরখেলাপ করা হবে। এমন কি কোথাও কোথাও ভণ্ড মাওলানারা প্রচার করেন যে, যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিলে 'বিবি তালাক হয়ে যাবে'।[৪৫] নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহ ও তার ছাত্রসংগঠন এবং সরকার পন্থী ছাত্র সংগঠনের মুসলিম লীগকে সমর্থন ও প্রচারণায় অংশগ্রহণ ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র হেজবুল্লাহ এবং সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠন 'অল ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগ' মুসলিম লীগকে সমর্থন করে এবং মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালায়। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহ ফতোয়া দেয় যে, মুসলিম লীগকে সমর্থন করা ওয়াজেব।[৪৬] উপরন্তু মুসলিম লীগকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর সম্পাদক আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন "পাকিস্তানে আদর্শ এছলামী শাসন কায়েম, জাতীয় সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের দীনদার মুসলমানদের পক্ষে মোছলেম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া বর্তমানে শরীয়ত সম্মত অন্য কোন পথ নাই। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে জমিয়তে হেজবুল্লাহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকেই সমর্থন করিবে।[৪৭] এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণনায় তিনি বলেন যে,

> গোপালগঞ্জে আমার নিজের ইউনিয়নে পূর্ববাঙলার এক বিখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হক সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। আমার ধারণা ছিল, মওলানা সাহেব আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু

[৪৪] *দৈনিক আজাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

[৪৫] মোহাম্মদ হাননান, 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১ (ঢাকা আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৯৪-১৯৫। আরও দেখুন, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

[৪৬] *দৈনিক আজাদ*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

[৪৭] *দৈনিক আজাদ*, ৫ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

> এর মধ্যে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এবং আমার বিরুদ্ধে ইলেকশনে লেগে পড়লেন। ঐ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ তাকে খুবই ভক্তি করত। মওলানা সাহেব ইউনিয়নের পর ইউনিয়নে স্পিডবোট নিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন এবং এক ধর্ম সভা ডেকে ফতোয়া দিলেন আমার বিরুদ্ধে যে, আমাকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে।' সাথে শর্ষিনার পীর সাহেব, বরগুনার পীর সাহেব, শিবপুরের পীর সাহেব, রহমতপুরের শাহ সাহেব সকলেই আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন এবং যত কম ফতোয়া দেয়া যায় তাহা দিতে কৃপণতা করলেন না। দুই চারজন ছাড়া প্রায় সকল মওলানা, মৌলভী সাহেবরা এবং তাদের তালেবেলেমরা নেমে পড়ল। একদিকে টাকা, অন্যদিকে পীর সাহেবরা, পীর সাহেবদের সমর্থকরা টাকার লোভে রাতের আরাম ও দিনের বিশ্রাম ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমাকে পরাজিত করার জন্য। কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীও এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল। ঢাকা থেকে পুলিশের প্রধান গোপালগঞ্জে হাজির হয়ে পরিষ্কারভাবে তার কর্মচারীদের হুকুম দিলেন মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে। ফরিদপুর জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আলতাফ গওহর সরকারের পক্ষে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় সরকার তাকে বদলি করে আরেকজন কর্মচারী আনলেন।[৪৮]

অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রধানভাবে 'ইসলামী বুলি, কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ববাঙলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে জনগণের সামনে প্রধানভাবে তুলে ধরে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যুক্তফ্রন্ট প্রচারিত 'জালেম-শাহীর ছয় বৎসর' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রচার পত্রিকায়, যাতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সমালোচনায় পাশাপাশি পাকিস্তানের সমসাময়িক ঘটনাবলীর চালচিত্র ও পূর্ববাঙলার জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়।

মুসলিম লীগের জাঁদরেল নেতা সরদার আবদুল রব নিশতার বলিয়াছেন, 'মুসলিম লীগ এখন সরকারের আজ্ঞাবহ'। কায়েদে আজম চাহিয়াছিলেন সরকারকে মুসলিম লীগের আজ্ঞাবহ করিতে। সর্ব্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন সে মুসলিম লীগ মরিয়া গিয়াছে। এখন গোলাম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই গোলাম এখন জালেমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জনগণকে কিভাবে শাসনের নামে শোষণ ও দমন করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন। তাই আমরা মজলুম জনগণের হাতে মুসলিম

[৪৮] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

লীগের জালীম শাহীর ছয় বৎসর তুলিয়া দিলাম।[৪৯] যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় বিশেষ কৌশল হিসেবে জালেম শাহীর ছয় বৎসর নামক পুস্তিকায় কায়েদে আযমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বেহাল অবস্থা, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের স্বরূপ, জাল মুসলিম লীগের খলিফাদের ত্যাগ ও মুসলিম লীগের নেতাদের অর্থলোভ, বিদেশে পাকিস্তানস্থ দূতাবাসে মদের প্লাবন, চীন-ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা, ইসলামী রাষ্ট্রে মদ ও জুয়া, দেউলিয়া পাকিস্তান, শাসনতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন, খুনির ভূমিকায় মুসলিম লীগ, খাদ্যবস্ত্র ও ঔষধ হতে বঞ্চিত জনগণ, লবণ সঙ্কট, রোগীর পথ্য ও ঔষুধের অব্যবস্থা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা। জমিদার প্রথা বিলোপের ভাঁওতা, পাট কেলেঙ্কারী, কর ভারে পীড়িত দরিদ্র চাষী, বিচার ব্যবস্থা, বাংলা ভাষার অবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় পূর্ববাঙলার জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়।[৫০] একদিকে মুসলিম লীগের বিভিন্ন অপকর্ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুত ২১ দফা কর্মসূচির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ শেষে পূর্ববাঙলার জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ কর্মসূচিকেই স্বাগত জানিয়ে তা গ্রহণ করেছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রতিশ্রুত নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচি হয়ে পড়ে বিগত ৭ বছরে পূর্ববাঙলার মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের চরম অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। এই ২১ দফা কর্মসূচি সুস্পষ্টভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যা দেশের ৯০ শতাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সমর্থন অর্জন করে। যুক্তফ্রন্টের এই ২১ দফা কর্মসূচি জনগণকে খুব তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট করে।

ওই সময়ে যুক্তফ্রন্টের নেতারা 'লবণ সঙ্কটের' ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। লবণের মতো একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এত বেড়ে যায় যে, ঢাকায় তখন এক সের লবণ অসৎ ব্যবসায়ীরা ১৬ টাকা সের পর্যন্ত দামে বিক্রি করতো, অথচ স্বাভাবিক সময়ে প্রতি সের লবণের দাম ছিল দুই থেকে তিন আনা মাত্র। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতারা এই সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিদানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মুসলিম লীগ নেতাদের জন্য আরেকটি বিব্রতকর দিক ছিল ভাষার প্রণেতাদের অসংবেদী মনোভাব। যেমন, ১৯৫৪ সালের ৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে

[৪৯] জালেম-শাহীর ছয় বৎসর' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকায় বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬-৩৮৬।
[৫০] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা দাবি করতে থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় বক্তৃতা দিতে হবে। বিক্ষোভের মুখে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে সক্ষম হননি। জনসভায় সমস্বরে ধ্বনিত হয় "মুসলিম লীগ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক।"[৫১] পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং জনসভা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, যদিও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে পূর্ববাঙলা সফর করেন, তবুও তিনি ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তারে সফল হননি।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংগঠন তথা পূর্ববাঙলার ছাত্র, তরুণ ও যুবকরা মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই ছাত্র, তরুণ ও যুবকরাই যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণজোয়ার সৃষ্টি করে। নির্বাচনী প্রচারণায় বরিশালের বি ডি হাবিবুল্লাহ লীগ শাহীর বিরুদ্ধে জনপ্রিয় সঙ্গীত রচনা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী স্লোগান ছিল – রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, খুনি নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই, হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না, শহীদ স্মৃতি অমর হোক ইত্যাদি। যুক্তফ্রন্টের এই নির্বাচনী প্রচার কৌশল পূর্ববাঙলার জনগণের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রচার কৌশলের গুণকীর্তন করলেও যুক্তফ্রন্টের প্রচারণায় একটি নেতিবাচক দিক ছিল এই যে, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী যেমন যুক্তফ্রন্ট মনোনীত সকল প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করেন ফজলুল হক তেমনটি করেননি। ফজলুল হক তাঁর দলীয় তথা পছন্দ মতো যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকা ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণায় যাননি। অনেকে অভিযোগ করেন নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের সঙ্গে আঁতাত করে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করেন। বস্তুতপক্ষে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ববাঙলার জনগণ যে অভূতপূর্ভ সাড়া দেয় তা দেখে মুসলিম লীগের ভয় পাবার ব্যাপারটি ছিল খুবই স্বাভাবিক। নির্বাচনের পরবর্তী সময় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এ গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেন খোদ যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। অভিযোগে বলা হয়, জনাব

[৫১] কামাল উদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯০৪-১৯৭১, ১ম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

হক তার দলীয় লোকদের এলাকা ভিন্ন আওয়ামী লীগের দলভুক্ত মনোনীত সদস্যদের দুই একটি এলাকা বাদে আর কোন এলাকাতেই সফর করেননি। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি জনাব ভাসানী ও আমাদের অন্যতম নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলমত নির্বিশেষে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের এলাকায় নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত প্রচারণা চালিয়েছেন। জনাব হক যখন বরিশাল জেলায় নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় সফর করছিলেন তখন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মি. মোহাম্মদ আলীর গোপন আমন্ত্রণ পেয়ে বরিশাল জেলার নির্বাচনী সফরসূচি বাতিল করে তিনি রাজধানী ঢাকার বুকে ফিরে এলেন এবং গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, জনাব হক উত্তরবঙ্গে কোন নির্বাচনী প্রচার চালাবেন না এবং হক সাহেবের দলের যে কয়জন লোক নির্বাচনে জয়ী হবে তাদেরকে নিয়ে জনাব হক মুসলিম লীগের বিজয়ী প্রার্থীদের সাথে মিলিতভাবে পূর্ববাঙলায় কোয়ালিশন সরকার কায়েম করবেন। জনাব হকের এ ঘৃণ্য গোপন চুক্তির কথা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মুখপাত্র *দৈনিক ডন*। কাগজের মারফতে আপনারা অনেকেই হয়ত জানতে পেরেছেন।[৫২] যুক্তফ্রন্টের জন্য এর বিভিন্ন শরিক দলের কর্মীরা ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রচারাভিযান ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক ও স্বতস্ফূর্ত। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য শহর থেকে সুদূর লোকালয়ে গিয়েও কাজ করতে থাকে। এমনকি ছাত্ররা ঘরে ঘরে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি প্রচার করার চেষ্টা করে থাকে পূর্ববাঙলার খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারা। যেমন মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে বহু জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং পূর্ববাঙলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবির পক্ষে বাঙালি জনমত সৃষ্টি করেন।[৫৩] বাস্তবিকপক্ষে স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের প্রচারণা ভোটারদের মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা আসলেই খুব শক্তিশালী ও ব্যাপক ছিল। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মওলানা

[৫২] শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বার্ষিক রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫ সন (ঢাকা: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পৃ. ৬-১০। আরও দেখুন, আবুল কাশেম (সংকলন ও সম্পাদনা), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ, ঐতিহাসিক দলিল, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৬২-৬৫।

[৫৩] Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, (Dacca 1975), p. 33. আরও দেখুন, কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ভাসানী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি দলকে (পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) সংগঠিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন এবং সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক রাজনীতির চেয়ে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী-ফজলুল হকের সঙ্গে আঁতাত করে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে মানিক মিয়া উল্লেখ করেন,

> অবস্থা প্রতিকূল বুঝিয়া প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী জনাব ফজলুল হকের সহিত আঁতাতের গোপন প্রচেষ্টা চালাইলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন, নির্বাচন এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হইবে। জনাব ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা হইবে এবং মন্ত্রীসভায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ভিত্তিতে হক সাহেবের দলীয় সদস্য গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু দুটি কারণে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। প্রথম কারণ, মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় শাসনচক্রের আদেশ-নির্দেশ পালন করিতে গিয়েই তিনি প্রদেশে অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন, তাঁর নিজের দোষত্রুটির জন্য নয়। সুতরাং এই অবমাননাকর পন্থায় কেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করা হইবে? দ্বিতীয় কারণ, এ ষড়যন্ত্র যুক্তফ্রন্ট মহলে ফাঁস হইয়া যায়। 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদক বন্ধুবর জহুর হোসেন চৌধুরী এক রাত্রে টেলিফোন যোগে এ গোপন শলাপরামর্শের কথা আমাকে জানাইয়া দেন। ... অঙ্কুরেই এ ষড়যন্ত্র বিনাশ হইয়া যায়।[৫৪]

নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভোটারদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী যশোহরে এক নির্বাচনী সভায় (২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৪) ঘোষণা করেন, মোছলেম লীগ মনোনীত প্রার্থীরা যদি তোমাদিগকে টাকা দিতে চায় তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিও। কিন্তু তাহাদিগকে ভোট দিও না।[৫৫]

প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল নির্বাচনী এলাকার ভোটার প্রতি তিন আনা হিসেবে যা হয়। কিন্তু এ নিয়ম কেউ মেনে ছিলেন বলে মনে হয় না। নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে প্রচারণার বিভিন্ন বাস্তব বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল। *আজাদ* ৪ মার্চ সংখ্যায় ঢাকার চিত্র সম্পর্কে বর্ণনাতে বলে, নির্বাচনের আর ৩ দিন মাত্র বাকি ... প্রচারকার্যের এই শেষ পর্যায়েও লক্ষণীয় বস্তু

[৫৪] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি. ১৯৮৪), পৃ. ৪৯।
[৫৫] *দৈনিক আজাদ*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই যে, একদলের সভা বা শোভাযাত্রায় অপরদল আর বাধা দিতেছে না। একদলের কর্মী শিবিরের সম্মুখ দিয়া বিপক্ষ দলের কর্মীদের সমুন্নত শিরে গমনে আর বাধা নেই। একদলের শিবিরের সম্মুখে নিরুপদ্রবে বিপক্ষদলের সভা হইতেছে, শহরের পথিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহের দেওয়ালগুলি বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র ভঙ্গীর নির্বাচনী আবেদনে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভোটদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণকীর্তন হইতে শুরু করিয়া দলীয় পর্যায়ে প্রতীকের মহিমা কীর্ত্তন প্রভৃতি কোনো কৌশলই নির্বাচনী প্রাচীরপত্র ও প্রচারপত্র, কুশলী শিল্পী ও রচয়িতারা বাদ দেন নাই। লাল, নীল, সবুজ রং-এর কালিতে মুদ্রিত হারিকেন, নৌকা, ছাতা, বন্দুক, দাঁড়িপাল্লা, ধানের শীষ, গরুর গাড়ির চিত্র সম্বলিত পোস্টারের সমারোহ দৃষ্টি মনে হয় না যে, পূর্ববঙ্গে এই সেদিনও কাগজের অভাব ছিল বা এখনও আছে। প্রচারকার্য আরম্ভের শুরুতে লাগানো যে পোস্টারগুলি এতদিনের রোদে, শিশিরে ও বৃষ্টিতে মুছিয়া বা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে সেগুলির উপর নতুন করিয়া তুলি বুলাইয়া আরও আকর্ষণীয় করিয়া তোলা হইতেছে। মুটের মাথায়, রিকশায় ও ঠেলাগাড়িতে করিয়া প্রত্যহ ছাপাখানা হইতে প্রচারপত্র বিলি দেয়া হইতেছে। লীগ ও যুক্তফ্রন্ট ছাড়া অন্যান্য প্রার্থী বা সংখ্যালঘুদের তরফে প্রচারকার্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায় নাই। কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসায় আজ তাহারাও তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। পথিপার্শ্বস্থ গৃহগাত্রে এখন হারিকেন ও নৌকার পাশে ছাতা, দাঁড়িপাল্লা, বন্দুক, ধানের শীষ, গরুর গাড়ি প্রতীক ও শোভা পাইতেছে। 'নৌকা' ও 'হারিকেন' কে দর্শনীয় করিয়া তোলার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। বাঁশ ও কাগজ সহযোগে বিরাটকায় হারিকেন তৈয়ার করিয়া বিদ্যুত সংযোগে তাহা আলোকিত করা হইয়াছে। কয়েকস্থানে বুড়ি গঙ্গার ঘাট হইতে আস্ত নৌকা আনিয়া রাস্তার এপার ওপার করিয়া ঝুলাইয়া দেয়া হইয়াছে। 'নৌকা' ও 'হারিকেন' সমর্থক কর্মীগণ পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া যেসব বাণী চিত্র আঁকিয়াছেন, সেগুলিও কম দর্শনীয় নয়।

নির্বাচনী প্রাচীরপত্র, প্রচারপত্র ও ব্যঙ্গচিত্রের উপরোক্ত দিক ছাড়াও রাস্তায় অলিগলিতে অসংখ্য নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যথেষ্ট হইয়াছে। রাস্তায় একদলের অফিস প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই রাস্তায় অপর দলের অফিস প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম বিলম্ব হয় নাই। প্রতি রাত্রে মহল্লায় মহল্লায় জনসভারও অনুষ্ঠান হইতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গত ২৫ দিনে শহরের বহু স্থানে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্র দুটা পর্যন্ত রাস্তায় এমন বহু সভা হইয়া গিয়াছে।[৫৬]

পল্লী এলাকা সম্পর্কে *আজাদ* পত্রিকায় উল্লেখ করে নিম্নরূপ:

পল্লী এলাকার নির্বাচন কেন্দ্রসমূহ হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রকাশ, সকল কেন্দ্রে পুরাদমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হইয়া গিয়াছে। সভা-সমিতি ছাড়াও ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়া প্রার্থীদের পক্ষ হইতে ভোট প্রার্থনা শুরু হইয়াছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র চোঙ্গা ফুঁকিয়া ভোট চাওয়া হইতেছে।[৫৭]

ঢাকার নির্বাচনের দিন সম্পর্কে *আজাদে* লেখা হয় :

... সকালে শহরের অলিগলি, রাস্তায় বিভিন্ন প্রার্থীর ক্যানভাসাররা পায়ে হাঁটিয়া, রিক্সায়-ট্যাক্সিতে ও ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে এবং বিভিন্ন ভোটারের নিকট নিজ নিজ প্রার্থীর যোগ্যতা শেষ বারের মতো বর্ণনা করে। ট্যাক্সি, রিকশা, ঘোড়ার গাড়িতে আঁটা প্রচারপত্রেও ওই দিন শেষবারের মতো অভিনবত্ব আর চাকচিক্য দেখা যায়। বেলা বৃদ্ধি পাইবার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রার্থীর ক্যানভাসাররা ভোটারগণকে ভোটকেন্দ্রে লইয়া যাইবার জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং স্বীয় গাড়িতে উঠাইবার জন্য ভোটারগণকে দল বাধিয়া অনুনয়-বিনয় করে ... ভোট কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি বিভিন্ন প্রার্থীর শিবিরে শিবিরে ভোটার আর ক্যানভাসারদের মধ্যে উৎসাহের আধিক্য বেশিই দেখা যায়। ক্যানভাসাররা ভোটারগণকে সেখানে পানীয় ও খাবার আপ্যায়ন করিয়া শেষবারের মতো স্বীয় প্রার্থীর সমর্থনে ভোট দিবার জন্য অনুনয় করেন। ভোটারকে আনিবার জন্য ক্যানভাসাররা এই সময় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় দেয়। ভোট দিবার পূর্বে বিভিন্ন ভোটারকে আপ্যায়নের জন্য ক্যানভাসারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা গেলে ও বাম হাতের তর্জনীতে লাল কালির দাগ লইয়া ভোটাররা পোলিং বুথ হইতে বাহিরে আসিবার পর কেহ তাহাদিগকে আপ্যায়ন করে নাই। ভোট দিবার পূর্বে গাড়িতে করিয়া ক্যানভাসাররা ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে লইয়া আসিয়াছে অথচ ভোট দিবার পরে আর কেহ তাহাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিতেছে না বলিয়া বহু ভোটারকে সাক্ষাতে অভিযোগ করিতে শোনা গিয়াছে। ... নির্বাচনের জন্য ওইদিন সকল সরকারি অফিস বন্ধ ছিল। ইহা ছাড়া শিক্ষাঙ্গনসমূহ

[৫৬] *দৈনিক আজাদ*, ৪ মার্চ, ১৯৫৪।
[৫৭] *দৈনিক আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এবং আরও বহু বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকে। ভোটকেন্দ্রগুলির বাইরে ও ভিতরের প্রতিটি বুথের দরজায় পুলিশ প্রহরা মোতায়েন ছিল ... কেন্দ্রের ভিতর প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার আর প্রার্থীদের এজেন্ট ছাড়া কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। বুথে রক্ষিত বাক্সগুলিকে চটের পরদা দ্বারা আড়াল করিয়া রাখা হয়।[৫৮] নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। *আজাদ* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, নির্বাচনী দিবসের পূর্বে নানাজনে নানা প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গতকল্য ঢাকা শহরের ভোটারগণ এবং নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল দল ও ব্যক্তি বিস্ময়কর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়া সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন ... পূর্বে পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।[৫৯] আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি (indelible ink) লাগানোর বিধান করায় এবং East Bengal Electoral Offences Ordinance জারি করায় নির্বাচনে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা হয়নি, কিংবা রিগিং হয়নি।[৬০]

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের জয় লাভের পরিসংখ্যান :

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ববাঙলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা শুরু হয় ১৫ মার্চ থেকে এবং সম্পূর্ণ ফলাফল সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৩টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার ৫জন প্রভাবশালী সদস্য ও পরাজয় বরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী একজন তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজিত হন। খালেক নেওয়াজ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে ৭ হাজারের ও বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।[৬১] শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ আবদুস সেলিমের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলিম লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা, যেমন, মোনায়েম খান, টি. আলী, খান এ সবুর, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল প্রমুখ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত যে মুসলিম লীগ পূর্ববাঙলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, সে মুসলিম লীগের জন্য এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল চরম আঘাত। এমনকি "ইসলামের দোহাই এবং

[৫৮] *দৈনিক আজাদ*, ৯ মার্চ, ১৯৫৪।
[৫৯] *ঐ*।
[৬০] কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২। ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।
[৬১] *ঐ*, পৃ. ৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথক নির্বাচনের ওয়াদা ও মুসলিম লীগকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।[৬২] সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে অবাধে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করেও মুসলিম লীগ পূর্ববাঙলার গণরায়কে পরিবর্তন করতে পারেনি। যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীদের মোহমুক্তিই শুধু ঘটায়নি, তাদের ভীত সন্ত্রস্ত্রও করে তোলে। নির্বাচনী ফলাফলে ২১ দফা কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পূর্ববাঙলার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের আশার সঞ্চার হয়।

সারণি ২ থেকে দেখা যায় যে, ৩০৪টি আসনের জন্য ১২৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২২৮টি আসনে ৯৮৬ জন প্রার্থী, ৩০টি সাধারণ আসনে ১০১ জন প্রার্থী এবং তফসিলী হিন্দুদের ৩৬টি আসনের জন্য ১৫১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অমুসলিম আসনগুলি মুখ্যত পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৬৩]

সারণি ২

পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর সার সংক্ষেপ

নির্বাচনী এলাকা	মোট আসন	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসন সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বি এলাকার মোট ভোটার	প্রদত্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. মুসলমান	২২৮	-	৯৮৬	১,৫১,৫৯,৮২৫	১,৫১,৫৯,৮২৫	৫৬,৯৯৪২৭	৩৭.৬০
২. সাধারণ	৩০	২	১০১	২০,৯৫,৩৫৫	২০,৯৫,৩৫৫	৭,৭৬,৭২৫	৩৯.১৯
৩.তফসিলি হিন্দু	৩৬	-	১৫১	২৩,০৩,৫৭৮	২৩,০৩,৫৭৮	৭,৬৬,২৪৫	৩৩.২০
৪. মহিলা							
ক. মুসলমান	৯	-	৩২	১,৬১,৯৬৬	১,৬১,৯৬৬	৬০,৭৫২	৩৭.৩১
খ. সাধারণ	১	১	-	২৫,৭২৬	-	-	প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন
গ. তফসিলি হিন্দু	২	১	৩	১৪,৭৮৫	৫,০১৪	১,৭৭৯	৩৫.৪৮
৫.পাকিস্তানি খ্রিস্টান	১	১	-	৪৩,৯১১	-	-	প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন
৬. বৌদ্ধ	২	-	১২	১,৩৬,৪১৭	১,৩৬,৪১৭	৩৯,২৮৭	২৮.৮০
মোট	৩০৯	৫	১,২৮৫	১,৯৯,৪১,৫৩৬	১,৯৭,৪৮,৫৬৮	৭৩,৪৪,২১৬	৩৭.১৯

সূত্র : Election Commission of Bangladesh, Report on the Election of East Bengal Legislative Assembly, 1954 (Dhaka: Secretary, Bangladesh Election Commission, May, 1977), p. 22. কামাল উদ্দিন আহমেদ, পৃ. ৪৭৫, ড. মো: মাহবুবর রহমান, পৃ. ১০৬। Najma Chowdhury, p. 167.

[৬২] M. Mahfuzul Huq, Election Problems in Pakistan, (Dacca 1966), 80. আরও দেখুন, কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪।

[৬৩] কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা যায় যে, মুসলিম লীগ কেবলমাত্র রংপুর, যশোর, সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায় আসন লাভ করে। যুক্তফ্রন্ট ৮টি জেলা যথাক্রমে দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা ও মোমেনশাহীতে একচেটিয়াভাবে সবগুলি আসন লাভ করে। খেলাফতে রব্বানী পার্টি যে আসনটি লাভ করে তা ছিল সিলেট জেলায়, স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ রংপুর, রাজশাহী, বাখরগঞ্জ, সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম থেকে তাদের ১২টি আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফলে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ৯টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের মধ্যে সবগুলিই যুক্তফ্রন্ট লাভ করে।[৬৪]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে, সরাসরি যুক্তফ্রন্ট টিকিটে নির্বাচিত মুসলমান সদস্য সংখ্যা ২১৫ জন। এর মধ্যে ফজলুল হক ২টি কেন্দ্র যথাক্রমে পিরোজপুর পশ্চিম এবং পিরোজপুর উত্তর-পূর্ব মুসলমান কেন্দ্র হতে নির্বাচিত হয়ে পিরোজপুর উত্তর-পূর্ব মুসলমান আসনটি ছেড়ে দেন।[৬৫] ফলে যুক্তফ্রন্ট টিকিটে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৪ জন। এতদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৮ জন যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন। ফলে যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৩ জন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম মুসলমান কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করলে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ জন।[৬৬]

সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালের পূর্ববাঙলা আইন পরিষদ নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে দলীয় সংখ্যা দাঁড়ায় যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ১০টি আসন, খেলাফতে রব্বানী পাটি ১টি আসন এবং স্বতন্ত্র ৩টি আসন। নির্বাচনের এ ফলাফলের ভিত্তিতে পূর্ববাঙলার আইন পরিষদে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

[৬৪] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।
[৬৫] *দৈনিক আজাদ*, ১৭ মার্চ, ১৯৫৪।
[৬৬] ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৩

মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল

ক্রমিক নং	জেলা	মোট আসন	যুক্তফ্রন্ট	মুসলিম লীগ	রব্বানী পার্টি	স্বতন্ত্র
১.	দিনাজপুর	৬	৬	-	-	-
২.	রংপুর	১৬	১১	৪	-	১
৩.	বগুড়া	৮	৮	-	-	-
৪.	রাজশাহী	১৩	১২	-	-	১
৫.	পাবনা	৯	৯	-	-	-
৬.	কুষ্টিয়া	৬	৬	-	-	-
৭.	যশোর	৮	৭	১	-	-
৮.	খুলনা	৮	৮	-	-	-
৯.	বাখরগঞ্জ	২০	১৯	-	-	১
১০.	ফরিদপুর	১৪	১৪	-	-	-
১১.	ঢাকা	২৩	২৩	-	-	-
১২.	মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	-	-	-
১৩.	সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪.	ত্রিপুরা	২২	১৫	২	-	৫
১৫.	নোয়াখালী	১৩	১২	-	-	১
১৬.	চট্টগ্রাম	১৩	১১	-	-	২
	মহিলা	৯	৯	-	-	-
	মোট	২৩৭	২১৫	৯	১	১২

সূত্র : *দৈনিক আজাদ*, ২৪ মার্চ ১৯৫৪, ২৫ মার্চ ১৯৫৪, ২ এপ্রিল ১৯৫৪।

সারণি ৪

পূর্ববাঙলার আইন পরিষদ নির্বাচনের ৩০৯টি আসনের দলীয় ফলাফল, ১৯৫৪

ক. ২৩৭টি মুসলমান আসন

যুক্তফ্রন্ট	২১৫টি আসন
মুসলিম লীগ	৯টি আসন
খেলাফতে রব্বানী	১টি আসন
স্বতন্ত্র	১২টি আসন
মোট	২৩৭টি আসন

Dhaka University Institutional Repository

খ. ৭২টি অমুসলমান আসন

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪টি আসন
তফসিলি ফেডারেশন	২৭টি আসন (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩টি আসন (এরমধ্যে গণতন্ত্রী দল ৩টি)
কমিউনিস্ট পার্টি	৪টি আসন
বৌদ্ধ	২টি আসন
খ্রিস্টান	১টি আসন
স্বতন্ত্র	১টি আসন
মোট	৭২টি আসন

সূত্র : Najma Chowdhury, op. cit., p. 171. *আজাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৫৪ সংখ্যায় ফলাফল একটু ভিন্ন রকম দেখানো হয়েছে। দ্রষ্টব্য : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯।

অন্যদিকে অমুসলমান ৭২টি আসনের মধ্যে তফসিলি জাতি ফেডারেশন (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ) সর্বোচ্চ আসন লাভ করে। তারা পায় ২৭টি আসন এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসল লাভ করে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তারা পায় ২৪টি আসন। নির্বাচনের ফলাফলের লক্ষণীয় দিক ছিল মুসলিম লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ৭ জন সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বড় বড় নেতাদের পরাজয়।

সারণি ৫ থেকে দেখা যায় যে, প্রাদেশিক পরিষদের প্রধানমন্ত্রীসহ ৭ জন মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা বিপুল ভোটে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হন, এমন কি অনেকের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতাদের অবস্থান

নির্বাচনী এলাকা	মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পদ মর্যাদা	মুসলিম লীগ প্রার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত ভোট	যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নাম ও প্রাপ্ত ভোট	মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান
১. মোমেনশাহী সদর দক্ষিণ-পূর্ব	প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী	নূরুল আমিন প্রাপ্ত ভোট-১১,৪৭৯	খালেক নওয়াজ প্রাপ্ত ভোট-১৮,০৮৬	৬,৬০৭
২. দিনাজপুর সদর-পশ্চিম	প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী	হাসান আলী প্রাপ্ত ভোট-৭,১৩৩	ফজলে হক প্রাপ্ত ভোট-২০,৯২৫	১৩,৭৯২
৩. উত্তর সিলেট মধ্য-পশ্চিম	প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী	আবদুল হামিদ প্রাপ্ত ভোট-(জানা যায়নি)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ প্রাপ্তভোট-(জানা যায়নি)	১৫,৭২৪
৪. পিরোজপুর পশ্চিম	প্রাক্তন সরবরাহ মন্ত্রী	সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল প্রাপ্ত ভোট-৩,৯৭৩	এ. কে. ফজলুল হক প্রাপ্ত ভোট-১৬,০৯১	১২,১১৮
৫. ত্রিপুরা সদস মধ্য-উত্তর	প্রাক্তন মোহাজের পুনর্বাসন মন্ত্রী	মফিজ উদ্দিন আহমদ প্রাপ্ত ভোট-১০,৬৮০	মোজাফফর আহমদ প্রাপ্ত ভোট-১৫,৬৯৮	৫,০১৮
৬. নারায়ণগঞ্জ উত্তর-পূর্ব	প্রাক্তন বাণিজ্য শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী	সৈয়দ আবদুস সলিম প্রাপ্ত ভোট-২,৪৪৭ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	আফতাব উদ্দীন ভূঁইয়া প্রাপ্ত ভোট-২৩,৫১৪	২১,০৬৭
৭. ফরিদপুর উত্তর-পূর্ব	প্রাক্তন সমবায় ও রিলিফ মন্ত্রী	দ্বারকানাথ বারোরী প্রাপ্ত ভোট-১,৯৪৯ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	গৌরচন্দ্র পাল প্রাপ্ত ভোট-১৬,৮৬৪	১৪,৯১৫
৮. জামালপুর উত্তর-পশ্চিম	পূর্ববাঙলা আইন পরিষদের প্রাক্তন স্পিকার	আবদুল করিম প্রাপ্ত ভোট-৩,৬৯০	রফিকউদ্দীন আহমদ প্রাপ্ত ভোট-১৩,৩৭৩	৯,৬৮৩
৯. জামালপুর মধ্য	প্রাক্তন চীপ হুইফ	ফজলুর রহমান প্রাপ্ত ভোট-৬,০৫৮	খোন্দকার আবদুল হামিদ প্রাপ্ত ভোট-২১,৫৪	১৫,৪৪৬
১০. ঢাকা সদর উত্তর-পূর্ব	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি	ফকির আবদুল মান্নান প্রাপ্ত ভোট-৫,৯৭৯	তাজুদ্দীন আহমেদ প্রাপ্ত ভোট-১৯,০৩৯	১৩,০৬০
১১. খুলনা মধ্য-পশ্চিম	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক	আবদুস সবুর খান প্রাপ্ত ভোট-৭,৭৮৩	আবদুল গণি খান প্রাপ্ত ভোট-১৪,১৬২	৬,৩৭৯
১২. টাঙ্গাইল উত্তর-পূর্ব	কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর চাচা	সৈয়দ হাসান আলী প্রাপ্ত ভোট-১১,২৩৮	চৌধুরী আজহারুল ইসলাম প্রাপ্ত ভোট-১৩,১৯৬	১,৯৫৮

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মার্চ, ১৭ মার্চ, ১৮ মার্চ, ১৯ মার্চ, ২১ মার্চ, ২২ মার্চ, ২৩ মার্চ, ২৪ মার্চ, ৩০ মার্চ ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের পরাজয় সম্পর্কে খোদ মুসলিম লীগ পন্থী *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা মন্তব্য করে,

পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম বিস্ময়কর ফল ঘোষিত হইয়াছে গতকাল। মোমেনশাহী সদর দক্ষিণ-পূর্ব (মোছলেম) নির্বাচন কেন্দ্র হইতে পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন তরুণ যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী জনাব খালেক নওয়াজ খানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। জনাব খালেক নওয়াজ খান পাইয়াছেন ১৮০৮৬ ভোট, জনাব নুরুল আমীন পাইয়াছেন ১১,৪৭৯ ভোট। পূর্ববঙ্গের এই নির্বাচন কেন্দ্রটির দিকে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের উভয় অংশের জনসাধারণের দৃষ্টি নিবন্ধ হইয়াছিল। জনাব ফজলুল হক, জনাব সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই এলাকা সফর করিয়া যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকার্য চালান। জনাব নূরুল আমিনও নিজ কেন্দ্রে বহুদিন অবস্থান করিয়া নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার জন্য সর্বশক্তি ও প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।

অপরদিকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ ব্যয়ে এ কেন্দ্রে গিয়া জনাব নওয়াজের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালান।[৬৭]

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে শহীদ সাহেব বিবৃতির মারফতে বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগ নয়টির বেশি সিট পেলে আমি আশ্চর্য হব।'[৬৮] তিনশর্তের মধ্যে মুসলিম লীগ নয়টা আসনই পেয়েছিল।[৬৯]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মাত্র পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়। পাঁচটি আবেদনের একটিকে গভর্নর ভারত (প্রাদেশিক নির্বাচন, দুর্নীতি ও নির্বাচন আবেদন) আদেশ, ১৯৩৬[৭০] এর তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ অনুচ্ছেদ বলে তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন।

সারণি ৬ -এ ১৯৫৪ সালের পূর্ববাঙলার আইন পরিষদ নির্বাচনের সঙ্গে ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হলো। এতে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের থেকে অনেক বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বেশির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অধিকাংশেরই

---

[৬৭] *দৈনিক আজাদ*, ১৭ মার্চ, ১৯৫৪।

[৬৮] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

[৬৯] *ঐ*, Rangalal Sen, *op. cit.*, p. 157.

[৭০] Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, p. 18.

Dhaka University Institutional Repository

জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে এমন গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুসলিম লীগ বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তণ মন্ত্রী ও বড় নেতার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

সারণি ৬

১৯৫৪ সালের পূর্ববাঙলার আইন পরিষদ নির্বাচনের সঙ্গে ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন

নির্বাচনী এলাকা	মুসলিম লীগ প্রার্থীর নাম	১৯৪৬ সালের নির্বাচন		১৯৫৪ সালের নির্বাচন	
		মুসলিম লীগ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোট	মুসলিম লীগ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট
১. মোমেন শাহী	নূরুল আমিন	২৬.৭১৯	২,৮৫৭	১১,৪৭৯	১৮,০৮৬
২. মফিজউদ্দিন আহমেদ	মফিজউদ্দীন আহমদ	১৬,০৫৩	৯৮৪ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	১০ম ৬৮০	১৫,৬৯৮
৩. নারায়ণগঞ্জ	সৈয়দ আবদুস সলিম	৩৩,৪০০	১,৬৮৪ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	২,৪৪৭ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	২৩,৫১৪
৪. জামালপুর	আবদুল করিম	১০,৭১৬	৫,৫৫৫	৩,৯৬০	১৩,৩৭৩
৫. জামালপুর	ফজলুর রহমান	শতকরা নব্বই ভোট	(জামানত বাজেয়াপ্ত)	৬,০৫৮	২১,৫০৪
৬. খুলনা	আবদুস সবুর খান	২২,৮৫৭ (শতকরা পঁচানব্বই ভোট)	১,৫৪২ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	৭,৭৮৩	১৪.১৬২
৭. ঢাকা	ফকির আবদুল মান্নান	২৫,৯২৯	১,১৫১ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	৫,৯৭৯	১৯,০৩৯
৮. মুন্সিগঞ্জ	আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী	২২,১৪২	৬৯ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	৫,৯৭৯	১৯,০৩৯
৯. মাদারীপুর	এসকেন্দার আলী খান	শতকরা প্রায় একশ ভোট	(জামানত বাজেয়াপ্ত)	৭,৪৯৫	১৫,৪৮৯

সূত্র: *আজাদ*, ২৩ মার্চ, ২৫ মাচ, ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ১৯৪৬ এবং ১৭ মার্চ, ১৮ মার্চ, ১৯ মার্চ, ২১ মার্চ, ২২ মার্চ, ৩০ মার্চ ১৯৫৪

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা চলাকালে মুসলিম লীগ সমর্থিত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা মন্তব্য করে:

মোছলেম নির্বাচনে কেন্দ্রসমূহের সাধারণ ও বিশেষ আসনসমূহের যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, লীগ মোট ১১১টি আসন দখল করিয়াছে। লীগের বিরোধী দল এ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আসন দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে। এক যশোহর জেলার কেন্দ্রসমূহে দশজন লীগ বিরোধীর মধ্যে নয় জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের অন্যতম প্রার্থী মওলবী

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীর জামানত বাজেয়াপ্ত ও হকাই দলের প্রাক্তন মন্ত্রী খাঁন বাহাদুর হাশেম আলী খাঁর ও প্রাক্তন স্পিকার মি. নওশের আলীর (কংগ্রেস) দুই স্থানে পরাজয় এবারের নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৭১]

অর্থাৎ দুটি নির্বাচনের ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণ ভবিষ্যত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনে স্বাচ্ছন্দ আনয়নের লক্ষে মুসলিম লীগকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের দীর্ঘ শাসনামলে পূর্ববাঙলার জনগণের সেই স্বপ্ন তো পূরণ হয়নি বরং মুসলিম লীগ সরকারের নানা রকম অপকর্ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বৈরাচারিতার কারণে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনে তারা মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

কৌশলগত কারণে কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এভাবে কমিউনিস্টরা ১৫টি আসনে জয়লাভ করেন। কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন হাজি মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আবদুল মতিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সরদার ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ তোয়াহা। অন্যান্য যেসব কমিউনিস্ট প্রার্থী সাধারণ আসন (হিন্দু) থেকে নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন বিজয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন কান্তি রায়, পূর্ণেন্দু দস্তিদার এবং সুধাংশু বিমল দত্ত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান মহিলা আসন থেকে সেলিনা বানু নামে একজন মহিলা কমিউনিস্ট প্রার্থী রাজশাহী-পাবনা আসন থেকে নির্বাচিত হন।[৭২]

নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পরবর্তী ফলাফলের পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন উপলক্ষে যে ইশতেহার উপস্থাপন করে তার ওপর পূর্ববাঙলার

[৭১] *দৈনিক আজাদ*, ২৯ মার্চ, ১৯৪৬।
[৭২] কামাল উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের সার কথা ছিল ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ববাঙলার জনগণের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দান, পূর্ববাঙলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার, সমসাময়িক লবণ সঙ্কটসহ পূর্ববাঙলার জনগণের মৌলিক সমস্যা উপস্থাপিত হয়। এ কারণে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার যে শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণ মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তারাই যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে পূর্ববাঙলায় গণজোয়ার সৃষ্টি হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনী ইশতেহারে মুসলিম লীগ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা ছিল অস্পষ্ট। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বাংলা হলেও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগ সরকার ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের এ অযৌক্তিক অন্যায় নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে পূর্ববাঙলার প্রদেশিক মুসলিম লীগ সরকার। মুসলিম লীগ সরকারের এ নীতি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতন পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে। পূর্ববাঙলার জনগণের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিটি ছিল যৌক্তিক। কেননা পাকিস্তানে প্রচলিত ৩২টি ভাষার মধ্যে বাংলা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা।[৭৩] ১৯৫১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬% মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অন্যদিকে উর্দু ভাষী ছিল মাত্র ৭.২%।[৭৪] তাই স্বাভাবিক কারণেই পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পূর্ববাঙলার জনগণের ভাবাবেগের ওপর লক্ষ্য রেখে যুক্তফ্রন্ট তার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রথম দফাতেই ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে 'জালেম-শাহীর ছয় বৎসর' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রচার পুস্তিকায় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়:

[৭৩] Mustafa Chowdhury, *Pakistan-GTS Politics and Bureaucracy* (New Delhi: Associated Publishing House, 1988), p. 22.

[৭৪] A. K. Chowdhury, The Independence of East Bengal: A Historical Process (Dhaka: Jatiya Grantha Kendra, 1984). p. 129.

বর্তমান নির্বাচনের সময় এই মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করা হইবে বলিয়া মিথ্যা স্তোক দিতেছে এবং জাগ্রত জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জনগণ জানে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা যদি নূরুল আমীন সরকারের থাকিত তাহা হইলে অনর্থক এতগুলি ছাত্র ও তরুণের রক্তপান করিয়া নূরুল আমীন তাহার রক্ত পিপাসা মিটাইত না।[৭৫]

যুক্তফ্রন্টের এ প্রচার পুস্তিকায় পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্য তা পূর্ববাঙলার জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। এ প্রচার পুস্তিকায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান দেখানো হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি, পূর্ববাঙলায় মাত্র ২টি, পশ্চিম পাকিস্তানে মেডিকেল কলেজ ৫টি, পূর্ববাঙলায় মাত্র ১টি, পশ্চিম পাকিস্তানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৩টি, পূর্ববাঙলায় মাত্র ১টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে টেক্সটাইল কলেজ ও ফরেস্টারি কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৮টি ও ২টি – পক্ষান্তরে পূর্ববাঙলায় এই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠা পায়নি। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫২৪৬টি, পূর্ববাঙলায় মাত্র ৫৬টি, পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫২৪৬টি, পূর্ববাঙলায় মাত্র ২২১৭টি।[৭৬]

মুসলিম লীগ সরকারের এই বৈষম্য নীতির কারণে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগ কর্তৃক পূর্ববাঙলাকে এই ধরনের বৈষম্য ও একচেটিয়া শোষণের চিত্র পূর্ববাঙলার জনগণের সামনে তুলে ধরে। ফলে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগ বিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে।

প্রশাসনিক বৈষম্যও ব্যাপক ছিল। ১৯৫২ সালের ২৮ মার্চ পাকিস্তান পার্লামেন্টে পূর্ববাঙলার জনৈক সদস্যের উত্থাপিত অভিযোগের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, 'পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক অফিসগুলোতে সাতজন সহকারী সেক্রেটারির মধ্যে একজন ও পূর্ববঙ্গের লোক নেই। বায়ান্নজন সুপারিন্টেন্ডেন্টের মধ্যে মাত্র তিনজন এবং দু'শ ষোলজন সহকারীর মধ্যে পঁচিশজন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবে আরো প্রকাশ, তার দপ্তরে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১

[৭৫] হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৬।
[৭৬] *ঐ*, ৩৮৩, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাজার ৫০ জন তার মধ্যে ১১ জন পূর্ববঙ্গীয়।[৭৭] এছাড়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসার সংখ্যা যেখানে ১১,২৬৪ জন সেখানে পূর্ববাঙলায় মাত্র ৩,৬২৭ জন।[৭৮]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল রাজনৈতিক। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণ ছিল আরো অনেক বেশি সচেতন। এ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণের নিকট স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি অত্যাধিক গুরুত্ব পায়।

বস্তুত লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববাঙলার জনগণকে পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ১৯৪৭ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। মুসলিম লীগ সরকারের এ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান পূর্ববাঙলার জনগণকে ক্ষুব্ধ করে। পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যকার মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট তার নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচির ১৯ নম্বর দফায় সুনির্দিষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু তাই নয় যুক্তফ্রন্ট তার নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ববাঙলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবির যৌক্তিকতা ও জনগণের সামনে তুলে ধরে। বস্তুত ভৌগোলিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব ছিল ব্রিটেন ও কানাডার মধ্যকার দূরত্বের চেয়েও অধিক।[৭৯] এই দূরত্বের কারণেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে কখনও পারস্পরিক সখ্যতা গড়ে উঠা সম্ভব হয়নি। ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে স্বায়ত্তশাসনাধিকার ছিল পূর্ববাঙলার জনগণের একটি যৌক্তিক দাবি। এছাড়াও মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৭-৫৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বৎসর ক্ষমতাসীন থাকার পরও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। অথচ এ সময় পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে সরকার ব্যয় করেছে ৯৬ কোটি টাকা।[৮০]

১৯৫৪ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার রাজনীতিতে জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি তখনো ভূস্বামী

[৭৭] বশির আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৬২।
[৭৮] *ঐ*, পৃ. ৬২।
[৭৯] A. K. Chowdhury, *op. cit.*, pp. 138-139.
[৮০] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু পূর্ববাঙলায় জমিদারদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী, যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[৮১] নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন নতুন, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং এঁদের অনেকেরই পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের।[৮২]

অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার সুফল ছিল যুক্তফ্রন্টের বিজয়। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের এই বিজয় ছিল আশাতীত ব্যাপার। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে দেশে-বিদেশে অনেকেই 'ব্যালট-বাক্স বিপ্লব' নামে আখ্যায়িত করেন। নির্বাচনের পর পূর্ববাঙলা এবং পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ মন্তব্য করেন,

দেশের জনগণ স্বেচ্ছায়, নিজেদের টাকায়, বাজি পোড়াইয়া আনন্দ-উৎসব করিয়া মিছিল বাহির করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস করিয়াছে। নূরুল আমিন-বিজয়ী খালেক নেওয়াজকে লইয়া ঢাকা শহরবাসী যে অভাবনীয় অভূতপূর্ব মিছিল করিয়াছিল, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। যুক্তফ্রন্টের তিন-নেতার এক নেতা শহীদ সাহেবকে করাচিতে যে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেয়া হইয়াছিল। মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডরেন ভাষায় ইহা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনে কায়েদে আযমের সম্বর্ধনার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না।[৮৩]

অন্যদিকে নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে মুসলিম লীগ দল ও সরকার নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। স্বয়ং নূরুল আমিন সাংবাদিকদের নিকট বলেন, 'পূর্ববঙ্গের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।[৮৪] পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান ৯ মার্চ (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গের গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে মুসলিম লীগের অভিযোগ জানান। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মঈনউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন,

---

[৮১] G. W. Choudhury, *Democracy in Pakistan*, p. 58.
[৮২] কামাল উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৭।
[৮৩] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।
[৮৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ মার্চ, ১৯৫৪।

> লীগ মনোনীত প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টদের নিকট হইতে লীগ অফিসে এই মর্মে বহু লিখিত অভিযোগ আসিতেছে যে, অনেক প্রিসাইডিং অফিসার ও অনেক পোলিং অফিসার প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। কতিপয় জোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বহু যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে প্রবেশ করিতে দেয়া হয়। তাহারা নিজেদের দলের জন্য ক্যানভাস করে। অধিকন্তু কয়েকজন মোছলেম লীগ ভোটারকেও টানা হেঁচড়া করেন।[৮৫]

যে আজাদ পত্রিকা ৯ মার্চের সংখ্যায় 'নির্বাচন সুষ্ঠু হইয়াছে বলে মন্তব্য করেছিল, মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় বুঝতে পেরে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঐ পত্রিকায় ১১ মার্চ 'তদন্ত ও প্রতিকার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। ঐ সম্পাদকীয়তে বলা হয়, যে সব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন নাই কিংবা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।[৮৬]

এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের আশাতীত বিজয় ঘটলে পূর্ববাঙলায় বাঙালি-অবাঙালি সম্পর্কেও ফাটল ধরে। এ সময় বাঙালিরা প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারি আমলা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে আসছিল। অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্টের নেতাকর্মীরা নির্বাচন প্রাক্কালে "বাঙালি-বনাম অবাঙালি লড়াই" নামে ব্যাপকভাবে শ্রেণী সচেতনতার সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে এবং নির্বাচনোত্তরকালে তা চরম আকার ধারণ করে। এমনকি বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘর্ষ ও হত্যা ব্যাপকভাবে শুরু করে।[৮৭] ২৩ মার্চ (১৯৫৪) চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়।[৮৮] মুসলিম লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হলে হয়তো এ ধরনের ঘটনা ঘটতো না। অন্যদিকে পূর্ববাঙলার মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ জনগণের এ নির্বাচনী রায় সহজে মেনে নিলেও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থপর নেতারা মনে-প্রাণে তা মেনে নিতে পারেনি। তারা ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। একইভাবে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশগুলোকে নিয়ে এক ইউনিট গঠন করার পূর্ববর্তী তৎপরতাকে আরো জোরদার

---

[৮৫] *দৈনিক আজাদ*, ১০ মার্চ, ১৯৫৪।
[৮৬] *দৈনিক আজাদ*, ১১ মার্চ, ১৯৫৪।
[৮৭] Safder Mahmood, Pakistan Divided, Islamabad: Alpha & Bravo, 1983, p. 19.
[৮৮] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৫৩-১৯৬৬*, *জোনাকী প্রকাশনী*, *পৃ.* ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

করে। জানা যায়, ফজলুল রহমান ও নাজিমুদ্দীন এ ব্যাপারে খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এর কারণ হলো, পূর্ববাঙলার এ নির্বাচনী ফলাফল তাদেরকে খুবই অস্থির করে তোলে। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের নেতাকর্মীরা নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরপরই পূর্ববাঙলা থেকে পূর্বে নির্বাচিত যেসব সদস্য গণপরিষদে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের পদত্যাগ এবং ওই গণপরিষদের নতুন নির্বাচনের দাবি তোলেন।[৮৯] কেননা তাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ববাঙলার এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যেভাবে ভরাডুবি ঘটে তাতে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য যে কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, নির্বাচনী ফলাফল মুসলিম লীগের অবস্থানকে যে দুর্বল করে দেয় তা বাঙালিদের নিকট আর অস্পষ্ট হয়ে থাকেনি। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ববাঙলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা পালনেরও সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তাছাড়া এ নির্বাচনে তাঁদের কেবল নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়নি, বরং তাঁদের সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও স্পষ্টরূপে দেখা দেয়। যদিও এ নির্বাচনে ডি. এন. বারুইর নেতৃত্বাধীন তফশিলি জাতি ফেডারেশনের শোচনীয় পরাজয় ঘটে; তারা একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। তবে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক দলটি ২৭টি আসন[৯০] লাভ করতে সক্ষম হলে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় হিন্দু সদস্যদের প্রবেশ ও দাবি দাওয়া আদায়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। একই ভাবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে এক অভূতপূর্ব বলে মন্তব্য করে। বৃটেনের পত্রিকা "The Daily Mail" সহ কতিপয় পত্রিকা এ নির্বাচনী ফলাফল পূর্ববাঙলার শিল্প ও অভ্যন্তরীণ নীতি এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে বলে মন্তব্য করে।[৯১] বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার এ ধরনের মন্তব্য বাস্তবে রূপ গ্রহণ করার যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে বিভিন্ন লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনার এস আজকার সংবিধান পরিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

[৮৯] Allen McGrath, *op cit.*, pp. 120-121.
[৯০] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৭০।
[৯১] Muhammed Ghulam Kabir, *op. cit.*, p. 40.

বলেন, মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোর প্রধান কারণ ছিল এ সরকার পূর্ববাঙলার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করেনি, এবং তারা এক অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ধারণাই ভোটারদের মুসলিম লীগকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবে।[৯২] কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল নির্মমভাবে প্রমাণ করে মুসলিম লীগ তখন পূর্ববাঙলার জনগণ থেকে কি পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

পূর্ববাঙলায় যুক্তফ্রন্টে এই বিজয়ের তিন মূল স্থপতি ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁরা জনগণকে বিপুলভাবে জাগিয়ে তোলেন।[৯৩] ভোটারদের ওপর ছিল তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব। কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর A Social History of Bengal গ্রন্থে মুসলিম লীগের এ বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন:

এক. নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমর্থন ছিল না। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনেকে মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও এরা ছিলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ।

দুই. জনগণ পাঞ্জাবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'ব্যালট বাক্সের' মাধ্যমে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

তিন. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাঙলার 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের' দাবি পূর্ববাঙলার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়।

চার. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগ ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মুসলিম লীগের এই মনোভাব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে।

---

[৯২] Report of the Constitution Commission, Pakistan, 1961, p. 67. আরও দেখুন, কামাল উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৭।
[৯৩] Syed Qamrul Ahsan, *Politics and Personalities in Pakistan*, (Dacca 1967), p. 94.

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. '৫২ সালের ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। অসাংবিধানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ স্থগিত করার জন্য বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ছয়. লবণ, কেরোসিন তেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহিনীরা ও সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। এটাও মুসলিম লীগের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।[৯৪]

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে অবহেলা দেখান। ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক পুরাতন এবং জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য বিভিন্ন কারণে দল ত্যাগ করেন এবং নতুন দল (যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ)[৯৫] গঠন করেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগকেই দায়ী করে এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগের পূর্ববাঙলা শাখা এবং পূর্ববাঙলার মুসলিম লীগ সরকার এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া দীর্ঘ ৭ বৎসর সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ফলে নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কোনো বক্তব্যই জনগণকে খুশি করতে পারেনি। অপরপক্ষে, ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী এই তিনজনের নির্বাচনী প্রচারণার ফলে 'দেশময় যে প্রাণ চাঞ্চল্যের বন্যা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মতো ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া গেল'। মুসলিম লীগের মুখপত্র *আজাদ পত্রিকা* মুসলিম লীগের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করে:

১. বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি;

২. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব, অবিচার ও শোষণ নীতি;

---

[৯৪] Kamruddin Ahmed, *A Social History of Bengal*, (Dacca 1970), pp. 113-114.

[৯৫] ড. মো: মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাঙলাকে স্বায়ত্তশাসন না দেয়ার প্রস্তাব ও মনোভাব;

৪. পূর্ববাঙলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা;

৫. শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব;

৬. লীগের গণসংযোগের অভাব;

৭. লীগ ও মন্ত্রিত্বের একীকরণ;

৮. লীগের কর্মীর স্বল্পতা এবং লীগের প্রতি ছাত্র ও তরুণ সমাজের বিরূপ মনোভাব;

৯. লীগের ভিতর বিপুল ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাব;

১০. দুর্নীতি দমনে সরকারি ব্যর্থতা এবং এভাবে এ তালিকায় আরো কারণ যোগ করা যাইতে পারে।[৯৬]

নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদ সদস্যবৃন্দের সামাজিক পটভূমি নির্ণয় দুঃসাধ্য ছিল। ১৯৬৭-৬৯ সালে নাজমা চৌধুরী তাঁর গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে ১৯৫৪ এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট তাঁদের জীবনীর বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন। ৩২২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট প্রশ্নমালা প্রেরিত হলেও মাত্র ১২৩ জন (৩৮.২%) প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠান।[৯৭] উক্ত ১২৩ জনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে মিসেস চৌধুরী তাঁদের যে সামাজিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অধিকাংশেই ছিলেন বেশ বয়স্ক। ৬০-এর বেশি বয়স্ক সদস্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৭%, ৩০-এর কম বয়স্ক সদস্য সংখ্যা মাত্র ৮%। ৪৫ এর অধিক বয়স্ক সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১%।[৯৮]

নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। আইন পাস সদস্য সংখ্যা ছিল লক্ষণীয় (৪৫%)। ডাক্তারি পাস ছিলেন ৫%। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ১৮%। ম্যাট্রিক পাস করেনি এমন সদস্য সংখ্যা ৬%, ম্যাট্রিক পাস ৬% এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস ৮%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নন-গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা ২০% (২৪ জন)। এদের মধ্যে ২জন ধনী জমিদার পরিবারের সদস্য, ২ জন বড় জোতদার, ২ জন এমন পরিবারের সদস্য যে পরিবার থেকে ইতিপূর্বে পরিষদ

[৯৬] *দৈনিক আজাদ*, ২২ মার্চ, ১৯৫৪।
[৯৭] Najma Chowdhury, *op. cit*., pp. 309-323.
[৯৮] *Ibid*, pp. 309-311.

সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, ৫জন মোক্তার, ৩জন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকায় পড়াশুনা করতে পারেনি, ১ জন বড় ব্যবসায়ী, ১জন দীর্ঘদিন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, ১জন বিপ্লবী কর্মী। এরা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় সুপরিচিত হওয়ায় কম লেখাপড়া তাঁদের নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। নির্বাচিত সদস্যদের ৬% (৭জন) ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে সকলেই কোনো ধর্মীয় সংগঠনের বা দলের সদস্য ছিলেন এমন নয়। উক্ত ৭ জনের ১ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন নিজামে এছলামী থেকে, ৩ জন মুসলিম লীগ থেকে এবং ২ জন আওয়ামী লীগ থেকে। ১ জনের দলীয় পরিচয় জানা যায়নি। আওয়ামী লীগের সদস্যদ্বয় ১৯৪৭-এর পূর্বে মুসলিম লীগ দলের সদস্য ছিলেন।[৯৯]

নির্বাচিত সদস্যদের পেশার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, আইন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৫১%। জমিদার ভূস্বামী ১১%, শিক্ষাবিদ ৯%, সাংবাদিক ৩%, ডাক্তার ৬%, অন্যান্য ৯%। কেউই শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেননি। অন্যান্য বলতে ধর্মপ্রচার করা, সার্বক্ষণিক রাজনীতি করা, সার্বক্ষণিক জনসেবা করা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।[১০০] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত মাত্র ১৪% -এর ইতোপূর্বে কোনো-না-কোনো আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল।[১০১] এ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫৪ সালে গঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদ পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। এই হার কম হওয়ার কারণ এই, তৎকালীন পার্লামেন্ট সদস্যরা অধিকাংশই মুসলিম লীগের টিকিটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরাজিত হন। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে নবীন – যারা এর পূর্বে জেলা কিংবা থানা পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ছিলেন।[১০২] তবে অন্তত ২৫% সদস্যের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে (ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) সংশ্লিষ্ট থাকার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল।[১০৩]

১৯৫৪ সালের পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। কারণ এটি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল

[৯৯] *Ibid*, pp. 313-316.
[১০০] *Ibid*, pp. 317-320.
[১০১] *Ibid*, pp. 320-321.
[১০২] *Ibid*, pp. 320-321.
[১০৩] ড. মো. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাঙলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার দাবির সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ববাঙলায় সেই যে মুসলিম লীগের পতন ঘটল, এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী হতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনামল

নির্বাচনোত্তর যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ববাঙলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান।[১] ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় হলে এই জোটের অন্যতম নেতা এ. কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রথমে ছোট আকারে ও পরে এক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু তাঁর এ মন্ত্রিসভা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার মধ্য দিয়ে গভর্নরের শাসন জারি করে। এর পর রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর সরকারি দমন-পীড়ন চলতে থাকলে পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক অঙ্গন স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।[২] তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠন ছিল পূর্ববাঙলার চলমান রাজনৈতিক গতিধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনাময়। কারণ দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর থেকে মুসলিম লীগই কেবল পূর্ববাঙলা সরকারের ক্ষমতায় থেকে প্রদেশ পরিচালনা করছিল।[৩] যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনামলকে কয়েকটি পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যায়। যথা:

প্রথমত, এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভা

দ্বিতীয়ত, গভর্নরের শাসন ও যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন

তৃতীয়ত, আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা

চতুর্থত, আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য

এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভা

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী প্রার্থী হননি। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের

[১] ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ২৪৬।

[২] G. W. Choudhury, *Constitutional Development in Pakistan*, 2nd edn. (London: Longman, 1969), pp. 84-102.

[৩] M. Rafique Afzal, *Political Parties in Pakistan 1947-1958*, Islamabad, National Institute of Historical and Cultural Research Islamabad, 1946, vol. I, pp. 72-78.

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করবেন বলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশ নেননি। নির্বাচনে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অংশ না নেয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট পার্লমেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হবেন।[৪] ২ এপ্রিল (১৯৫৪) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রথম বৈঠকে এ. কে. ফজলুল হককে সর্বসম্মতিক্রমে পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হয়।[৫] সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পূর্ববাঙলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান এবং তার নেতৃত্বে ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এ মন্ত্রিপরিষদের দফতর বণ্টন নিম্নরূপ:

এ. কে. ফজলুল হক — অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব;

সৈয়দ আজিজুল হক — শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিক্ষা;

আবু হোসেন সরকার — বিচার, চিকিৎসা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং

আশরাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী — বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ;

প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবদুল হামিদ এবং আওয়ামী লীগের শাহেদ আলী। এ সময় যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরীক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কাউকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ. কে. ফজলুল হক, সৈয়দ আজিজুল হক ও আবু হোসেন সরকার এ তিনজনই কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য ছিলেন এবং আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী ছিলেন নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্য।[৬] উল্লেখ্য, ২ এপ্রিল (১৯৫৪) ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এক সভায়[৭] এ. কে. ফজলুল হককে যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত করার পূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্টের অফিসে আলাদাভাবে মিলিত হন। তারা এ. কে. ফজলুল হককে জোটের নেতা হিসেবে গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছ থেকে সম্ভাব্য নতুন মন্ত্রিসভার তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীকে চাপ দেন। সোহরাওয়ার্দী তাদেরকে এ বলে প্রবোধ দেন যে, এ. কে. ফজলুল

[৪] *দৈনিক আজাদ*, ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪।
[৫] *প্রাগুক্ত*।
[৬] *দৈনিক আজাদ*, ৪ এপ্রিল, ১৯৫৪।
[৭] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *বাংলাদেশের রাজনীতি* ১৯৫৩-১৯৬৬, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

হক জীবন সায়াহ্নে এসে কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এ. কে. ফজলুল হক নিজ দল ও নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আপত্তি আসার কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগের কোনো সদস্যকে তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হননি। অবশ্য তিনি জোট সরকারের প্রতি আওয়ামী মুসলিম লীগের সমর্থন সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন রাতে সাংবাদিকদের কাছে বললেন যে, শ্রীঘ্রই তাঁর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করা হবে। বস্তুত, এ. কে. ফজলুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খানকে তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিলেন না। এমনকি তিনি তাঁদের ব্যাপারে কটোক্তিও করেন। কারণ এ দুইজন নেতা কমিউনিস্ট নামে খ্যাত ছিলেন।[৮] তাঁদেরকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলে নেজামে ইসলাম পার্টির নেতারা যেমন অসন্তুষ্ট হতেন ঠিক তেমনি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচণ্ড রোষাণলে নিপতিত হতেন। তবে এ সময় ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশি করতে আগ্রহীও ছিলেন। তিনি এপ্রিল (১৯৫৪) মাসের শেষদিকে করাচী যান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্যসহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৯] মন্ত্রিসভা গঠনের সময় ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য সহযোগিতা প্রকাশ্যে চেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর মন্ত্রিসভা গঠনের সময় কেন্দ্রীয় সরকার কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেনি, বরং সাহায্য সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেয়।[১০] এদিকে যুক্তফ্রন্টের অপর শরিকদল গণতন্ত্রী দল থেকে কোনো সদস্যকে নতুন মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা না হলে ওই দলের তিন শীর্ষ স্থানীয় নেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর তাঁরা তাঁদের পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে মিলিত হন এবং ২১ দফা বাস্তবায়ন করা হলে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা দেন। এ মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে অনেকেই বিস্মিত হন। ৪ এপ্রিল (১৯৫৪) করাচি রেডিও কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় যে, নতুন মন্ত্রিসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রী দল অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ওই দল দুটোর

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

[৯] Yunas Samad, *A Nation in Turmoil Nationalism and Ethnicity in Pakistan, 1937-1958*, (New Delhi : Sage Publications, 1995), p. 181.

[১০] Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka: University Press Limited, 1986, p. 128.

Dhaka University Institutional Repository

নেতা-কর্মীরা ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করছেন না। এ ধরনের খবর প্রকাশিত হলে জোটের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠতে পারে সে কথা বিবেচনা করেই মওলানা ভাসানী পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ করেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক হবে এ নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ৫ এপ্রিল (১৯৫৪) এক বৈঠকে বসে। এ বৈঠকেই পূর্ববাঙলার বিভিন্ন মহকুমার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীকে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করেন। এ বৈঠকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যতদিন ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ২১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে ততদিন আওয়ামী লীগ সদস্যরা ওই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করা অব্যাহত রাখবেন।[১১] এরপর পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের ওয়ার্কিং কমিটি ও নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবর্গ আতাহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। একইভাবে পাকিস্তান বৌদ্ধ লীগের প্রেসিডেন্ট কিরণ বিকাশ মুৎসুদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ফজলুল হকের নতুন মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১২] তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত সদস্যরা ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। এরপর ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ থেকে সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী ও এ কে ফজলুল হকের মধ্যে আলোচনা পুরো এপ্রিল মাসব্যাপী চলতে থাকে।[১৩] এ আলোচনা চলাকালে যুক্তফ্রন্টের শরীক দল গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা ও ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য আশফাফ উদ্দীন চৌধুরী ১৫ এপ্রিল (১৯৫৪) করাচীতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ছিল না। এটা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ১৭ এপ্রিল (১৯৫৪) আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পত্রিকায় এক বিবৃতি প্রদান করে বলেন, গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ছিল। এর পরদিন কৃষক শ্রমিক পার্টির সেক্রেটারি ও পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য তফাজ্জল হোসেন বলেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম পার্টি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় এবং

[১১] *দৈনিক আজাদ*, ৫ ও ৬ এপ্রিল, ১৯৫৪।

[১২] Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functinging of the East Bengal Legislature, 1947-58*, Dhaka: The University Press, Dacca, 1980, p. 218.

[১৩] *Ibid*, p. 218.

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর কতিপয় নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও বিজয়ী হন। তাঁরা যুক্তফ্রন্টের সদস্য ছিলেন না। তবে তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই গণতন্ত্রী দলের সদস্য ছিলেন।[১৪] এ সময় গণতন্ত্রী দলের মহাসচিব মাহমুদ আলী ফজলুল হককে সতর্কও করে দিয়ে বলেন যে, যদি ফজলুল হক একটি জরুরি বৈঠক ডেকে বিষয়টির নিষ্পত্তি না করেন তবে তার দল চরম কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ফজলুল হক এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠনে সৃষ্ট এ অনাকাঙ্ক্ষিত জট যুক্তফ্রন্টে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্ম দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তা-ই চেয়েছিল এবং তাঁরা তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষাও করতে থাকে।

অন্যদিকে পূর্ববাঙলা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পরাজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহজে মেনে নিতে পারেননি। ১১ এপ্রিল (১৯৫২) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক অলি আহাদ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে বলেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত স্বাধীন।[১৫] এদিকে ফজলুল হক ২৩ এপ্রিল (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে করাচী যান এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করার ইচ্ছা তাঁর প্রাদেশিক সরকারের রয়েছে। তবে তাঁকে যেন প্রধানমন্ত্রী কোনো প্রকারের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তুলে অসঙ্গতভাবে অভিযুক্ত না করে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন, তিনি ফজলুল হককে পূর্ববাঙলার বামপন্থী জোট থেকে যুক্তফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে গণপরিষদে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করানোর খুবই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এ ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অধিকন্তু, সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার দাবি জানালেও ফজলুল হক এ ব্যাপারে কোনো প্রকারের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।[১৬] তবে ২৭ এপ্রিল (১৯৫৪) তিনি ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর নিকট পূর্ববাঙলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবি জানানোর পরে

[১৪] *দৈনিক আজাদ*।
[১৫] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
[১৬] Yunas Samad, *op. cit.*, pp. 181-182.

ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগমন্ত্রী আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ববাঙলায় যতদূর সম্ভব নতুন সংবিধান অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন।[১৭]

শেরে বাংলা ফজলুল হক একবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েই পশ্চিম বাংলা সফর করেন। ৩০ এপ্রিল তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনায় তিনি আবেগ আপ্লুতভাবে বলে বসেন:

রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু, বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোনো শক্তিই কোনদিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাঙালি চিরকাল বাঙালিই থাকিবে।[১৮]

পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং এ নিয়ে অত্যন্ত কুৎসিত রাজনীতি শুরু হয়ে যায়। এমন একটা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এমনিতেই ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে ফজলুল হক কেন এমন মন্তব্য করেছিলেন সে রহস্য আজো উদঘাটিত হয়নি।[১৯]

ফজলুল হক ব্রিটিশ আমলে যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জীবনের সর্বশেষ্ঠ দিনগুলি তিনি অতিবাহিত করেন কলকাতায়। সাবেক অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভূতপূর্ব রাজধানী কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আবেগের বসে আরো বলে ফেলেন, "অতীতের কর্মক্ষেত্রে এসে তিনি রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদের কথা ভুলে যান।"

শেরে বাংলা এর মধ্যে আরো একটি কাণ্ড করে বসেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাকি বলেন (অথবা মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের এটা ষড়যন্ত্রও হতে পারে এবং সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এই জন্যে যে, পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব দ্রুত নাক গলাচ্ছিল) প্রয়োজনবোধে পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।[২০]

---

[১৭] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ ও ২৮ এপ্রিল, ১৯৫৪।

[১৮] ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১৯৮।

[১৯] সাক্ষাতকার ড. মোহাম্মদ হাননান এর সাথে মনি সিংহের দেখুন, ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

[২০] ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নিকট বিশ্লেষণ*, মোঃ সুলতান মিঞা, এ হাকিম এ্যান্ড সন্স, ২৭ আলীমুদ্দিন স্ট্রিট, কলিকাতা, ৭০০০১৬, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

শেরে বাংলার এ উক্তিতে সারা পাকিস্তানে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং শেরে বাংলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে দ্রুত তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির সকল আয়োজন শুরু করা হয়। পাকিস্তানের সকল সংবাদপত্রে খবরগুলোর ফলাও করে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় ফজলুল হক পূর্ববাঙলার পূর্ণ আজাদি দাবি করেছেন। এর অর্থ পূর্ববাঙলাকে করাচি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হককে পাকিস্তানের এক নম্বর দুশমন বলে বর্ণনা করে বলেন, তিনি পূর্ববাঙলার আজাদি ঘোষণা করে ভারতের সাথে তাকে সংযুক্ত করার ঘোষণা করেছেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বলেন, এ সরকার নয়াদিল্লী, পিকিং ও মস্কোর দালাল।[২১] পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ফকীর আবদুল মান্নান ও পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কামরুদ্দীনসহ কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ফজলুল হকের কলিকাতায় প্রদানকৃত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা ফজলুল হকের ভাষণগুলো বিকৃত করে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক, পাকিস্তানের শত্রু এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত করে। পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মওলানা আতাহার আলী ও ফজলুল হকের বিবৃতিকে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং পকিস্তানের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন।[২২] করাচী ডনসহ লন্ডনের পত্রিকায়ও প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতিবাদে ১৯৫৪, ৯ মে শেরে বাংলা বলেন,

> I am surprised to find that interested people and political opponents need in sentences, taken out their context, to suit their political purpose and tried to condemn me a non believer in Pakistan. What I actually said was that I did not believe that the political division of a country could by itself necessarily remove the basis as contact, friendship and mutual dependence.[23]

এমন পরিস্থিতিতে ফজলুল হক নিজ মন্ত্রিসভার অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ সময় ফজলুল হকের সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সুস্পর্ক ছিল না। এর কারণ হলো, সোহরাওয়ার্দী শারীরিক অসুস্থতার দরুণ চিকিৎসার্থে করাচীতে অবস্থান করছিলেন এবং মওলানা ভাসানী ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ফজলুল হকের

---

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

[২২] *দৈনিক আজাদ*, ৪ ও ৬ মে, ১৯৫৪।

[২৩] আবু আল সাইদ, *সাত চল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১০৫।

সঙ্গে সকল ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ প্রায় ছেড়ে দেন।[২৪] আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত না হতে পেরে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে পড়েন।[২৫] তিনিও ওই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধাচরণ করতে সচেষ্ট হন। তিনি ২ মে (১৯৫৪) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত এক উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নেতৃত্ব দেন। এর ফলে ওই সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশের গুলিতে আনুমানিক ছয় সাত বছরের এক বালক নিহত হয়।[২৬] তাছাড়া এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার নেতাকর্মীরা নিজ নিজ এলাকার সভা সমাবেশের আয়োজন করে অবিলম্বে নব নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের তিনি প্রথম পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য ফজলুল হকের কাছে দাবি জানাতে থাকেন। এমতাবস্থায় এ. কে. ফজলুল হক বিভিন্ন সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে নিজ মন্ত্রিসভায় অবস্থান সুদৃঢ় করতে খুবই উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অধিকন্তু, ১০ মে (১৯৫৪) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় আকস্মিক ফজলুল হক ঢুকে পড়েন এবং ভাসানীর নির্দেশ মতো পূর্ববাঙলায় প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করবেন বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[২৭] এখানে উল্লেখ্য, এ. কে. ফজলুল হক কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁর মন্ত্রিসভায় দুইজন হিন্দু সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু তিনি তা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগী হননি। অপরদিকে ১২ মে (১৯৫৪) জসিমুদ্দীন আহমদ, এম. বি. আবদুল হাকিম, ইদরিছ আহমেদ ও আবদুল মতিনসহ আট জন পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করে রাজশাহী বিভাগ থেকে তাঁর মন্ত্রিসভায় সদস্য নিতে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু ফজলুল হক ১৩ মে (১৯৫৪) যখন আরো ১০ জন মন্ত্রীর নাম গভর্নরের নিকট পেশ করে তখন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ও রাজশাহী বিভাগ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে যথাক্রমে দুই জন ও চার জন সদস্য পরবর্তী তৃতীয় দফা মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সময় নেবেন বলে উল্লেখ করেন।

---

[২৪] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০), পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

[২৫] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-৭৫*, পৃ. ২১৩-২১৫।

[২৬] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

[২৭] *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ মে (১৯৫৪) ফজলুল হক যে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করেন তার দফতর বণ্টন ছিল নিম্নরূপ :[২৮]

এ. কে. ফজলুল হক – মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন গণ ও পুনর্বাসন, স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি বিষয়;

আবু হোসেন সরকার – অর্থ;

আতাউর রহমান খান – বেসামরিক সরবরাহ;

আবুল মনসুর আহমদ –জনস্বাস্থ্য;

কফিল উদ্দিন চৌধুরী – বিচার ও আইন;

সৈয়দ আজিজুল হক – শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন;

আবদুল সালাম খান – শিল্প ও শ্রম;

শেখ মুজিবুর রহমান – কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন;

আবদুল লতিফ বিশ্বাস – রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার;

মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন – স্টেট একুইজেশন;

হামিদ উদ্দীন – বাণিজ্য ও বিদ্যুত উন্নয়ন;

রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী – স্বাস্থ্য ও জেল;

ইউসুফ আলী চৌধুরী – কৃষি, বন ও পাট এবং

আশরাফ আলী চৌধুরী – সড়ক ও গৃহ নির্মাণ।

এ মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৫ জন, কৃষক-শ্রমিক পার্টির ৫ জন এবং নেজামে এছলামীর ১ জন। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মন্ত্রিসভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, বয়স ৩৩ বৎসর। ফজলুল হক তাকে পৌত্র বলে অভিহিত করেন।[২৯] কিন্তু ১৫ মে (১৯৫৪) শপথ অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের আদমজী মিলে বাঙালি অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা[৩০] বাধিয়ে দিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, প্রদেশের

[২৮] *দৈনিক আজাদ*, ২১ মে, ১৯৫৪।
[২৯] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ মে, ১৯৫৪।
[৩০] *দৈনিক আজাদ*, ২০ মে, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যর্থ। এ দাঙ্গায় কয়েকশত লোক হতাহত হয়। কেবল আদমজি জুট মিলে ৩৮০টি লাশ পাওয়া যায়।[৩১] কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর ভাষায় ঘোষণা দেয় যে, যুক্তফ্রন্টের সমর্থন লাভ করে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাই এ দাঙ্গা বাঁধিয়েছে।[৩২] এ ঘোষণা দেয়ার কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকার কমিউনিস্ট নামে পরিচিত সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনকে সুনজরে দেখেনি এবং তার কাছে বিষয়টি অসহনীয় ব্যাপার হয়ে পড়ে। বস্তুত, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাঙলায় বসবাসরত অবাঙালিদের যোগসাজশে এ দাঙ্গা বাঁধায়। এটা তাদের পক্ষে খুবই সম্ভবপর ছিল। কারণ মিলের মালিকরা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছিলেন প্রায় সবই পশ্চিম পাকিস্তানি, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকরা ছিলেন বাঙালি। এ বাঙালি শ্রমিকরা মওলানা ভাষানীর ছত্রছায়ায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে ও নির্বাচনে (১৯৫৪) যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ভোট দেয়।[৩৩] আর তা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে একইভাবে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় হলে পূর্ববাঙলার জনগণের নির্বাচনী রায়কে কার্যকর করতে বিলম্ব ঘটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২৩ মার্চ (১৯৫৪) চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধায়। এ সকল দাঙ্গার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করলেও মওলানা ভাসানী ও এ. কে. ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ অস্বীকার করেন।[৩৪] তারা নির্বাচন যুদ্ধে (১৯৫৪) পরাজিত মুসলিম লীগ মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে নির্বাচনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন। ফজলুল হক এ দাঙ্গায় কমিউনিস্টরা জড়িত নেই বলেও ঘোষণা দেন। তবে মওলানা ভাসানী তার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, কমিউনিস্টরা দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।[৩৫] ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ আদমজী জুট মিলে এ দাঙ্গাকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে উদ্যত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জরুরি বৈঠক ডাকে এবং আদমজিতে সহিংস ঘটনার জন্য বাঙালিদেরকে বিশেষ করে তাঁদের নেতাকর্মীদেরকে প্রচণ্ডভাবে দোষারোপ করে।[৩৬] কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রী ডা. মালিক, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সরদার আমীর আজম খান এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ

---

[৩১] *প্রাগুক্ত*।

[৩২] Shyamali Ghosh, *The Awami League 1947-1971*, (Dhaka: Academic Publishers, 1990), p. 14.

[৩৩] Rangalal Sen, *op. cit.*, pp. 129-130.

[৩৪] Shyamali Ghosh, *op. cit*., p. 14.

[৩৫] *দৈনিক আজাদ*, ২ মে, ১৯৫৪।

[৩৬] কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাঙলার সমাজ ও রাজনীতি*, (ঢাকা: স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২৬।

আলীর রাজনৈতিক সচিব আফজল দাঙ্গা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য করাচী থেকে ঢাকায় আসেন। তাঁরা ঢাকা থেকে করাচী প্রত্যাবর্তন করে দাঙ্গা সম্পর্কিত রিপোর্ট পেশ করার পূর্বেই করাচী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্বপঙ্গে ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেন। একইভাবে পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য শহীদুল্লাহ, খালেক নেওয়াজ, আফতাব উদ্দীন ভূঁইয়া ও আবদুল মতিন আদমজী দাঙ্গা নিন্দা জানিয়ে পূর্ববাঙলায় ৯২ (ক) ধারা প্রবর্তনের দাবি জানান।[৩৭] সীমান্ত প্রদেশের শিল্পমন্ত্রী মিয়া জাফর শাহ ও ১৮ মে (১৯৫৪) সোয়াবী তহশিল মুসলিম লীগ কর্মীদের এক বৈঠকে পূর্ববঙ্গের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে এবং পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার তার মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে এক বৈঠকে বসে। এ বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আজম খান আদমজী রিপোর্ট পেশ করেন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ফজলুল হক তার মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্য নিয়ে ২১ মে (১৯৫৪) করাচী পৌঁছেন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন সৈয়দ আজিজুল হক, আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান ও ইউসুফ আলী চৌধুরী। তাঁদের সবার করাচী পৌঁছার দিনই (২১ মে) পাকিস্তান রেডিও কেন্দ্র থেকে এ বলে ঘোষণা প্রদান করা হয় যে, পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক নিজের জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স' এবং 'পাসপোর্ট' ও 'ভিসা' নামে দুটো নয়া মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেছেন এবং তা কেবল সম্পূর্ণ আইন বিরোধী কাজই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।[৩৮] এ. কে. ফজলুল হক এ বিষয়টি নাকচ করে দিয়ে বলেন, এটা নতুন সৃষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় নয়; কেবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা এবং তা দেশ বিভাগ (১৯৪৭) থেকেই চালু রয়েছে। তিনি করাচীতে এক বিবৃতি দিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে করাচীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যখন সমাগত তখন পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলডেথ কূটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শতকরা ৮০টি আসন জয়ের ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু যখন যুক্তফ্রন্ট অবিশ্বাস্য ফললাভ করে জনগণের রায় নিয়ে

[৩৭] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।
[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে আসল, তখন হিলডেথ আবার বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো রদবদল হইবে না বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাবিত হইবে না।[৩৯] এমনকি একটা সময়ে পূর্ববাঙলার প্রবল প্রতিবাদের মুখে ১৯ মে (১৯৫৪) করাচীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণের নামে পাক-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪০] যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করায় মার্কিন সরকার এমনিতেই পূর্ববাঙলার বিরাগভাজন হয়েছিল, তার ওপর প্রতিনিধিত্বহীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করে পূর্ববাঙলার জনগণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়।[৪১] এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করে। *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার করাচীস্থ সাংবাদিক জন. পি. কালাহান (John P. Callahan) ২২ মে (১৯৫৪) করাচীতে এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হওয়ার পরই তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এ সাক্ষাতকারটি ২৩ মে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় শিরোনামে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের সর্বত্র প্রধান আলোচনার বিষয়েও পরিণত হয়।[৪২] কালাহান এ. কে. ফজলুল হকের সাক্ষাতকারের বিবরণীতে বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাষ দেন। তিনি দাবি করেন যে তাঁর প্রশ্নোত্তরে ফজলুল হক বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানোই আমার মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রধান কাজ হবে"। কালাহান আরো বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও অর্থনীতি আলাদা, উভয় অংশের মধ্যে এক হাজার মাইলের ব্যবধান। যোগাযোগের কোনো করিডোর নেই, একমাত্র বিমান পথেই উভয় অঞ্চলে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ইত্যাদি বিষয়কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার জন্য ফজলুল হক 'বাঙালি নৌবাহিনী' গঠন করার বিষয়টিও তাঁকে বলেছেন বলে কালাহান উল্লেখ করেন। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হবে এ প্রশ্নের উত্তরে ফজলুল হক বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার স্বাভাবিকভাবেই তাতে বাধা প্রদান করবে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলে তারা তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

---

[৩৯] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, পৃ. ৫৯।

[৪০] ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, আগামী প্রকাশন, পৃ. ২১১।

[৪১] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

[৪২] Rangalal Sen, *op. cit.,* pp. 130-132.

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, ফজলুল হক কালাহানের সঙ্গে সাক্ষাতকার প্রদানকালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব থেকেই জানতো যে, ফজলুল হকের সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তাপনের স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলবেন। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতার কথা বলে বিকৃত করা কালাহানের বিষয়টি নিয়ে ফজলুল হককে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর ফজলুল হক ২৫ মে (১৯৫৪) কালাহানের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারের মূল বক্তব্য তুলে ধরার এবং নিজেকে অভিযোগ মুক্ত করার জন্য এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন,

> পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটে পরিণত করা উচিত, ইহাই আমাদের আদর্শ এবং আমরা ইহার জন্য সংগ্রাম করিব। আমাদের আদর্শ সাধীনতা ইহা আমি কখনও বলি নাই, ... আমি যদি কিছু বলিয়া থাকি তাহা হইলে তাহা স্বীকার করিবার সাহস আমার আছে।[৪৩]

এরপর বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর নিকট সরাসরি অস্বীকার করলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাসবভনে ফজলুল হক ও কালাহানকে একই বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা করে বিষয়টির চূড়ান্ত সমাপ্তি টানেন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২৭ মে (১৯৫৪) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও ফজলুল হক মন্ত্রিসভার চার সদস্য এক বৈঠকে মিলিত হন এবং পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ফজলুল হক পরে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গেও দেখা করেন। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের জন্য প্রশাসনিক রদবদল করার কাজ শুরু করা হয়; পাকিস্তান সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মহাপরিচালক এন. এম. ইসহাককে বদলি করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়।[৪৪] অপরদিকে ফজলুল হক ও তাঁর সফরসঙ্গী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছে নিজেদের মন্ত্রিসভাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা নিয়ে তার স্থলে আশরাফ উদ্দীনকে বসানোর প্রস্তাব দিয়েও ব্যর্থ হন। এমনকি ফজলুল হক ও তার পাঁচজন

---

[৪৩] *দৈনিক আজাদ*, ২৬ মে, ১৯৫৪।

[৪৪] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

মন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রতিশ্রুতি স্বরূপ বিবৃতি দেন। তারা ঐক্যকণ্ঠে বলেন,

> পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহা এক ও অবিভাজ্য ও কোন কিছুই আমাদিগকে বিভক্ত করিতে পারিবে না। প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হউক, ইহাই আমরা দাবি করি, আমরা প্রদেশসমূহের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করি না এবং প্রদেশগুলির পরপর বিচ্ছিন্ন হউক, ইহাও আমরা চাই না।[৪৫]

সর্বোপরি পূর্ববাঙলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় থাকলে তা বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে এবং তা কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটা ভেবেই আইয়ুব খান, মুশতাক গুরমানী ও ওয়াজেদ আলী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে পূর্ববাঙলা থেকে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করতে পরামর্শ দেন।[৪৬] অবশেষে সকল কূট ও ষড়যন্ত্র যখন চূড়ান্ত তখন ৩০ মে (১৯৫৪) মাত্র ১ মাস ২৭ দিন ক্ষমতায় থাকার পর কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে ৯২ (ক) ধারা জারির মাধ্যমে পূর্ববাঙলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের বিভিন্ন অজুহাত ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ৩০ মে রাতে রেডিও পাকিস্তান থেকে এক বেতার ভাষণ দেন। দীর্ঘ উনত্রিশ মিনিট তিনি জাতির উদ্দেশে যুক্তফ্রন্টেক্ষ বিরুদ্ধে তাঁর নেয়া পদক্ষেপের সাফাই গাইতে থাকেন এবং নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তাঁর ঈর্ষা ও কটূক্তির বাণী ছুড়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের কালিমা লেপন করেন। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রশাসন বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ফজলুল হক মন্ত্রিসভা প্রদেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে ...।

তিনি চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন সেখানে ১৩ ব্যক্তির প্রাণহাণি হয়; ঢাকায় জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় লোকজনের সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যায়ে আদমজি পাটকলের মারাত্মক দাঙ্গা যাতে মহিলা ও শিশুসহ ৪ শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়।

---

[৪৫] *দৈনিক আজাদ*, ৩০ মে, ১৯৫৪।

[৪৬] Yunas Samad, *op. cit.*, p.182.

Dhaka University Institutional Repository

জনাব মোহাম্মদ আলী উল্লেখ করেন, কেন্দ্রের নির্দেশ পাওয়ার পরবর্তীতে জনাব ফজলুল হক সর্বসমক্ষে এই মর্মে সরকারি মত খণ্ডন করেন, তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, যুক্তফ্রন্টের নেতারা এবং উল্টো দাবি করে যে, এসব দাঙ্গার পেছনে কেন্দ্র এবং মুসলিম লীগেরই হাত ছিল।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বলেন, যুক্তফ্রন্ট নেতা ও পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক হচ্ছেন এমন এক রাজনীতিবিদ যিনি নীতিগতভাবেই পাকিস্তান বিরোধী। ... এসব বিবেচনা করেই হক মন্ত্রিসভা বাতিল করা ব্যতীত কেন্দ্রের আর কোনো পথ ছিল না। ...

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করাচীতে পূর্ববর্তী সফরের সময় জনাব হক পূর্ববাঙলায় কমিউনিজমের তৎপরতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ... কিন্তু দ্বিতীয় সফরে তিনি মত দেন যে, পূর্ববাঙলায় কমিউনিজম বা কমিউনিস্টদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

জনাব মোহাম্মদ আলী, রয়টার এস নিউইয়র্ক টাইমসের সাথে জনাব ফজলুল হকের সাক্ষাতকারের উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববাঙলায় স্বাধীনতা আদায় করা, যা পরবর্তীতে তিনি অস্বীকার করেন। অথচ তিন দিন পরেই জনাব ফজলুল হক তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং আমাদের সাথে আলোচনার ফাঁকে এক পর্যায়ে বলেন যে, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে একটি স্বাধীন পূর্ববঙ্গ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি জনাব ফজলুল হকের বিবৃতিসমূহ দেশবাসীর বিচারের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, জনগণের রায় হবে, "ফজলুল হক পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন বিশ্বাসঘাতক"। তিনি ফজলুল হক সম্বন্ধে জনগণের কাছে বলা কায়েদে আজমের মতামতের উদ্ধৃতি দেন যাকে তিনি 'অভিশাপ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর এই বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ ইরানের 'সাদায়ে মরদুম', 'দি এত্তেলাত', 'দি ফরমান' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ করে।[৪৭] অন্যদিকে হকও ঘোষণা দেন, তিনি বার্ধক্যের কারণে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁদের কাছে এ ঘোষণার কোনোই গুরুত্ব বহন করেনি। তাঁরা যুক্তফ্রন্টের সফল নেতৃত্বের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হন মাত্র।[৪৮] তবে একথা সত্য যে, পূর্ববাঙলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫৪) পর নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারকে তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক

[৪৭] *পাকিস্তান অবজারভার*, ৩১ মে ১৯৫৪।
[৪৮] Keith Callard, *Pakistan A Political Study*, pp. 58-59.

Dhaka University Institutional Repository

বরখাস্তকরণ পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক অঙ্গণে এক উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৪৯] বাঙালিরা একে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের গভীর ষড়যন্ত্রের পরিণতি বলে মন্তব্য করেন।[৫০]

দেশরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ববাঙলার নতুন গভর্নর নিযুক্ত হন। মাওলানা ভাসানী তখন শান্তি সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সহযোগে ইউরোপ (প্রাগ) গিয়েছিলেন। ইস্কান্দার মীর্জা সদর্পে ঘোষণা করেন, ভাসানী দেশে ফিরলে গুলি করে হত্যা করা হবে।[৫১]

ইতোমধ্যে ৯২ (ক) ধারা জারির সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতন শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে জেলা ও থানা ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হতে থাকে। সংসদ সদস্যদেরও ঢালাওভাবে গ্রেফতার করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরায় বেআইনি ঘোষণা করা হয়। গ্রেফতার এড়াতে পারলেন শুধু একজন ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আরিফ টিপু।[৫২] তিনি ছিলেন ফুটবল মাঠের নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড়। ফলে মাঠে মাঠে খেলার সুযোগ সংগঠনের যোগাযোগকে তিনি অব্যাহত রাখার সুযোগ পান। এ সময়ের পাকিস্তানি রাজনীতির একজন বিশ্লেষক, এম. রফিক আফজাল মনে করেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই কঠোর ব্যবস্থা (যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল) গ্রহণের পেছনে যে দুটো মূল বিষয় কাজ করেছে তাহলো: প্রথমত, কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনসহ এর ফেডারেল কাঠামো সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিষয়ে সম্মত হওয়ার জন্য যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্বকে রাজি করানোর ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতা, দ্বিতীয়ত, সম্পাদিত মার্কিন সামরিক সাহায্য ও চুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের দলগুলির সর্বসম্মত প্রায় বিরোধিতা।[৫৩]

গভর্নরের শাসন ও যুক্তফ্রন্টের ভাঙন

৯২-ক ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করে। গভর্নর পদে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের স্থলে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দফতরের সচিব ইস্কান্দার

---

[৪৯] Allen McGrath, *The Destruction of Pakistan's Democracy*, New York, Oxford University Press, 1990), p. 119.

[৫০] Safdar Mahmood, *Pakistan Divided* (Islamabad): Alpha & Bravo, 1983), p. 20.

[৫১] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

[৫২] ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*, আগামী প্রকাশন, পৃ. ২০০।

[৫৩] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 16.

মীর্জাকে নিয়োগ দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়ার বর্ণনায় প্রখ্যাত রাজনীতিক লেখক এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মরহুম আবুল মনসুর আহমদ বলেন,

খুব বিশ্রী ও অভদ্রভাবে ৯২-ক ধারা জারি হইয়াছিল। একথা না বলিয়া উপায় নাই। ৯২-ক ধারা জারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যতম মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকারি মন্ত্রিসভা হইতে গ্রেফতার করা হইল। আমাদের বাড়ি হইতে সরকারি গাড়ি টেলিফোন পিয়ন চাপরাশী গার্ড সবই তুলিয়া নেয়া হল। সুপ্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ এই যে মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পরও পনর দিন মন্ত্রীরা সরকারি বাড়িতে থাকিতে এবং সমস্ত সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেলা তা বন্ধ করা হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া আমরা একেবারে মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হইলাম। আগের দিন যারা সরকারি উর্দি পরা সরকারি প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় সরকারি গাড়িতে চলাফেরা করিতেছিলাম, তারাই পরদিন ঈদের মাঠে গেলাম কয়েক মাইল রাস্তা হাটিয়া। কারণ মন্ত্রি-ভবনের মত বড় লোকের এলাকায় রিক্‌শা পাওয়ার উপায় নাই। এজন্য আমি কোন দুঃখ করিলাম না। কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ ভীতচকিত অবস্থায় এই ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাতে তাঁরা যে রাতের বেলাই আমাদিগকে সরকারি ভবন হইতে ধাক্কাইয়া বাহির করিয়া দেন নাই, অথবা আমাদের পিঠের নিচে হইতে সরকারি খাট-পালং এবং আমাদের পাছার নিচে হইতে চেয়ার সোফা টানিয়া নেন নাই, এজন্য আমি মনে মনে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ দিলাম।[৫৪]

৩১ মে (১৯৫৪) মস্কোর বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হয়েছে এবং দেশবাসীর মধ্যে ক্রমাগত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেতার কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তান থেকে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা উচ্ছেদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড চাপ রয়েছে বলেও প্রচার করে। এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববাঙলায় নবনিযুক্ত গভর্ণর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৫৫] এতে বুঝা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা উচ্ছেদের পশ্চাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রবল প্রভাব ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা এবং আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির অজুহাত দেখিয়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে যে উৎখাত করা হয় তার কারণ ছিল

[৫৪] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩-২৬৪।
[৫৫] *দৈনিক আজাদ*, ২, ৬ ও ১০ জুন, ১৯৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার পরপরই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি তুলেছিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক বিরক্তিকব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[৫৬] পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, এ ধরনের ক্ষমতার দর কষাকষি কেন্দ্রীয় সরকার সহজে মেনে নেবে না। এজন্যই ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার পর পূর্ববাঙলায় ব্যাপক রাজনৈতিক নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হয়। ১৭ মে (১৯৫৪) জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ববাঙলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। এক্ষণে তিনিই গভর্নর হিসেবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।[৫৭] জেনারেল মীর্জা ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। অক্টোবরে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করলে প্রথমে স্যার টমাস ইলিস (ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) ও পরে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন এবং তার পরে এ. কে. ফজলুল হক গভর্নর নিযুক্ত হন।[৫৮] জেনারেল মীর্জা গভর্নর হওয়ার পরে পূর্ববাঙলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। কারণ গভর্নরের শাসনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের ৬৫৯ জন সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় ১জন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী (শেখ মুজিবুর রহমান) এবং ১৩ জন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকেও গ্রেফতার করা হয়। জুনের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় এক হাজার বাঙালিকে বন্দি করা হয়।[৫৯] ফজলুল হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দলের অনেক নেতা ও কর্মীকে বন্দি করা হয়। গভর্নরের শাসন জারির সময় মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী বিদেশে অবস্থান করছিলেন। ফলে নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে গভর্নরের শাসন জারি করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ববাঙলায় কোনো প্রতিবাদ কিংবা মিছিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে একদিকে যেমন নেতৃত্ব দিয়ে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি ঠিক তেমনি যুক্তফ্রন্টের অপর কোনো নেতা আধা সামরিক শাসনে নির্যাতনের ভয়ে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যেতে সাহসী হননি। বস্তুত, গভর্নরের পদে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার নিযুক্তি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির নামান্তর হিসেবে উল্লেখ করা যায়।[৬০] অবশ্য ৫ জুন (১৯৫৪) সোহরাওয়ার্দী করাচী থেকে পূর্ব

[৫৬] Allen McGrath, *op. cit.*, p. 119.
[৫৭] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।
[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।
[৫৯] *দৈনিক আজাদ*, জুন মাস, ১৯৫৪।
[৬০] Khalid B. Sayeed, *Politics*, p. 41.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা প্রয়োগের ব্যাপারে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো প্রকার সমালোচনা করেননি। তিনি কেবল পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের অধিবাসীদের শান্ত থাকতে এবং পূর্ববাঙলার গভর্নরকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। ফজলুল হক ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলেন। তিনি গোপনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আপোস করার চেষ্টায় রত হয়ে পড়েন। অধিকন্তু, ২৩ জুলাই (১৯৫৪) ফজলুল হক এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, এক অসতর্ক মুহূর্তে, সম্ভবতঃ উৎসাহের আতিশয্যের বশবতী হইয়া আমি এমন কথা বলিয়াছি, যাহা আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত হয় নাই। আমার বিবৃতির তাৎপর্য হইতে পারে তাহা আমি সেই সময় উপলব্ধি করিতে পারি নাই এবং পাকিস্তানের প্রতি আমি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করি না।[৬১] এর পরই প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী করাচী থেকে ঢাকায় আসেন এবং যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবদুল লতিফ বিশ্বাসের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, শীঘ্রই তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা পুনরায় চালু করবেন।[৬২] ২৮ জুন (১৯৫৪) প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী গণপরিষদে ভাষণ প্রদানকালে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি শাসন প্রবর্তনে অযথা বিলম্ব করা হবে না। ২৪ অক্টোবর (১৯৫৪) তিনি এক অধ্যাদেশ[৬৩] জারি করে গণপরিষদ ভেঙে দেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। কারণ এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রের গণপরিষদ একচ্ছত্রভাবে মুসলিম লীগের দখলে ছিল। যুক্তফ্রন্ট নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৪) নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হওয়ার পর ওই পরিষদের অপসারণের দাবি করছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী বিবৃতি দিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের পরামর্শক্রমে[৬৪] গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার মতো অগণতান্ত্রিক কাজকেও অকুণ্ঠচিত্তে

[৬১] *দৈনিক আজাদ*, ২৪ জুলাই, ১৯৫৪।
[৬২] *দৈনিক আজাদ*, ২৯ জুলাই, ১৯৫৪।
[৬৩] G. W. Choudhury, *op. cit.*, p. 84.
[৬৪] Yunas Samad, *op. cit.*, p.182.

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন জানান।[৬৫] এ সময় আতাউর রহমান খান গভর্নর জেনারেলের এ কাজকে অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই তাতে সম্মত হন। আতাউর রহমান খান আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর সঙ্গে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতেও সচেষ্ট হন।[৬৬] এ সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ফজলুল হক মন্ত্রিসভা উচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একপর্যায়ে বলেন, আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জেল দাঙ্গায় জড়িত ছিলেন এবং পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি শাসন চালু হলে তিনি তখন কোনো এক দফতরে মন্ত্রিত্ব লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর কাজে সফল হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ পরস্পর এমন শত্রুতে পরিণত হন যে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করতেও ভুলে যান।[৬৭] অন্যদিকে ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারি আইন অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তান সরকার পূর্ববাঙলা থেকে ২,০০,০০০ কমিউনিস্ট নেতাকর্মীকে খুঁজে বের করতে এমন অনেকগুলো কমিটি গঠন করে যাদের প্রধান কাজই ছিল পূর্ববাঙলাকে কমিউনিস্ট মুক্ত করা।[৬৮]

অর্থাৎ সন্দেহজনক সকল বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে বন্দি করার পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাঙলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যে ফজলুল হককে দেশ দ্রোহী আখ্যা দেয়া হয়েছিল তাকেই পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।[৬৯] ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আঁতাত করার সুযোগ পেয়ে পূর্ববাঙলায় তার দলের (কৃষক শ্রমিক পার্টি) সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তদবির করতে থাকেন। যদিও যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল

[৬৫] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ অক্টোবর ও ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৪।
[৬৬] কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮।
[৬৭] Yunas Samad, *op. cit.*, p.182.
[৬৮] Allen McGrath, *op. cit.*, p. 120.
[৬৯] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

তথাপি আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর (বগুড়ার মোহাম্মদ আলী) সঙ্গে দেখা করে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগদানের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। মোহাম্মদ আলী স্বীকার করেন যে, প্রাদেশিক পরিষদে বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবি করতে পারেন কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করবেন? আতাউর রহমান খানকে কমিউনিস্ট বলার কারণ এই যে, তিনি ১৯৫২ সালে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।[৭০] উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নেতা যোগদান করেও কম্যুনিষ্ট আখ্যা পাননি, কিন্তু আতাউর রহমান খানকে কমিউনিস্ট বলা হলো। উদ্দেশ্য একটাই পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে ফজলুর রহমানের দলকে ক্ষমতা দেয়া এবং এভাবে যুক্তফ্রন্টকে খণ্ডিত করা। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন ধরানোর কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা অচিরেই সফল হয়। এই সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন,

> এতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেতাদের হল না যে, যুক্তফ্রন্টের দুই গ্রুপকে নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলকে আলাদা আলাদাভাবে তারা যোগাযোগ করছে, যাতে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব পূর্ববাঙলায় এসে বিরাট অভ্যর্থনা পেতে পারেন। হলও তাই। কিন্তু তিনি যা করবেন তা ঠিক করেই রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে যে তিনি যুক্তফ্রন্টকে দ্বিধাবিভক্ত করাবেন সে ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছিল। যদিও পরে শুনেছিলাম, গোলাম মোহাম্মদ ওয়াদা করেছিলেন শহীদ সাহেব জুরিখ থেকে ফিরে আসলেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। বড় বড় শিল্পপতিরা ও কিছু সংখ্যক আমলা কিছুতেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সেটা চাইছিলেন না।[৭১]

উল্লেখ্য, যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় এ. কে. ফজলুল হককে পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই সুবাদে তিনি যুক্তফ্রন্টে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই যখন আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে পূর্ববাঙলা সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা শুরু করেন তখন স্বভাবতই যুক্তফ্রন্টের আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারি নেতা হিসেবে ফজলুল হকের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু এতে

[৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।
[৭১] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের জন্য হিতে বিপরীত হয়। ৩২ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য পার্টি পরিবর্তন করে কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করে। এই ধারা অব্যাহত থাকে, ফলে ২ এপ্রিল (১৯৫৫)-এর মধ্যেই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য সংখ্যা ১৪০ থেকে ৯৮-এ নেমে আসে। তখন কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩৪ থেকে বেড়ে ৬৯ হয় এবং নেজামে এছলামীর সদস্য সংখ্যাও বেড়ে ১২ থেকে ১৯ হয়।[৭২] তাছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেবার কারণে ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে দলবদ্ধ হয় এবং তারা কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে এছলামীকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন দেয়।[৭৩] এভাবে যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে এছলামীকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন দেয়। এভাবে যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে এছলামী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ। কমুনিষ্ট দল ও কমুনিষ্ট দলের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, অন্যদিকে খিলাফতে রব্বানী পার্টি ও কিছু হিন্দু-সদস্য ফজলুল হকের জোট সমর্থন দেন। এভাবে পূর্ববাঙলায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত মুসলমান সদস্যবৃন্দ দুই ধারায় বিভক্ত হয়। আওয়ামী লীগের ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে গ্রহণ করে, অপরদিকে ফজলুল হকের জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে মুসলিম লীগের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।[৭৪]

এখানে উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার কেবল যুক্তফ্রন্ট ভেঙে ক্ষান্ত হয় না, তারা সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগকে বামপন্থীদের সমালোচনার সম্মুখীন করে। ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন অথচ পূর্ববাঙলায় কার দল মন্ত্রিসভা গঠন করবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফজলুল হক জয়লাভ করেন। আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গনের পশ্চাতে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তা কার্যকর ভূমিকা পালন করে বলে মন্তব্য করেন। অপরদিকে আবুল মনসুর আহমদ যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনের জন্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে

[৭২] *দৈনিক আজাদ*, ২০ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪।
[৭৩] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।
[৭৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী করেন।[৭৫] তবে তিনি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে পুনরায় ঐক্য ফিরে না আসার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে অভিযুক্ত করেন।[৭৬] বস্তুত, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের স্বার্থে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের ব্যবহার করে এবং তাঁদেরকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। অবশ্য যুক্তফ্রন্টের ও প্রচণ্ড সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ ধরনের অবস্থা চলতে থাকতেই কেন্দ্রীয় সরকার আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা অর্পণ করে।

আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা

১৯৫৫ সালের ৫ জুন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমোদন দেয়। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে এছলামী, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস।[৭৭] এর ফলে ৬ জুন (১৯৫৫) আবু হোসেন সরকার পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যদিও তিনি এ সময় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তার এ মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন[৭৮] ছিল নিম্নরূপ:

আবু হোসেন সরকার : মুখ্যমন্ত্রী, পরিকল্পনা, স্বরাষ্ট্র ও জনসংযোগ;

আবদুস সালাম খান : যোগাযোগ, পূর্ত, সেচ স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন;

আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী : অর্থ, রাজস্ব দফতরের অর্থ শাখা এবং শিক্ষা;

সৈয়দ আজিজুল হক : বাণিজ্য, শ্রম, শিল্প অর্থ ও রাজস্ব শাখা;

হাশিমুদ্দীন আহমদ : খাদ্য, কৃষি, বিচার ও আইন;

নবনিযুক্ত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ও সমর্থন আছে কি না তা প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবি করা হলেও সরকার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে অস্বীকার করেন। এমনকি পরবর্তী আর্ট মাসেও আইন পরিষদের কোনো সভা আহ্বান করা হয়নি। অন্যদিকে আবু

[৭৫] Najma Chowdhury, *op. cit.*, pp. 181-186.
[৭৬] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৩, ৫৪৪-৫৫৪ ও ৫৫৫। আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।
[৭৭] *দৈনিক আজাদ*, ৭ জুন, ১৯৫৫।
[৭৮] *ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন সরকার পূর্ববাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠন করলে ও তিনি তাঁর দলের সকল শীর্ষস্থানীয় নেতার সমর্থন লাভ করতে পারেননি। তাঁর দলের অনেক নেতাই আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হোক, মনে প্রাণে চাননি। অধিকন্তু, ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালে হামিদুল হক চৌধুরী, আজিজুল হক ও আবু হোসেন সরকার চরম অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।[৭৯] প্রায় একই সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এ নতুন মন্ত্রিসভার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে ঘোষণা দেন। অপরদিকে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতি দেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবেন এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ দেশের সংবিধান প্রণয়নে কোনো রকমের সহযোগিতা করবে না বলে হুমকিও প্রদান করেন। এমনকি সোহরাওয়ার্দী লন্ডনে অবস্থানরত গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[৮০] এমতাবস্থায় ১৩ জুন (১৯৫৫) কৃষক শ্রমিক পার্টি পরবর্তী গণপরিষদ নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে। এর কারণ হলো, পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন শূন্য থাকায় ৩০৫ জন সদসস্যের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। তাছাড়া ২৩৩ জন মুসলিম সদস্যের মধ্যে ৩১ জন সদস্য এবং ৭২ জন অমুসলিম সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৯ জন সদস্যের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু নির্বাচনের দিন ৩০১ জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন; ১ জন অমুসলিম সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগে অযোগ্য প্রমাণিত হন এবং ৩ জন মুসলিম সদস্য ভোট প্রদানে বিরত থাকেন।[৮১] ফলে স্বাভাবিকভাবে এ নির্বাচনে পূর্ববাঙলার প্রধান রাজনীতিবিদ ফজলুল হক, মোহাম্মদ আলী ও সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হন। তাছাড়া এ নির্বাচনী ফলাফলে কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৬টি ও আওয়ামী লীগের মাত্র ১২টি আসন লাভ করতে দেখা যা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এ সময় কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা পরস্পর পরস্পরের দিকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্য এগিয়ে আসেন। অর্থাৎ এটা কেন্দ্রের রাজনীতি স্থিতিশীল এবং পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের দরকার ছিল ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর যে কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি

[৭৯] Mushtaq Ahmad, *Government and Politics in Pakistan*, 2nd Edn. (Karachi: Pakistan Publishing House, 1963), p. 164. আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

[৮০] *দৈনিক আজাদ*, ৯ জুন, ১৯৫৫।

[৮১] *দৈনিক আজাদ*, ২১ জুন, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল তা বজায় রাখার জন্য বাঙালি নেতৃবৃন্দেরও দরকার ছিল। এর পরিণতি মারি চুক্তিতে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে মুখ্যসচিব এন. এস. খান দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করেন। তিনি রাজনীতিবিদদের সর্বদা এ বলে জ্ঞান দান করে যে, প্রদেশের সরকারি আমলারা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম। বস্তুত, তিনি যুক্তফ্রন্টের শরীকদলে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে সর্বদা ফাটল ধরাতে সচেষ্ট থাকেন।[৮২] অন্যদিকে ১৭ জুন (১৯৫৫) মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের এক জনসভা ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ২১ দফার ভিত্তিতে পূর্ববাঙলার পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবি জানান।[৮৩] একইভাবে ২৩ জুন (১৯৫৫) আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ে যদি ব্যর্থ হন তাহলে ওই দল গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করবে।[৮৪] এর পর ৫ জুলাই (১৯৫৫) শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার করাচীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে বলেন, তাঁর মন্ত্রিসভা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আদর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং তিনি দুই তিন জন সংখ্যালঘু সদস্যকে তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে কৃষক শ্রমিক পার্টির ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার ও ফজলুল হকের দেশের বিশেষ করে পূর্ববাঙলার চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অপরদিকে করাচীতে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।[৮৫]

এই রকম পরিস্থিতিতে ৭ জুলাই (১৯৫৫) মারীতে শুরু হয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন। অস্থায়ী গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন মশতাক আহমেদ গরমানী। এ মারী অধিবেশনে নির্বাচিত বাঙালি সদস্যরা যোগদান করেন এবং অধিবেশন পরিচালনায় সোহরাওয়ার্দী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মারীতে দুই তিন দিন ধারাবাহিক

[৮২] Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, (New Delhi: Vikas Publishing House PVT. Ltd., 1982) p. 32.
[৮৩] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
[৮৪] *ঐ*।
[৮৫] *দৈনিক আজাদ*, ৯ জুন, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকগুলি বৈঠকে আলোচনা চলল। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের একত্ব ও সংখ্যা গুরুত্বকে তাঁরা ভয় পান। মেজরিটির জোরে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য করবে। সেজন্য দরকার দুই পাকিস্তানে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা-সাম্য। শুধু সংখ্যা-সাম্য-হলেও চলবে না। পূর্ব পাকিস্তান একদম জোট বাঁধা এক-রংগা একটি ভূখন্ডের একটি প্রদেশ। আর পশ্চিম পাকিস্তান পাঁচভাগে বিভক্ত পাঁচ-রংগা পাঁচটি প্রদেশ। পূর্ব পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে অনবরত ভেদাভেদ সৃষ্টি করবে এবং ডিভাইড এন্ড রুল-নীতি অবলম্বন করিয়া সারা পাকিস্তানে সর্দারি করবে। অতএব, প্রথমতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা গুরুত্ব কমিয়ে সংখ্যা সাম্য প্যারিটি আনতে হবে; দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য একত্রিত করে একটি মাত্র প্রদেশ করা মানতে হবে। এই দুইটা কাজই ইতিপূর্বেই গভর্নর জেনারেল অর্ডিন্যান্স বলে সমাধা হয়ে গিয়েছিল। নয়া গণপরিষদে গভর্নর জেনারেলের আদেশ বলে ৮০ জন মেম্বার করা হয়েছিল ৪০:৪০ করে। পূর্ব- বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি বিশেষতঃ তার নেতা হক সাহেব এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীও এই প্যারিটি ব্যবস্থা মেনে নিতে অসম্মত হন। অন্যদিকে গণপরিষদে বাঙালি সদস্যরাও পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে (১) রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাম্য বজায় (২) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন; (৩) দেশে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচন; (৪) উর্দুর সাথে বাংলার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ ইত্যাদি দাবি পেশ করেন।[৮৬] এভাবে উভয় প্রদেশের দাবি-পাল্টা দাবি পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ দফার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তা মারি চুক্তি নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে নবাব গুরমানী সাহেব ঠাণ্ডা মেজাজ ও মিঠা যবানের রাশভারী, ভদ্র ও পণ্ডিত লোক। বুদ্ধি তাঁর চানক্যের মতো তীক্ষ্ণ। তাঁর তর্কের ধারা ও আলোচনার এপ্রোচ হৃদয়গ্রাহী। প্রধানত তাঁরই মধ্যস্থতায় অবশেষে পাঁচ দফার একটি চুক্তিপত্রের মুসাবিধা চূড়ান্ত হইল। এই পাঁচটি দফা[৮৭] এই:

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট

২. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

[৮৬] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।
[৮৭] *ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য

৪. যুক্ত নির্বাচন

৫. বাংলা-উর্দু রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা লাভ করা।

৮ জুলাই (১৯৫৫) তারিখে নবাব গুরমানী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে 'এক সুসংবাদ' রূপে এই চুক্তি নামার কথা ঘোষণা করলেন। এই বিবৃতিতে তিনি বললেন যে উভয় অঞ্চলের সন্তোষজনক রূপে এই চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়েছে। এ চুক্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, মুশতাক আহমদ গুরমানী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ডা. খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হতে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ সই করেন।[৮৮] বাঙালি নেতৃত্ব সহজেই মারি চুক্তিকে মেনে নেন। এর কারণ হলো, তাঁরা লক্ষ করেন যে, তাঁদের ২১ দফার অনেকটা প্রণয়াধীন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হতে চলছে। অধিকন্তু, সোহরাওয়ার্দী বাঙালি প্রতিনিধিদের মারি চুক্তি মেনে নিতে অনুরোধ করেন। তিনি চুক্তির দফাগুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন এ জন্য যে, পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তান কিছুটা নিজের দাবি ছাড় দিয়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে চলছে; পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ও সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য যেমন বাঙালিরা মেনে নিচ্ছে ঠিক তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ববাঙলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা প্রদান ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবি মেনে নিচ্ছে।[৮৯] একে পূর্ববাঙলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি বলে মন্তব্য করা যায়। কিন্তু বাঙালি নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের কাছে বেশি মাত্রায় স্বার্থ ত্যাগ করলে তারা ব্যাপক সমালোচনার শিকার হন।[৯০] এই মারি চুক্তি সম্পাদনের পরই আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে সমর্থন প্রদানের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রচেষ্টা চালান। গণপরিষদের সংসদীয় পার্টি তথা মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সদস্যরা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর পক্ষ হয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে শুরু করে।

---

[৮৮] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫।

[৮৯] Yunas Samad, *op. cit*., p.174.

[৯০] Moudud Ahmed, *op. cit*., p. 42.

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করে কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যান। পূর্ববাঙলার এ দুটো পার্টির দুটো পক্ষ অবলম্বন করার কারণ হলো: কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো গেলে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের মন্ত্রিসভা টিকে থাকবে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত করতে পারলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না। ... এর কারণ হলো গভর্নর জেনারেল পশ্চিম পাকিস্তানি হওয়ায় বাঙালিদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে রীতি পূর্ব থেকে প্রচলিত আছে তা তিনি লঙ্ঘন করবেন না। এর ফলে তিনি সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন।[৯১] কিন্তু আওয়ামী লীগ সদস্যদের আশা বাস্তবে রূপ নেয়নি। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা তাঁদেরকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা সাম্য নীতি মেনে না নিয়ে ও তাঁদেরকে অন্ততঃ ১০ বছরের জন্য আসন সংরক্ষিত না রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করছে, তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের মুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবি ও সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছেন। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা এ কথাগুলোর বলার পরই আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে মারি চুক্তির একটি অনুলিপি দেখান। কিন্তু এ অনুলিপির সঙ্গে ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত মারি চুক্তির দফাগুলোর মধ্যে তেমন মিল ছিল না। এর একাধিক দফা পরিবর্তন করা হয়। এতে লেখা হয় (ইংরেজিতে) –

১. ওয়ান ইউনিট

২. রিজিওন্যাল রিপ্রেজেন্টেশন

৩. প্যারিটি ইন রিপ্রেজেন্টেশন

৪. জয়েন্ট ইলেটরেট উইথ রিজার্ভেশন ফর শিডিউলড কাস্ট হিন্দুয ফর টেন ইয়ার্স

৫. টু স্টেট ল্যাংগুয়েজেয – উর্দু এন্ড বেংগলি

অর্থাৎ এটি মারি চুক্তি টু কপি নয়। কারণ এর দুই নম্বর দফায় 'রিজিওন্যাল অটনমির' আগে 'ফুল' কথা ছিল, সেটা বাদ দেয়া হয়েছে। তিন নম্বর দফায় প্যারিটির পরে "ইন অল

[৯১] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২-৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

রেসপেক্টসের" স্থলে "ইন রিপ্রেযেন্টেশন" লেখা হইয়াছে। চার নম্বর দফায় 'ইউথ রিজার্ভেশন ইত্যাদি কথা নূতন যোগ করা হয়েছে।[৯২]

এই অবস্থায় ইস্কান্দার মীর্জা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেন যে, মুসলিম লীগ চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এবং তিনি এ ব্যাপারে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তফসিলিসহ কতিপয় হিন্দু নেতাদের সঙ্গে অনেক আলাপ চালানোর পর একটা সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন। এরপর গণপরিষদের সভাপতি মুশতাক আহমদ গুরমানী ও তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের এক সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রিত্ব না দিয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রদান করার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি নয় অথচ তারাই প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য চাচ্ছেন, কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে তাদের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের মতো কোনো দাবিই করছে না, তারা পশ্চিম পাকিস্তানি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেবে বলে তাদের দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেছেন। এভাবে সোহরাওয়ার্দীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাঁকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এনেছিলেন তিনি ইতোপূর্বে অসুস্থতা হেতু নিজ দায়িত্ব মীর্জা ইস্কান্দারের ওপর অর্পণ করেন। এর পর এ নতুন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সোহরাওয়ার্দীর ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও ফজলুল হকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এ সময় সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি পাকিস্তানের রাজনীতিকে সামরিক বেসামরিক আমলামুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।[৯৩] ফলে মীর্জা ইস্কান্দারের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এজন্য বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী না করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেয়। তাছাড়া গভর্নর জেনারেলের পদে গোলাম মোহাম্মদের স্থলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মীর্জা ইস্কান্দারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অপর নেতৃবৃন্দের তেমন সুসম্পর্ক ছিল না, যেমনটি গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে ছিল। অপরদিকে ফজলুল হক সামান্য কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য ব্যতীত প্রায় সকল অমুসলিম সদস্যেরই কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের

[৯২] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭।

[৯৩] Khalid B. Sayeed, Politics, p. 45. আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। আর এটা কেন্দ্রে ও প্রদেশে কোনো মুসলিম পার্টির পক্ষে ক্ষমতায় থাকতে খুবই প্রয়োজন ছিল। এ সময় গণপরিষদের সদস্যরা জোট গঠনের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর স্থলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করতে তা খুবই দরকার ছিল। এর ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ববাঙলার অধিক প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য আবদুল ওহাব খান গণপরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এ অবস্থা চলতে থাকতেই পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার ও ডিপুটি স্পিকার নির্বাচন ৫ আগস্ট (১৯৯৫) অনুষ্ঠিত হয়। স্পিকার পদে আবদুল হাকিম ও ডিপুটি স্পিকার পদে শাহেদ আলী নির্বাচিত হন।[৯৪] এর ফলে নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টিরই বিজয় হয়। পরিষদের হিন্দু সদস্যরা আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট না দিলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী পরাজিত হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা[৯৫] গঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এতে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবদুল লতিফ বিশ্বাস, ফজলুল হক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। তাছাড়া তাঁদের দলের সমর্থক কামিনিকুমার দত্ত ওই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। এর ওপর ভিত্তি করেই মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ২৪ আগস্ট (১৯৫৫) এক বিবৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর সংসদীয় দলের কোনো প্রকারের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেন। তবে ১৯৫৫ সালে আগস্ট মাসে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির কোয়াশিলন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে গণতন্ত্রী দলের সদস্যরা তা সুনজরে দেখেনি। তাঁরা ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করে ওই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। এ সকল নেতৃবৃন্দ ফজলুল হককে জানিয়ে দেন যে, তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করবে তাদের পূর্ববাঙলায় ক্ষমতাসীন আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার সাথে একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত। অবশ্য এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো অগ্রগতি হয়নি। গণতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ তখন চেয়েছিল তাঁদেরকে যেন আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্য ও আওয়ামী লীগের দলছুট সদস্যদেরকে ওই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেবল তাদেরকে করা হয়নি। এমনকি ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) আবু হোসেন সরকার তাঁর মন্ত্রিসভার

[৯৪] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১।
[৯৫] *দৈনিক আজাদ*, ১১ আগস্ট, ১৯৫৫।

সম্প্রসারণ ঘটানোর যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিলেন তাতে ও গণতন্ত্রী দলের সদস্যরা নিজেদের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা দেখছিল না। অপরদিকে জুলাই মাসে (১৯৫৬) শেষ দিকে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগের দলছুট সদস্যরা ও আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার মধ্যে এক বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।[৯৬] এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ দলছুট সদস্যরা আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভাকে সহযোগিতা না করার নীতি গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ফজলুল হক ১১ আগস্ট (১৯৫৫) কেন্দ্রের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর যোগদান পূর্ববাঙলায় আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করে। ভীত শক্ত হওয়ার পরই আবু হোসেন সরকার তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য করাচী যান এবং ফজলুল হকের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এরপর ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) আবু হোসেন সরকার ১০ জন নতুন সদস্যের তালিকা গভর্নরের নিকট পেশ করন। এ পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যরা[৯৭] হলেন:

সৈয়দ মোস্তাগাওসল হক (আওয়ামী লীগ);

গিয়াস উদ্দীন আহমদ (কৃষক শ্রমিক পার্টি);

নাসিরউদ্দীন আহমদ (নেজামে ইসলাম);

জহুরুল হক (আওয়ামী লীগ);

লতিফ হোসেন (কৃষক শ্রমিক পার্টি);

মোহাম্মদুন্নবী চৌধুরী (কৃষক শ্রমিক পার্টি);

বসন্তকুমার দাস (কংগ্রেস);

শরৎচন্দ্র মজুমদার (কংগ্রেস);

মধুসুদন সরকার (তফসিলি ফেডারেশন) এবং

গিয়াসউদ্দীন আহমদ চৌধুরী (কৃষক শ্রমিক পার্টি)।

৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) এই নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগের দলছুট দুই মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। বস্তুত, এ

[৯৬] Najma Chowdhury, *op. cit.*, pp. 181-182.
[৯৭] *দৈনিক আজাদ*, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সময় আবু হোসেন সরকারের প্রয়োজন পড়ে সংসদীয় দলের অন্তর্ভুক্ত শরিক দলের সদস্যদেরকে তাঁর মন্ত্রিসভায় বেশি অন্তর্ভুক্ত করে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখা। অবস্থা চলতে থাকতেই কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) গভর্নর জেনারেলের পদ থেকে গোলাম মোহাম্মদ অবসর গ্রহণ করলে ইস্কান্দার মির্জা স্থায়ীভাবে ওই গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। ফলে এটি পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার জন্য শুভ হয়। ১৯৫৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য হামিদুল হক চৌধুরী কেন্দ্রের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস দফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে তফসিলি জাতি ফেডারেশনের অক্ষয়কুমার দাস ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।[৯৮] এ সময়ে এক ইউনিট বিলের কয়েকটি ধারা নিয়ে গণতন্ত্রী দলের নেতা মাহমুদ আলীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সংসদীয় দলের কতিপয় নেতার মতভেদ হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মাহমুদ আলী তাদের বিপক্ষে ভোট দেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে তাদের দলের কাউন্সিল অধিবেশন ডাকে।[৯৯] এ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী দেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু ও পূর্ববাঙলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য জোরালো দাবি জানান। সোহরাওয়ার্দী তার বক্তৃতায় কেন্দ্র ও পূর্ববাঙলায় ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে তীব্র সমালোচনা করেন। এই কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিন সোহরাওয়ার্দী দলের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলে[১০০] বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।[১০১] এরপর অবশ্য বরিশাল, কুষ্টিয়া, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কতিপয় প্রাদেশিক সদস্য তাদের দলকে অসাম্প্রদায়িক করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। এমনকি তাঁরা নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় মিলিত হয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং একটি স্মারকলিপি সোহরাওয়ার্দীর নিকট পেশ করেন।[১০২] তবে এ

[৯৮] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫।
[৯৯] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।
[১০০] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 21.
[১০১] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫-২৩৬।
[১০২] *দৈনিক আজাদ*, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৫।

অসাম্প্রদায়িক করার প্রস্তাব ১৯৫৩ সালেই উঠেছিল। এ সময় ব্যাপক জনসমর্থন পাওয়ার পর তা করা হয়।[১০৩]

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিলে ওই দলের ২০ জন সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে আলাদা পার্টি গঠন করে।[১০৪] তারা আবু হোসেন মন্ত্রিসভাকে সমর্থনও দেয়। এর পূর্বেও ১৯ জন সদস্য আওয়ামী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন। এর ফলে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪। আওয়ামী লীগের এ ভাঙ্গন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। এর কারণ হলো কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় যুক্তফ্রন্টের 'ধারক ও বাহক' পার্টির মর্যাদা লাভ করে। আর ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচি একক কোনো পার্টির যেমন কর্মসূচি ছিল না ঠিক তেমনি নির্বাচনী সাফল্য একক কোনো পার্টির ছিল না। সকল সাফল্য নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্টের ছিল। সুতরাং আওয়ামী লীগের দলছুট সদস্যরা নিজ দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের তুলনায় যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের প্রতি বেশি আনুগত্য প্রদর্শন করাকে সমীচীন মনে করে। এরপর ১৭ নভেম্বর (১৯৫৫) ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে পূর্ববাঙলার খাদ্য সঙ্কট ও স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এ জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার খাদ্যনীতি সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। অধিকন্তু, গণতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের দলের ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। ইতোমধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ও ইউনাইটেড পার্টির নেতৃবৃন্দ আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। ৭ ডিসেম্বর (১৯৫৫) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ও তাঁর সভাপতির ভাষণে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, ক্ষমতাসীন দল ২১ দফা পালনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।[১০৫] এর কিছুদিন পরই কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, যথাসম্ভব পূর্ববাঙলার স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তফসিলি

[১০৩] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 21.
[১০৪] Najma Chowdhury, *op. cit.*, pp. 189.
[১০৫] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময় আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৯৬৬ সালের ২৭ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য করাচী থেকে ঢাকায় আসেন। ১৯৫৬ সালের ২৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যমতে কাজ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বৈঠক হয়। এ বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, ফজলুল হক, পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ও শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত হন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আবু হোসেন সরকারকে এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, পূর্ববাঙলায় ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভা যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা মন্ত্রিসভাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।[১০৬] অন্যদিকে আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রী সংসদের নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং অলি আহাদকে সম্পাদক করে "সর্বদলীয় কর্মী পরিষদ" গঠন করে ২৯ জানুয়ারি (১৯৫৫) প্রদেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি (১৯৫৬) প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও জনসভার আয়োজন করে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।[১০৭] মওলানা ভাসানী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন সংবিধানে পূর্ববাঙলার জনগণের বিভিন্ন দাবি অন্ড়র্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মওলানা ভাসানী ঢাকার পণ্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন সংবিধানে পূর্ববাঙলার জনগণের বিভিন্ন দাবি অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এই সময় পূর্ববাঙলায় সংবিধান প্রণয়নকে কেন্দ্র করে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা সম্পূর্ণভাবে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কৃষক শ্রমিক পার্টি-জামায়াতে ইসলামী, জামাত-উল-উলামা-ই-ইসলাম। নেজামে ইসলাম এবং অন্যান্য রক্ষণশীল দলগুলো খসড়া সংবিধান সমর্থন করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলো ওই খসড়া সংবিধানের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। আওয়ামী লীগ

[১০৬] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ ও ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৬।
[১০৭] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪-৭৫*, পৃ. ২৩৯-২৪০।

নেতৃবৃন্দ ২১ দফার ভিত্তিতে পূর্ববাঙলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সংবিধানকে ইসলামি সংবিধান আখ্যায়িত করে ২১ জানুয়ারি (১৯৫৬) পাকিস্তানের গণপরিষদে তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ করা হয়। এরপর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ওই গণপরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ করা হয়। এরপর সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলের নেতা হিসেবে ওই সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ৩ মার্চ (১৯৫৬) গণপরিষদে সংবিধান বিল পাস হয় এবং তাতে প্রেসিডেন্টকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। নতুন সংবিধানে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা স্বাক্ষর করেন।[১০৮] প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলুল হক নতুন সংবিধানে স্বাক্ষর দেন। এ সময় পূর্ববাঙলা তথা পাকিস্তানের সর্বত্র সংবিধান বিরোধী বিক্ষোভ চলছিল। পূর্ববাঙলা সর্বদলীয় কর্মপরিষদ ৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৫) এক বৈঠকে মিলিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের নিকট দাবি জানান যে, শীঘ্র প্রাদেশিক পরিষদের সভা আহ্বান করে সংবিধান প্রশ্নে তাঁর মন্ত্রিসভার স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করতে হবে। এ সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম, প্রাণেশ সমাদ্দার, মোহাম্মদ সুলতান ও অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আবু হোসেন সরকারের সঙ্গে সাক্ষাত করে শীঘ্র প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকতে অনুরোধও করেন। আবু হোসেন সরকার এ অধিবেশন ডাকতে অস্বীকৃতি জানালে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ ১২ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৫) পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী "পরিষদ আহ্বান দিবস" পালন করে, শুধু তাই নয়, এ সংগ্রাম পরিষদ ৮-১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) প্রদেশব্যাপী প্রতিরোধ সপ্তাহ ঘোষণা করে এবং ১২ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করেন। অপরদিকে জাতীয় পরিষদে সংবিধান বিল পাস হলে পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৬ মার্চ (১৯৫৬) "শুকরিয়া দিবস" এবং আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ "দাবি দিবস" উদযাপন করেন। আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দল এ "দাবি দিবস" পালনের অন্যতম কর্মসূচি স্বরূপ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। এ জনসভার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মওলানা রাগিব হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আগত পূর্ববাঙলার

[১০৮] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

মহাজের সম্প্রদায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এখানে উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের প্রচণ্ড আপত্তি স্বত্ত্বেও কৃষক, শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, আওয়ামী লীগের দল ছুট সদস্যবৃন্দ, কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি ও গণতন্ত্রী দলের সমবেত ভোটে জাতীয় পরিষদে সংবিধান বিল গৃহীত হয় এবং সোহরাওয়ার্দী ওই সংবিধানে স্বাক্ষর করেন অবশ্য আওয়ামী লীগের অনেক নেতা তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এটা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ২৩ মার্চ (১৯৫৬) প্রজাতন্ত্র দিবস ও ওই দিন হতে সংবিধান চালু করার ঘোষণা দেন। অপরদিকে ১৭ মার্চ (১৯৫৬) সর্বদলীয় কর্মপরিষদ এক সভার আয়োজন করে পূর্ববাঙলার সকল স্তরের লোকদেরকে ওই প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকার কর্তৃক আয়োজিত আনন্দোৎসবে যোগদান না করার আহ্বান জানায়। একইভাবে আওয়ামী লীগের মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান ও অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ওই প্রজাতন্ত্র দিবসের সকল কর্মসূচি বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে সোহরাওয়ার্দী খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি লিখিতভাবে তার দলের নেতাকর্মীদের ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে অনুরোধ করেন।[১০৯] সোহরাওয়ার্দীর প্রেরিত তার বার্তাটি[১১০] নিম্নরূপ:

Oli Ahad

12/1, K. M. Das Lane, Dhaka

"I am deeply grieved and astounded at resolution not to participate on Republic Day which is Pakistan Day (stop) Resentment against constitution should not be carried to extent of dissociation from Pakistan Day. These two matters quiet independent (stop). Pakistan Republic Day will be observed throughout world, special delegations from over forty countries arriving here to participate (stop) East Pakistan dissociation will damage Pakistan cause your resolution will seriously damage cause of party. Don't damage permanent cause for temporary advance (stop). Power is not Pakistan it is temporary agent (stop). Republic Day is state and National function and not party Function, your dissociation is creating grave misunderstanding and being construct as opposition to Republic in spite of in spite of words to the

[১০৯] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩-২৪৭।

[১১০] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

contrary as action more important than words, constitution can be amended (stop) Republic Day is national Day and will be observed every year. Unilateral decision on such important matter most unfortunate. I appeal to you as true patriots to observe Republic Day as Birthday of Republic of Pakistan. (stop) Earnestly request you to reconsider and issue directives to participate in celebrations when you can stnee your resentment against constitution (stop) Everything at stake on this issue.

Republic Day celebrations are state functions and not party functions. This is a good ground for reversing.

Karachi Sadar Night Post 17.3.56 Oli Ahad

Awami League, Simpson Rd.

"Suhrawardy"

এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এভাবে ব্যাপক সমালোচনা ও বিরোধিতা চলতে থাকতেই ২৩ মার্চ (১৯৫৬) সংবিধান জারি করা হয়। এ সময় যুক্তফ্রন্টের ভাঙন ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লে সংবিধানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে এ সময় নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্যরা পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবি জানান। তারা বলেন, আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা যদি ওই ব্যাপারে উদাসীন থাকে তবে তাঁরা সরকারি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। তাঁরা হিন্দু সদস্যদেরকে ওই সময় আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে সুনজরে দেখেননি।[১১১] একইভাবে পূর্ববাঙলার বুদ্ধিজীবীরা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রজাতন্ত্র দিবস পালনকে এক 'ব্যঙ্গ-তামাসার' বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তারা মনে করেছিলেন যে, সদ্য প্রণীত সংবিধানে পূর্ববাঙলাকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছে।[১১২] বস্তুত, সংবিধানটি ছিল এক হতাশাব্যঞ্জক লিখিত দলিল। আইয়ুব খানের ভাষায়,

> ... What the country got was not a constitution but a hotchpotch of alien concepts which had already brought enough confusion and chaos to the

[১১১] Najma Chowdhury, *op. cit.*, p. 184.

[১১২] Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *op. cit.*, p. 37.

Dhaka University Institutional Repository

> country. The constitution, by distributing power between the president, the Prime Minister and his cabinet, and the provinces, destroyed the focal point of power and left no one in a position of control.

এছাড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় ১৯৪৯ সালের আদর্শগত প্রস্তাবকে (objective Resolution) পুণর্ব্যক্ত করা হয়।[১১৩] এদিকে ফজলুল হক ২৪ মার্চ (১৯৫৬) পূর্ববাঙলার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নতুন সংবিধানের অধীনে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ পুনরায় শপথ গ্রহণ করেন। গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট পেশ করার সময়সীমা দুই মাস বৃদ্ধি করে দেন। এতে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে আপাতত রক্ষা পায়। তবে আবু হোসেন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সংবিধান রচনার সুবিধার্থে পূর্ববাঙলার প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন দীর্ঘদিন যাবত ডাকা হচ্ছে না। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল সংবিধানের ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করুক এবং তাতে তাঁর মন্ত্রিসভার অবস্থান দুর্বল হয়ে যাক তা মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার চাননি।[১১৪] এজন্য আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সম্প্রসারণ ঘটান। শুধু তাই নয়। তিনি পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির সংখ্যা ৪০-এ উন্নীত করেন। এর ফলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান "আলী বাবা চল্লিশ চোর" বলে একে ব্যঙ্গ করেন।[১১৫] এছাড়া পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক পরিষদে হিন্দু সদস্যদের মধ্যেও প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। এ কারণেই আবু হোসেন সরকার ৭২ জন অমুসলিম সদস্যদের মধ্যে থেকে তিনজনকে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিছু আবু হোসেন সরকার কর্তৃক পূর্ববাঙলার মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সময় হিন্দু সদস্যরা সোহরাওয়ার্দীকে কলিকাতা দাঙ্গার (১৯৪৬) জন্য দায়ী করে তাঁর দলকে সমর্থন করতে রাজি ছিলেন না। তাছাড়া ফজলুল হক হিন্দু সদস্যদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যুক্ত নির্বাচনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান যাতে প্রণীত হয় তার জন্য তিনি প্রাণপ্রণ চেষ্টা করবেন।

---

[১১৩] Louis D. Hayes, *Politics in Pakistan the Struggle for Legitimacy*, (U.SA, Westview Press, Inc. 1984), p. 65. আরও দেখুন, ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

[১১৪] আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি–পরিক্রমা প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ*, ১৯৫৩-'৯৩, নুরুল হুদা সম্পাদিত, (ঢাকা ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিডেট, ১৯৯৬), পৃ. ৩০।

[১১৫] Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *op. cit.*, p. 37.

পরে সংবিধান প্রণীত হলে সেই সংবিধানের ৩২ (২) ধারায় দেশের রাষ্ট্র প্রধান মুসলিম হওয়ার কথা বলা হয়। ফলে পরিষদের হিন্দু সদস্যরা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদে তাঁদের আরো নিরাপত্তার বিধান রাখার দাবি জানান। এ সময় তাঁরা আলাদা নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের সদস্যরা হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিষদে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[১১৬] এ যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ার বিষয়টি থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, এতে বাঙালিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে শত বাধা বিভক্ত করে রাখা এবং একচেটিয়াভাবে তাঁদের ওপর কেন্দ্র ও প্রদেশে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য বিস্তারের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেবে। এভাবে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন হিন্দু সদস্যদেরকে চরম হতাশ করে এবং তা পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের সঙ্গে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দের মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে দেখা দেয়। অন্যদিকে সংবিধানের বিষয়ে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার নীতির বিরোধিতা করে বসন্তকুমার দাস ও মধুসুদন সরকার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা দীর্ঘদিন যাবত আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। মোট কথা এ সময় পূর্ববাঙলার ক্ষমতাসীন আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা সংবিধান প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ সংকটে পড়ে।

আবু হোসেন সরকারের সময়কালীন এই পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এর ফলে মওলানা ভাসানী ৭ মে (১৯৫৬) খাদ্যের দাবিতে অনশন শুরু করেন। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে অনশন ভাঙ্গেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসন্ত কুমার দাসও লিখিতভাবে তাঁকে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। অপরদিকে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের এক সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পূর্ব পাকিস্তানে চলমান ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কট ও আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আবু হোসেন সরকার নিজেকে প্রধান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলা করার কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তবুও খাদ্য সঙ্কট ক্রমশ

[১১৬] Mohammed Ghulam Kabir, *op. cit.*, pp. 48-49 & 55.

অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের দলের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্য ১৯ ও ২০ মে (১৯৫৬) ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে কাউন্সিল অধিবেশন ডাকে।[১১৭] এ অধিবেশনে ৬৫০ জন কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে ৫০০ জন উপস্থিত হন। এদের মধ্যে থেকে কতিপয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিছু উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিল সদস্যের আপত্তির কারণে কাউন্সিল অধিবেশনে তা গৃহীত হয়নি। তবে এ কাউন্সিল অধিবেশনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থায় পাকিস্তানের সদস্যপদ থাকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের কতিপয় বামপন্থী নেতার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এদিকে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ২০ মে (১৯৫৬) পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ও গণতন্ত্রী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। অপরদিকে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টির পুলিন দে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে বুঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পার্টিগুলো ও গণতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দের একটা সমঝোতা হতে চাচ্ছিল। এ সময় গভর্নর ফজলুল হক আবু হোসেন সরকারকে পরিষদের অধিবেশন ডাকতে নির্দেশ দেন। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে মনে কর ২২ মে (১৯৫৫) প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলের প্রচণ্ড আপত্তির কারণে স্পিকার অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করতে বাধ্য হন।[১১৮] প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট অনুমোদন করা সম্ভব না হলে যে ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে তা সম্যক উপলব্ধি করে গভর্নর ফজলুল হক ২৪ মে (১৯৫৩) প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। স্পীকারের রুলিং এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আইন পরিষদের সদস্য শহীদুল্লাহ ঢাকা কোর্টে একটি আবেদন দাখিল করেন। এ

[১১৭] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

[১১৮] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 1st Session 22nd May. 1956. Vol. XIII (Dacca: East Pakistan Government, 1956), p. 29.

সময় কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ও উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন।[১১৯] আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কৃষক শ্রমিক পার্টির ওই অন্তর্দ্বন্দ্বকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তাঁরা খাদ্য সঙ্কটে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার ব্যর্থতাকে প্রধান রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে সভা-সমাবেশের আয়োজন করেন। ২৫ মে (১৯৫৬) তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে এক বৈঠকেও মিলিত হন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নির্দেশে করাচী যান এবং তাঁর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এমতাবস্থায় সোহরাওয়ার্দী ২৭ মে (১৯৫৬) করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ পেলে ওই দল কেন্দ্রের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। সোহরাওয়ার্দী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকতে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার প্রতি আহ্বান জানান।[১২০] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ ধরনের অবস্থা চলতে থাকতেই আবু হোসেন সরকার ১০ জুলাই (১৯৫৬) তার মন্ত্রিসভায় সম্প্রসারণ ঘটান। তিনি রংপুরের আহমেদ হোসেন, রাজশাহীর প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এবং বরিশালের মনোরঞ্জন শিকদারকে তার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে তার মন্ত্রিসভার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬-তে। এরপরেও আবু হোসেন সরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীল সালাম খান, হাশিমুদ্দিন আহমেদ, জহিরুল হক ও আবদুল লতিফ বিশ্বাস এবং ১০ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি আবু হোসেন সরকার ও তার সংসদীয় দলের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার রদবদল নিয়ে একমত হতে না পেরে পদত্যাগ করেন। এ সময় নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্যরা ও আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন।[১২১] এছাড়াও কিছুদিনের মধ্যে আবু হোসেন সরকারের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার ওপর থেকে কংগ্রেসের ২৯ জন, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টির সাতজন, তফসিলী ফেডারেশনের ১২ জন এবং গণতন্ত্রী দলের দুই জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন।[১২২] এ সময় পূর্ববাঙলায় ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। এ পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ঢাকায় আসেন। তিনি গভর্নর ফজলুল হক ও মুখ্যমন্ত্রী আবু

[১১৯] Yunas Samad, *op. cit.*, p.183.
[১২০] *দৈনিক আজাদ*, ২ জুন, ১৯৫৬।
[১২১] Mohammed Ghulam Kabir, *op. cit.*, pp. 58-59.
[১২২] Najma Chowdhury, *op. cit.*, p. 59.

হোসেন সরকারকে খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলায় খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এতে খাদ্য সঙ্কটের তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত না হলে অনেক প্রাদেশিক সদস্য আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। পরিস্থিতি প্রতিকূলে মনে করে ফজলুল হক জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন পিছিয়ে দেন। এদিকে ৪ আগস্ট (১৯৫৬) আওয়ামী লীগের মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'ভুখা মিছিল' ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে ভেবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা শহরে মিছিল বের করলে পুলিশ প্রথমে বাধা ও পরে গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটে। তাছাড়া আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিদিনই ঢাকা শহরে ভূখা মিছিল বের হয়। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে সোহরাওয়ার্দী করাচী থেকে ঢাকায় আসেন এবং ১৭ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভাকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, প্রাদেশিক সরকার অনিয়মতান্ত্রিক পথে আরো অগ্রসর হলে অল্পদিনের মধ্যেই ওই সরকার জনগণের আইন অমান্য আন্দোলনের সম্মুখীন হবে।[১২৩] এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হককে এ বলে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে অনুরোধ করেন। এর ফলে ১৩ আগস্ট (১৯৫৬) অধিবেশন ডাকার দিনধার্য করা হয়। কিন্তু অধিবেশন শুরু হওয়ার চার ঘণ্টা পূর্বে অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করা হয়।[১২৪] এরপর গভর্নর ফজলুল হক মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছে না এ অজুহাতে জরুরি ক্ষমতাবলে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা স্থগিতের ঘোষণা দেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করেন।[১২৫] এরপর ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন সরকার তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৩ ধারা বলে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রের শাসন জারি হয়েছে বলে ঘোষণা দেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক প্রকারের অস্থিতিশীল পরিবেশ চলতে থাকে এবং তার সাথে সৃষ্ট খাদ্য

[১২৩] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-৫১।

[১২৪] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 2nd Session 13 August. 1956. Vol. XIV (Dacca: East Pakistan Government, 1956), p. 65.

[১২৫] Yunas Samad, *op. cit*., p.183.

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্কট ক্রমান্বয়ে আরো বাড়তে থাকে। প্রতিদিনই ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার লোক শহরে আসে এবং মিছিল ও সভা-সমাবেশের আয়োজন করে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রাদেশিক সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) প্রায় ১০ হাজার লোক ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে এবং ঘটনাস্থলে তিনজন নিহত ও চারজন আহত হন। এরপর পুলিশ আইনশৃঙ্খলা অমান্য করার অপরাধে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।[১২৬] এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র সংগঠনগুলো ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আওয়ামী লীগ আশ্বাস দিলে আবার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর তিনজন হত্যার জন্য ঢাকায় হরতাল পালিত হয় এবং মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে পুলিশি হামলা ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য এক তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি জানান। ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) মওলানা ভাসানী এক বিশাল জঙ্গি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করেন।[১২৭] অবশেষে ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) গভর্নর ফজলুল হক আতাউর রহমান খানকে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা

কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটার পর ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই কোয়ালিশন সরকার গণতন্ত্রী দল, রফিক হোসাইন-এর নেতৃত্বাধীন 'আওয়ামী মুসলিম লীগের' অংশ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[১২৮] কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের প্রতি ২০০ জন সদস্যের সমর্থন ছিল।[১২৯] এই ২০০ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের

[১২৬] *দৈনিক আজাদ*, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।
[১২৭] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।
[১২৮] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।
[১২৯] Keith Callard, *op. cit.,* p. 86. আরও দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ৫-৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৮ জন, গণতন্ত্রী দলের ১২ জন, সংখ্যালঘু ৭২ জন এবং ১৮ জন আওয়ামী মুসলিম লীগের।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ৫ দিন পর কেন্দ্রে ও আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগ থেকে কিছু সদস্য বেরিয়ে গিয়ে রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেছিলেন, তখন পাকিস্তান গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ এবং রিপাবলিকান পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন। তাছাড়া গণপরিষদের ১জন গণতন্ত্রী দলীয় সদস্য ও ৭ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে গণপরিষদে কোয়ালিশনের পক্ষে সদস্য সংখ্যা হয় ৫১ জন।[১৩০]

১৯৫৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান গভর্নরের নিকট চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার নাম পেশ করেন। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা[১৩১] হলেন:

আতাউর রহমান খান (আওয়ামী লীগ);

আবুল মনসুর আহমদ (আওয়ামী লীগ);

শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ);

কফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র) এবং

মাহমুদ আলী (গণতন্ত্রী দল)।

মন্ত্রিসভা গঠনের পর আতাউর রহমান খান আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, তিনি শীঘ্রই ১১ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। এ নতুন মন্ত্রিসভা ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) শপথ গ্রহণ করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা হয় এবং ওই শপথ অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর সোহরাওয়ার্দী সাংবাদিকদের কাছে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন হারালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা সানন্দে পদত্যাগ করবে। এ সময় আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য অমুসলিম দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) বসন্ত কুমার দাসের সভাপতিত্বে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের

[১৩০] *দৈনিক আজাদ*, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।
[১৩১] *দৈনিক আজাদ*, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দ তাদের দলের পার্লামেন্টারি সভা আহ্বান করে সর্বসম্মতভাবে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই দিনে পূর্ব পাকিস্তান তফসিলি ফেডারেশনের এক পার্লামেন্টারি সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় গৌরচন্দ্র বালাকে পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হয় এবং আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার প্রতি অভিনন্দন ও পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হোক, তা চায়নি। এ সরকার কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চক্রান্ত করে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পতনের পরে আব্দুস সালাম খানকে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করাতে চেয়েছিল। এর জন্য আবু হোসেন সরকার কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টারি পার্টির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।[১৩২] এসময় কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে; কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কোয়ালিশন সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।[১৩৩]

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রতি বিরাগভাজন হন এবং তার স্থান দখল করে নেন সোহরাওয়ার্দী। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলে সোহরাওয়ার্দী ১১ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু তা দলের বামপন্থীদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৩৪] এমনকি তা আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির গঠনকে অনিবার্য করে তোলে। এছাড়া কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠন করলে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার রদবদল করা অতি জরুরি হয়ে পড়ে। নিম্নে পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন তালিকা[১৩৫] দেয়া হলো:

আতাউর রহমান খান : মুখ্যমন্ত্রির দফতর, স্বরাষ্ট্র (জেল ব্যতীত), খাদ্য, পরিকল্পনা, শিক্ষা, পাট, ত্রাণ ও পুনর্বাসন;

কফিল উদ্দিন চৌধুরী : পূর্ত, যোগাযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন;

শেখ মুজিবুর রহমান : শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম, কৃষি, শিল্পায়ন, সমাজকল্যাণ, পল্লী উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও দুর্নীতি দমন;

---

[১৩২] *দৈনিক আজাদ*, ১১ ও ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

[১৩৩] M. Rafique Afzal, *op. cit.*, pp. 183-189.

[১৩৪] Yunas Samad, *op. cit.*, p.183.

[১৩৫] *দৈনিক আজাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ আলী : রাজস্ব, জমিদারী দখল ও জেল;

মশিউর রহমান : প্রচার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন;

খয়রাত হোসেন : কৃষি, পশু পালন ও পশু চিকিৎসা;

আবদুর রহমান খান : সমবায়, কৃষি ঋণ ও কৃষি বাজার;

মোহাম্মদ মনসুর আলী : বিচার, আইন ও রেজিস্ট্রেশন;

মনোরঞ্জন ধর : অর্থ ও সংখ্যালঘু বিষয়;

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত : চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এবং

শরৎচন্দ্র মজুমদার : আবগারী ও লবণ।

এখানে একটি লক্ষণীয় যে, দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেউ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে তাকে দল থেকে পদত্যাগ করার বিধান ছিল। কিন্তু অন্যান্যরা পদত্যাগ করলে ও শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। যদিও এর কিছুদিন পরে তিনি পদত্যাগপত্র দলের সভাপতি মওলানা ভাসানীর নিকট পেশ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা বসন্তকুমার সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে ওই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি মনে করেন, ওইদিন পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম প্রকৃত গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে।

৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র হতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এক বেতার বক্তৃতায় নূতন মন্ত্রিসভার নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন। তিনি সকল রাজবন্দীর মুক্তির ঘোষণা প্রচার করেন এবং বলেন, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করবেন। এছাড়াও তিনি দুর্নীতি দমন, শিক্ষা সংস্কার, সংখ্যালঘুদের প্রতি আশ্বাসসহ মোহাজের সমস্যা সমাধানের কথা উল্লেখ করেন।[১৩৬]

এরপর ৮ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) আতাউর রহমান খান তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে যান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক রাজবন্দিকে মুক্তি দেন।[১৩৭] ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঢাকার পল্টন ময়দানে সোহরাওয়ার্দীকে সম্বর্ধনা

[১৩৬] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, পৃ. ৫৮১।

[১৩৭] *দৈনিক আজাদ*, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এ জনসভায় মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণে বলেন,

> ১৫ দিনের মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাঙলার প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য না পাঠাইতে পারে তাহা হইলে কেন্দ্র ও প্রদেশ হইতে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হইবে। .....মন্ত্রীত্বের লোভে তাঁহারা যেন আওয়ামী লীগের আদর্শকে ভুলিয়া না যান; দেশে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং মার্কিন জোটমুক্ত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে আওয়ামী লীগ অটল ও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[১৩৮]

এই বক্তৃতার পর মওলানা ভাসানীর প্রতি সোহরাওয়ার্দী কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় কেবল পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্যসঙ্কট মোকাবেলায় খুবই তৎপর আছেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সফল হবেন বলে জানান। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সময় "Religious Leaders" নামক একটি বই ভারতের বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। এ বইটিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (স:)-এর তীব্র সমালোচনা থাকলে ভারত-পাকিস্তানের অনেক স্থানে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ উত্তেজনাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ দিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ব্যাপক তৎপরতায় ওই ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।[১৩৯]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ পর্যায়ে ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয় এবং তা দুই সপ্তাহের কিছু বেশি সময় ধরে চলে। এ অধিবেশনই হলো ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। ক্ষমতাসীন আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা এ অধিবেশনে পৃথক নির্বাচন প্রথা বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করার উদ্যোগ নিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন নতুন করে উত্তপ্ত হয়। কারণ মুসলিম লীগ যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি মানতে নারাজ হয় এবং বিভিন্ন বিবৃতি প্রধান করতে থাকে। এছাড়াও পৃথক নির্বাচনের দাবিতে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনে তারা এক

---

[১৩৮] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

[১৩৯] অমিতাভ গুপ্ত, গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তি সৈনিক শেখ মুজিব, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য লাঠিচার্জ করে। এর ফলে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ১৫ জন আহত হন এবং ৬ জন গ্রেপ্তার হয়।[১৪০]

মুসলিম লীগের এ ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১ অক্টোবর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ১৫১-১ ভোটে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়। বিরোধী দলের উপস্থিত প্রায় ৮০ জন সদস্য ভোট প্রদানে বিরত থাকেন। বিলটি পাস হওয়ার সময় আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দলগুলোর সদস্যদের পক্ষ থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি "হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই" উচ্চারিত হলেও বিরোধী দলের সদস্যরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা একে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শ বিরোধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্বপ্ন-সাধনাকে ব্যর্থ করার নামান্তর বলে মন্তব্য করেন।[১৪১] বিরোধী দলের সদস্যরা বিল পাস হওয়ার পূর্বে ও প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিল।[১৪২] কিন্তু পূর্ববাঙলার সরকারি অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু, জননিরাপত্তা আইন বাতিল এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের বিল পাস হয়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন ২ অক্টোবর (১৯৫৬) মূলতবি ঘোষণা করা হয়। এর পরপরই ওই পরিষদ ভবনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। ৭ অক্টোবর (১৯৫৬) ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এ সময় প্রদেশে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ঢাকায় ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কৃষক শ্রমিক পার্টির সংসদীয় দলের হুইপ ফরিদ আহমদ পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবি জানান। এরপর ১০ অক্টোবর (১৯৫৬) প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচন বিল উত্থাপন করেন। এ নির্বাচন সংক্রান্ত বিলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালুর কথা বলা হয়। এ ব্যাপারে কোয়ালিশন সরকারের সকল দলই একমত ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। এটা সত্ত্বেও ১১ অক্টোবর (১৯৫৬) ৪৮-৪৯ ভোটে বিলটি পাস হয়। যুক্ত নির্বাচন বিল পাস করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যের থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছিল। অন্যদিকে ২৮ অক্টোবর (১৯৫৬) কৃষক শ্রমিক পার্টির ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনেও পূর্ব

---

[১৪০] *দৈনিক আজাদ*, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

[১৪১] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 1st October. 1956. Vol. XV (Dacca: East Pakistan Government, 1957), pp. 223-228 & 231.

[১৪২] *Ibid*, pp. 179-180, 191-195 & 200-202.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়। যুক্তফ্রন্টের শাসনামলে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা চলাকালীন সময়ে ১৯৫৬-র অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কারণ আওয়ামী লীগ ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ কাউন্সিল অধিবেশনে জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৫৫ সালের ২১, ২২, ২৩ মে এবং ১৯৫৬ সালের ১৯ ও ২০ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে তা সমর্থন লাভ করে। তাছাড়া এ বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা অলি আহাদ ১৯৫৬ সালে পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতায় আসার পূর্বে জনসাধারণকে বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ক্ষমতায় গেলে তাঁরা পাক-মার্কিন চুক্তিসহ সকল প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরোধিতা করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতায় আসার পর তাঁর পক্ষে দলের এ নীতি মেনে চলা সম্ভব হয়নি। এর কারণ হলো কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রীত্বসহ কয়েকটি মন্ত্রিত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থাকলে ও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ছিল একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। জাতীয় পরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগে ছিল মাত্র ১৩ জন। আবার সিলেটের নুরুল রহমান ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সকল সদস্য মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হওয়ায় সরকারি নীতি ও কর্মসূচির বিরোধিতা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১৪৩] অপরদিকে রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। রিপাবলিকান দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ জন।[১৪৪] প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ছিলেন রিপাবলিকান দলের সমর্থক এবং পররাষ্ট্রনীতি ছিলেন রিপাবলিকস দলের মালিক ফিরোজ খান নুন। এ সময়ই পাকিস্তানি রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক শূন্য তত্ত্ব কাজ করতো। সোহরাওয়ার্দী প্রায়ই সভা-সমাবেশে এ শূন্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, জোট নিরপেক্ষতার নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে মৈত্রী অযৌক্তিক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা শূন্য। সুতরাং পাকিস্তানের মতো দেশ 'শূন্য' হয়ে আরেকটি 'শূন্যের' সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার ফল শূন্যই হবে (শূন্য+শূন্য+শূন্য)। কিন্তু যদি বৃটেন অথবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী হয়, তাহলে তাদের শক্তির বহর যদি ৫ হয়, তা হলে শূন্যের সঙ্গে যোগ করলে তা অর্থাৎ পাকিস্তান পাঁচ হবে

[১৪৩] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮।
[১৪৪] কামরুদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

(০+৫=৫)।[১৪৫] এ অবস্থায় মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতে পারছিলেন যে, আওয়ামী লীগ দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিলে কেন্দ্র থেকে সর্বনাশ ঘটতে পারে।

এভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলতে থাকাকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের কর্তৃক সুয়েজখাল জাতীয় করণের (২৬ জুলাই ১৯৫৬) ঘোষণা নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করার জন্য আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুয়েজ খাল জাতীয় করণের উদ্যোগ নেন।[১৪৬] কিন্তু ওই খালের মালিকানায় ইঙ্গ-ফরাসী অংশীদারিত্ব থাকলে স্বাভাবিকভাবেই মিশরের সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। একপর্যায়ে ইসরায়েল, বৃটেন ও ফ্রান্স মিশরে আক্রমণ চালায়।[১৪৭] পাকিস্তানে এর প্রভাব পড়ে এজন্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রে ওপর অমুসলিম রাষ্ট্রের হামলা পাকিস্তানের অধিবাসীরা বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিবাদ স্বরূপ ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। ৩ নভেম্বর (১৯৫৬) কিছু লোক ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ "ব্রিটিশ ইনফরমেশন হাউস" ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১৪৮] ফলে ওই ভবনটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। এ সময়ে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলিম নাগরিক এবং তাঁর দলের জনপন্থিদের চরম হতাশ করে তোলে। এর কারণ হলো, সুয়েজ সঙ্কট নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের উপায় বের করার জন্য কলম্বো জোট (Colombo Powers) ১২ নভেম্বর (১৯৫৬) দিল্লিতে এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী এ আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে একই সময় ইরানের রাজধানী তেহরানে আয়োজিত বাগদাদ প্যাক্ট কাউন্সিল সভায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১৪৯] এতে তিনি তার দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বিরাগভাজন হন। বস্তুত, এ সময় সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের মূলনীতি থেকে সরে যান। তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পাদিত সিয়াটো (SEATO), সেন্টো (CENTO) ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (১৯৫৪) ইত্যাদির ঘোর সমর্থকে পরিণত হন। তাছাড়া এ সময় পূর্ব পাকিস্তান

[১৪৫] সাক্ষাতকার, সিরাজুল আলম খান, (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, (১৯৬৩-৬৫) ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৬৭-৬৮)।

[১৪৬] অসিত কুমার সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫।

[১৪৭] প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-৮৯।

[১৪৮] ড. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নিকট বিশ্লেষণ, পৃ. ১০১।

[১৪৯] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে যে সোচ্চার হচ্ছিল তা তিনি গুরুত্ব দেননি; তিনি একে পূর্ব পাকিস্তানের আইনগত অধিকারের ওপর ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হন।[১৫০] কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও সুয়েজ খাল সঙ্কট বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত এ নীতিকে উপেক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তান এ নীতিগত পরিবর্তনের পেছনে আওয়ামী লীগ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকাই ছিল প্রধান। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ইসরাইলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের সহায়তায় মিশরের ওপর ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের হামলার পর প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নিজের গদি রক্ষার জন্য বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ... অথচ তখনও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ দলের গৃহীত নীতি ছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি ... পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব প্রয়োজন – মুসলিম লীগের এ পুরানো যুক্তি দেখাইয়া সোহরাওয়ার্দী সেন্টো (তখন বাগদাদ চুক্তি) সিয়েটো প্রভৃতি সমর্থন করিতেছিলেন।

তখন হাঙ্গেরীর ঘটনা উপলক্ষ করিয়া দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলরা এখানে যে সোভিয়েত ও কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসা প্রচার চালাইতেছিল আওয়ামী লীগ নেতারা তাহাতেও সুর মিলাইয়াছিল। ...

... মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী ও তাঁহার অনুগামীগণ পূর্বেকার গৃহীত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি পরিবর্তন করাইয়া নেয়, আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিক ও সংগঠনগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নীতি হইতে বিচ্যুত হয় এবং আওয়ামী লীগের কোন সভ্যের পক্ষে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির প্রচার নিষিদ্ধ হয়।[১৫১]

আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মিশরের প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করেন। মওলনা ভাসানী ৯ নভেম্বর (১৮৫৬) 'মিশর দিবস' এবং আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা ওই দিনকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। মওলানা ভাসানী ঘোষণা দেন যে, সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন সংযোগ নেই। বস্তুত এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের ওপর সোহরাওয়ার্দীর তুলনায় ভাসানীর প্রভাব বেশি ছিল। এর কারণ হলো মিশরের সুয়েজ খাল সঙ্কট সৃষ্টির পূর্বেই সোহরাওয়ার্দী

[১৫০] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 24.
[১৫১] পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, পৃ. ১৪-১৫।

পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকলে দলের ওপর নিজের কর্তৃত্ব পূর্বের মতো অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হননি। অপরদিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাঁর দলগত অবস্থান ভালো ছিল না। এর ফলে যখন ভাসানীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় তখন কেবল শহরের শিক্ষিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ অবলম্বন করে। এভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

আতাউর রহমান খান চেয়েছিলেন নিজ দলের প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন শাসননীতি গ্রহণ করতে। অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসন নিজ দলের প্রভাবাধীন রেখে প্রদেশের সকল সরকারি কাজ-কর্ম পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে ১০ ডিসেম্বর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তানে ছয়টি মুসলিম একটি হিন্দু আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে একটি আসনে নেজামে ইসলাম পার্টি কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থন পেয়ে জয়লাভ এবং বাকি পাঁচটি আসন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেন।[১৫২] উল্লেখ্য, উক্ত উপনির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে জনমত যাচাই করে মনোনয়ন দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়ার মোহাম্মদ খান ও অলি আহাদকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে।[১৫৩] এ উপনির্বাচনের পরই কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন। এ সভায় পার্টির সভাপতি হামিদুল হক চৌধুরী ঘোষণা দেন যে, কৃষক শ্রমিক পার্টি যুক্ত নির্বাচন মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ১৯৫৭ সালের ৪-৭ জানুয়ারি রংপুর শহরে 'যুব উৎসব' নামে এক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রী খয়রাত হোসেন, মসিউর রহমান ও মাহমুদ আলী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই অনেক নেতা তাঁদের বক্তৃতায় কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করেন। এখানে উল্লেখ্য এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান চাইতেন সরকারি কাজ-কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর দলের গুরুত্ব বেশি প্রদান করা। কারণ তিনি মনে করতেন এতে সরকারি কর্মসূচি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এ নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।[১৫৪]

---

[১৫২] Keith Callard, *op. cit.*, p. 61.
[১৫৩] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১।
[১৫৪] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, pp. 23-24.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী ১৩ জানুয়ারি (১৯৫৭) একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। এতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাগমারী সম্মেলন আয়োজনের ও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকার আদায়ের দাবির বিষয় ব্যাপক আলোচনা করা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি (১৮৫৭) তিনি "কাগমারী ডাক" শিরোনামে আরেকটি প্রচারপত্র[১৫৫] প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়:

- সাড়ে চার কোটি বাঙালির বাঁচার দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক।
- ঐতিহাসিক মহান ২১-দফা আদায়ের ডাক।
- চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সকল শ্রেণীর মিলনের ডাক।
- পূর্ববাঙলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক।
- ২১-দফার পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা সারা পাকিস্তানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির মহান সনদ, ইহা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে প্রদেশের সকল স্তরের অধিবাসীদেরকে আওয়ামী লীগের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়। কামরুদ্দীন আহমদের মতে, যে সকল দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি পছন্দ করতেন না তাঁদেরকে মওলানা ভাসানী তাঁর এ আহূত কাগমারী সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।[১৫৬] এভাবে ব্যাপক প্রচারণা ও দলীয় তৎপরতার মধ্য দিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের সম্মেলন শুরু হয়। এ সম্মেলনে প্রায় ৮৯৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানীর বিশেষ অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের শুরুতেই সকল সামরিক জোটমুক্ত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করার বিষয় নিয়ে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভোটগ্রহণ করা হয়। এতে ৩৫-১ ভোটে কোন প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব

[১৫৫] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ.১৩৫।
[১৫৬] কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

উত্থাপন করবেন না বলে তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[১৫৭] কিন্তু তিনি তাঁর বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও সকল প্রকার সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি[১৫৮] এবং কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম লীগ সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এ সম্মেলনে উপস্থিত অপর নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে তাঁদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকার করে বক্তৃতা দেন। অপরদিকে মওলানা ভাসানীর সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলে সোহরাওয়ার্দী মনক্ষুণ্ন হন। কিন্তু তিনি মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে রাজি ছিলেন না। এর কারণ হলো, পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিতব্য দেশের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর মওলানা ভাসানীকে দরকার ছিল। তবে কাগমারী সম্মেলনে যে প্রকাশ্যভাবে আওয়ামী লীগের ডানপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয় তা দূর করার জন্য সোহরাওয়ার্দী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমাধানের উপায় বের করতে অনুরোধ করেছিলেন। এ সময় মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিই ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি জোরালোভাবে ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীভূত না হলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম বলতে বাধ্য হবে।[১৫৯] একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার মাওলানা ভাসানীর এই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলে দেয়, এর মাধ্যমে মাওলানা ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতার আহ্বান জানাননি, তবে স্বাধীনতার বিকল্পের ধারণার বীজ বপন করেছিলেন।[১৬০] অন্যদিকে নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য মাওলানা আতাহার আলী এক বিবৃতিতে বলেন,

জনাব ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রচারণা চালাইয়া ও পূর্ব পাকিস্তানকে এছলামী জামহুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেনিন, গেট, গান্ধী গেট, সুভাষ গেট প্রভৃতি নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তানকে কি ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে চান তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন।

---

[১৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬।

[১৫৮] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 26.

[১৫৯] Yunas Samad, *op. cit.*, p.184.

[১৬০] শাহ আহমদ রেজা, "স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক আন্দোলন এবং মওলানা ভাসানীর আচ্ছালামু আলাইকুম," *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৩ আগস্ট, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান এছলামী জমহুরিয়াকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' না বলিয়া প্রয়োজন হইলে জনাব ভাসানী সাহেবকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' জানাইবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইতেছি।[১৬১]

দৈনিক আজাদ এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে,

পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানির মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছি? ... পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৬২]

এ অবস্থায় বামপন্থী উপদল মাওলানা ভাসানীকে এবং ডানপন্থী উপদল সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করতে থাকেন। এ সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ সোহরাওয়ার্দীকে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে দূরে অবস্থানরত সদস্যবৃন্দ মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করেন। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। তবে শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর পক্ষ অবলম্বন করেন।[১৬৩]

১৮ মার্চ '৫৭ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ কোনো কারণে সন্তোষে যান। তখন ভাসানী তাঁকে বলেন যে তিনি দল থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর পদত্যাগের একটি চিঠি দিয়ে বলেন যে চিঠিটি তিনি যেন ঢাকায় এসে *সংবাদের* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেন। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বরাবর। তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লেখা পত্রটি[১৬৪] ছিল এরকম,

জনাব পূর্ব পাক আওয়ামী সেক্রেটারি সাহেব,

ঢাকা

আরজ এই যে, আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবার খুলিতে হইবে, তদুপরি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার লীডার সদস্যদের নিকট আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ২১-দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি

[১৬১] *প্রাগুক্ত*।
[১৬২] *দৈনিক আজাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭।
[১৬৩] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 24.
[১৬৪] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

হারামি কাজ বন্ধ করিতে হইবে; সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের ওপর ট্যাক্স ধার্য করা জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কটের কোন প্রতিকার দেখিতেছি না। ২১ দফার দাবির অন্যান দফা যাহাতে অর্থ ব্যয় খুব কমই হইবে তাহাও কার্যকরী করিবার নমুনা না দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি হইতে পদত্যাগ করিলাম। আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

কাগমারী- ১৮/৩/৫৭

মওলানার নির্দেশ মতো পদত্যাগ পত্রটি অলি আহাদ জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেন এবং অলি আহাদের ভাষায়, "তবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকেও বিষয়টি জানাই। শেখ সাহেব আমাকে ভুল বুঝিলেন ...।"[১৬৫]

এরপর দলের সাংগঠনিক সঙ্কট আলোচনার জন্য ৩০ মার্চ '৫৭ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৫৬ সিম্পসন রোডে নির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান। সেখানে অলি আহাদ প্রমুখের দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগই মূলত আলোচিত হয়। বিকেলের অধিবেশন আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ওই অধিবেশনেই আবুল মনসুর আহমদের প্রস্তাবক্রমে "মি: অলি আহাদকে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ হইতে সাময়িক বরখাস্ত করা" হয়।[১৬৬] নির্বাহী পরিষদের ৩৭ জন সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন। অলি আহাদের বরখাস্তের পক্ষে ১৪ জন ভোট দেন এবং "নয় জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন ও প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।"[১৬৭]

ইতোমধ্যে ২২ জন সদস্য দল থেকে তাঁদের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। উত্তরবঙ্গের আরো ২৮ জন শীঘ্র পদত্যাগ করার বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেন। যদি তাঁরা পদত্যাগ করতেন তবে কেন্দ্র ও প্রদেশের পরিষদে তাঁদের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে হতো। এ ধরনের

[১৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫।
[১৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬।
[১৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

দলত্যাগের হিড়িক চলতে থাকতেই আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ ৩ এপ্রিল (১৯৫৭) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদেরকে নানাভাবে বঞ্চিত করে রাখে। এ সরকার মনে করতো, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অর্থ হলো, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। পাকিস্তান এক শক্তিশালী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন। তিনি সংবিধানের (১৯৫৬) সমালোচনা করে বলেন যে, ঐ সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে কতগুলো নিষ্প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মোজাফফর আহমদ ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১২০০ মাইল ব্যবধান থাকা ও পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা প্রয়োজন। একইভাবে নেজামে ইসলাম পার্টির সৈয়দ কামরুল আহসান রাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধনী উত্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[১৬৮]

৫ এপ্রিল (১৯৫৭) আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মওলানা ভাসানীকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে নানা বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার পরে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিবেন বলে জানান। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, এটা নিশ্চয় পাকিস্তানের সংহতির বিরোধী নয়। এ সময় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মীর গোলাম আলী তানপুয মন্তব্য করে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অর্থ হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করার সুযোগ করে দেয়া। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ৬ এপ্রিল (১৯৫৭) করাচীতে এ বলে মন্তব্য করেন যে, খুব গুরুত্ব সহকারেই পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়েছে; তামাশার জন্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ

[১৬৮] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 1st Session 3rd April. 1957. Vol. XVI, No. 5, (Dacca: East Pakistan Government, 1957), pp. 134-135.

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপনের বিষয়টি চলতে থাকতেই ১২ মে (১৯৫৭) ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ৮০০-২৫ ভোটে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু মওলানা ভাসানী ওই পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা দেন। এ নিয়ে সভাস্থলের প্রবেশদ্বারে ব্যাপক হাঙ্গামা হয় এবং তাতে অনেক লোক আহত হন। একজনের অবস্থা গুরুতর অবস্থায় পৌঁছে। অপরদিকে ১২ মে (১৯৫৭) মুসলিম লীগের আবদুস সবুর খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর কারণ হলো আওয়ামী লীগের কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের আগমনের প্রচারণা চালাতে থাকলে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের মাইক ছিনিয়ে নেন।[১৬৯] এ অবস্থায় মওলানা ভাসানী অনশনব্রত পালন করেন। অলি আহাদের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ক্রমশ মন্ত্রী মহলের কুক্ষিগত হয়। মওলানা ভাসানী উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮ ও ১৯ মে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১ জুন হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তদনুযায়ী ১ জুন হইতে ৭ জুন অবধি 'আত্মশুদ্ধির' নামে অনশনব্রতও পালন করে।[১৭০] একইভাবে ২০ মে (১৯৫৭) আবদুর রব নিশতানের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিন ব্যাপী এক বৈঠক ঢাকায় শুরু হয়। এ বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় ২১ মে (১৯৫৭) আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। এ বৈঠকে নয় জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। এ বৈঠকেই দলের ওয়ার্কিং কমিটির নয় জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। এ বৈঠকেই দলের ওয়ার্কিং কমিটির নয় জন সদস্য, ২৯ জন প্রাদেশিক সদস্য এবং মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু দলের কাউন্সিল সদস্যরা ভাসানীকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করেন। ভাসানী তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, দুই মাস পরে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করবেন। ৩ জুন (১৯৫৭) আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে দল থেকে বহিষ্কৃত অলি আহাদ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগী নয় জন সদস্যের স্থলে নতুন নয় জন সদস্য

[১৬৯] *দৈনিক আজাদ*, ১৩ মে, ১৯৫৭।
[১৭০] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কো-অপট করার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৩ ও ১৪ জুন (১৯৫৭) ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনও বসে। এ অধিবেশনেই আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব নিয়ে সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতা প্রদানের কয়েক মিনিটের মধ্যেই অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি এ অধিবেশন অনুমোদন করা হয়। সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান দলে তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং ভাসানীকে ছাড়া তাঁর সমর্থক নয় জন সদস্যকে পদত্যাগ করতে শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এ কাউন্সিল অধিবেশনে ও ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। এর কারণ হলো তাঁর সমর্থকদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি একই সময় যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সদস্য থাকতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগ জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হন। ফলে এ কাউন্সিল অধিবেশন আওয়ামী লীগ প্রথম মার্কিনপন্থী জোটভুক্ত পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে ১৪ জুন (১৯৫৭) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পুনরায় ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ইতোমধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত পার্টিকে দ্বিখন্ডিত করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ১৫-১৬ জুন (১৯৫৭) ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা জাতীয় ভিত্তিতে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে মওলানা ভাসানী ১৭ জুন (১৯৫৭) ঘোষণা দিয়ে বলেন, পরবর্তী ২৫-২৬ জুলাই (১৯৫৭) ঢাকায় গণতন্ত্রী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এ সম্মেলন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য ১ জুলাই (১৯৫৭) ঢাকা জেলা বোর্ড হলে ব্যারিস্টার শওকত আলীর সভাপতিত্বে এক বৈঠক ডাকা হয়। এ বৈঠকে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সভাপতি এবং মহিউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ২৪ জুলাই (১৯৫৭) মওলানা ভাসানী এক বিবৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করছেন বলে ঘোষণা দেন। অপরদিকে গণতন্ত্রী

দলের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ ঢাকায় এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। অধিকন্তু, কতিপয় নেতৃস্থানীয় ছাত্র গণতন্ত্রী দলের এ সম্মেলনকে পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে।[১৭১]

২০ জুলাই (১৯৫৭) পূর্ব ঘোষিত গণতন্ত্রী দলের কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ঢাকার 'শাহবাগ' হোটেলে (বর্তমানে যা পিজি হাসপাতালের পুরনো ভবন) সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা মাহমুদ আলী কাসুরী। প্রস্তুতি কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জি. এম. সৈয়দ, মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, মাহমুদ আলী কাসুরী, মাহমুদুল হক উসমানী পাঞ্জাবের মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) ইসহাক ইয়ার মোহাম্মদ খান, মহিউদ্দিন আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সলিমুল হক খান মিল্কি এবং আবদুল মোত্তাকিম চৌধুরী।[১৭২] অন্যদিকে ২২ জুলাই (১৯৫৭) বরিশাল শহরে তিন দিনব্যাপী গণতন্ত্রী দলের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। হাজী মোহাম্মদ দানেশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টির আবদুস সামাদ খান, আবদুল মজিদ সিন্ধি এবং পাঞ্জাবের নুর মোহাম্মদ চওহানসহ প্রায় ২০০ জন কাউন্সিল সদস্য উপস্থিত হন। এ অধিবেশনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর ২৫-২৬ জুলাই (১৯৫৭) ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ভাসানীর সভাপতিত্বে গণতন্ত্রীদলের এক কর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাফর খান, জি এম সাঈদ, মিয়া ইফতেখার উদ্দীন, মাহমুদুল হক উসমানী, আবদুল মজিদ সিন্ধী এবং আবদুস সামাদ আকান্দীসহ প্রায় শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনের প্রথম দিনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে ২৬ জুলাই (১৯৫৭) পূর্ব পাকিস্তানে "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি" নামে এক নতুন রাজনৈতিক পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ নব গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে যথাক্রমে মওলানা ভাসানী ও মাহমুদুল হক উসমানী নির্বাচিত হন এবং ২৬ জুলাই এ নতুন পার্টির খসড়া গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়। এ পার্টির খসড়া কর্মসূচির মধ্যে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়া, পূর্ব

[১৭১] *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জুলাই, ১৯৫৭।
[১৭২] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সকল সামরিক চুক্তি বাতিল, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ ও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়সমূহ। নগগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শান্তিপূর্ণ সম্মেলন করতে গেলে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতাকর্মী সম্মেলনের অদূরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, ব্যাপক স্লোগান দেয় এবং প্রচারপত্র বিতরণ করে। এমনকি তারা পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভা শুরু হওয়ার পূর্বে ওই জনসভার মঞ্চকে লক্ষ্য করে হালকা বোমা নিক্ষেপও করে। এক প্রকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ঢাকার সদর এস. ডি. ও ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর ফলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্ব নির্ধারিত জনসভার আয়োজন করতে পারেনি।[১৭৩] এভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সভা-সমাবেশের আয়োজন করলে সকল সভা-সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ হামলা চালায়। এতে অনেক বামপন্থী নেতাকর্মী আহত হন। নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন,

> ... A national "anti-imperialist Front" ... the National Awami Party (NAP) ... was formed with the three main planks in the NAP platform being anti imperialism, anti-feudalism, and right of self determination for the various linguistic nationalities of Pakistan.[১৭৪]

ন্যাপ গঠনের ফলে প্রাদেশিক পরিষদের ২৮ জন সদস্য আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে নবগঠিত ন্যাপ-এ যোগ দেন।[১৭৫] এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের পরামর্শক্রমে মাহমুদ আলীকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করেন। মাহমুদ আলী এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্মেলনে আওয়ামী লীগের হামলার প্রতিবাদ স্বরূপই তিনি পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে *ইত্তেফাক* আবিষ্কার করলো "লাল মিঞাদের গণতন্ত্রবিরোধী চক্রান্ত" "কমুনিস্ট জুজুর" অলীক কাহিনী ইত্যাদি।[১৭৬] ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন সম্পর্কে এক মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বললেন, NAP মানে "Nehru aided Party".... [১৭৭]

---

[১৭৩] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।
[১৭৪] Talukder Maniruzzaman, *Radical*, p. 11.
[১৭৫] Keith Callard, op. cit., p. 86, আরও দেখুন, ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।
[১৭৬] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৪।
[১৭৭] *ঐ*।

Dhaka University Institutional Repository

এ রকম পরস্পর বিরোধী কথোপকথন চলতে থাকলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন (জুন '৫৭) শেষ হওয়ার পরে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে দুঃখের সঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন,

আমাকে না জানিয়ে এখন আওয়ামী লীগ বড় বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করা হলো, পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হলো আমাকে না জানিয়েই। আমাকে কি আর আওয়ামী লীগের প্রয়োজন আছে?[১৭৮]

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে গেলে ২ সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ওই দলের অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর একজন স্থায়ী সভাপতি নির্বাচন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় নেতা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন করাচীর 'সমারমেন্ট হাউজ' নামক মেম্বর মেসে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং আবুল মনসুর আহমদকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ওই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এর কিছুদিন পর করাচী থেকে ঢাকা ফিরে এসে তিনি আওয়ামী লীগের এক ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকেন এবং মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে অস্থায়ী সভাপতির পদ থেকে পদোন্নতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের স্থায়ী সভাপতি করেন। এতে আবু মনসুর আহমদ ভীষণ মনক্ষুণ্ন হন। তবে তাঁর পক্ষে সমালোচনা করা বা প্রতিবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে।[১৭৯]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনের ফলে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা থেকে যেমন ২৫ জন সদস্য প্রত্যাহার করে নেয় তেমনি প্রাদেশিক পরিষদে গণতন্ত্রী দলের সমর্থন হারায়। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী ও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভা সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করেন এবং ২১ দফা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। এ সময়ই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের সংসদীয় পার্টির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য "পূর্ব পাকিস্তান কৃষক এসোসিয়েশন" গঠন করেন। আবদুল

[১৭৮] আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৫।
[১৭৯] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

হক নামের এক প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এ কৃষক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গে এক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করে। আবদুল হক ব্যাপকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদেরকে তাঁদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্পর্কে সোচ্চার করে তোলেন।[১৮০] ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করলে ওই পার্টি তার প্রথম পর্যায়ে অর্জিত ব্যাপক জনসমর্থন ধরে রাখতে পারেনি।[১৮১] এ পর্যায়ে এসে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মনোমালিন্য নতুন করে সৃষ্টির চক্রান্ত শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানস্থ ভারতীয় দূতাবাসের গোপন চিঠিপত্রের ওপর ভিত্তি করে মওলানা ভাসানীকে ভারতের গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন মওলানা ভাসানীকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ভাসানীকে গ্রেপ্তার করেননি। অন্যদিকে ইস্কান্দার মীর্জা এটা বুঝতে পেরে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। প্রেসিডেন্ট মীর্জা সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে সচেষ্ট হন। এ সময় রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনও ঘটে। আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ কোয়ালিশন সরকার গঠনের চেষ্টা করে। ডা. খান সাহেবের মধ্যস্থতায় উভয় দলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ তাদের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবি করেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ ১০ আগস্ট (১৯৫৭) আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার জন্য ঢাকায় আসেন। তবে তাঁদের সকল আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১৮২]

[১৮০] Talukder Maniruzzaman, *Radical*, p. 11.
[১৮১] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।
[১৮২] *দৈনিক আজাদ*, ১১ ও ১২ আগস্ট, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পুনরায় আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন। ফলে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন উপদলটি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক সমঝোতা হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দকে বলা হয় যে, পরবর্তী প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে ওই ব্যাপারে কোয়ালিশন সরকারের শরিকদল –ন্যাশনাল কংগ্রেস দল এর সদস্যদের আলোচনা করার প্রয়োজনে তাঁদেরকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়। তারা মনে করেন যে, এতে জনসাধারণ তাঁদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে। উল্লেখ্য, কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ বিনা শর্তে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল। সোহরাওয়ার্দীর অনাগ্রহের কারণেই সমঝোতায় আসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ অবস্থাতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশন পাকিস্তান প্রাদেশিক সংসদীয় দলের উপনেতা আজিজুল হক, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য ইউসুফ আলী চৌধুরী ও আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বহিষ্কারকে বে-আইনী বলে ঘোষণা দেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে চারটি বা ততোধিক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করে একটি বেসরকারি প্রস্তাব পাস করলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ওই প্রস্তাবের অনুকূলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কৃষক শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক চৌধুরী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও ইয়ার মোহাম্মদ খান পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এ সময় আজিজুল হক এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে তাঁদের দলের বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে বলেও ঘোষণা দেন। এদিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এক ইউনিট প্রথার প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে চরম বিরোধের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম আলী তালপুরের পদত্যাগ দাবি করেন। এর ফলে রিপাবলিকান দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। ডা. খান সাহেব প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে স্পষ্টভাবে তাঁর দলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এর কারণ হলো, সোহরাওয়ার্দী

রিপাবলিকান দলের পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করার দাবি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। অধিকন্তু, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগ করেন। তিনি মনে করেন যে, কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তাঁর অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী ১৩ মাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১১ অক্টোবর (১৯৫৭) পদত্যাগ করেন। সোহরাওয়ার্দীর এ পদত্যাগের প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। ১৫ অক্টোবর (১৯৫৭) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিবাদ সভা ও আংশিক হরতাল পালন করা হয়।[১৮৩]

পাকিস্তানের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। এ সময় কেন্দ্রে আই. আই. চন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৮ অক্টোবর (১৯৫৭) ১৪ জন মন্ত্রীর চন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[১৮৪] তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগ রিপাবলিকান পার্টি ও হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা কেবল অন্তর্ভুক্ত ছিল; কোনো অমুসলিম রাজনৈতিক দল মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান কেন্দ্রে এ. আই. আই. চন্দ্রিগড়ের মন্ত্রিসভার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রাদেশিক সরকারের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। এ অবস্থাতেই নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মওলানা আতহার আলী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কেন্দ্র থেকে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ শাসনামলের বিভিন্ন অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা চালু করার উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আওয়ামী লীগকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা আজিজুল হক ও কেন্দ্রে আই. আই. চন্দ্রিগড়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর করাচী থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নেই কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। একইভাবে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ ২৩ অক্টোবর (১৯৫৭)

[১৮৩] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

লাহোরে ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পৃথক নির্বাচন প্রথা সমর্থন করে।[১৮৪] কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান মন্ত্রিসভার পতন হলে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আতাউর রহমান খানের কোয়াশিলন সরকারের শরিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করেন। এটা শরিক দল ন্যাশনাল কংগ্রেস থেকেই কেবল আসেনি, মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নিজ দল থেকেও আসে। এর কারণ হলো, মাহমুদ আলী ও শেখ মুজিবুর রহমান আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে দীর্ঘদিন যাবত তাদের পদ শূন্য থাকে। তাছাড়া ৪ নভেম্বর (১৯৫৭) আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে আবদুর রহমান খান এবং খয়রাত হোসেনের পদত্যাগ দাবি করা হয়।[১৮৫] এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী কিছু না বলে কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ে খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি ১৪ নভেম্বর (১৯৫৭) ঢাকায় এক বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে। ইতোমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান রিপাবলিকান দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। তিনি ২৪ নভেম্বর (১৯৫৭) ট্রাঙ্ক টেলিফোন করে রিপাবলিকান দলের সাধারণ সম্পাদক কর্নেল আবিদ হোসেনকে জানান যে, রিপাবলিকান দল যদি যুক্ত নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হন তবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁদেরকে বিনা শর্তে সমর্থন দেবেন। শেখ মুজিবুর রহমান আরো জানান যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে আতাউর রহমান খানকে অথবা রিপাবলিকান দলের যে কোনো নেতৃত্বকে গ্রহণ করে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে একমত আছেন।[১৮৬] এসময় কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পুনরায় পরিবর্তন ঘটে। ১০ ডিসেম্বর (১৯৫৭) আই. আই. চন্দ্রিগড় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা তাঁকে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

এই পর্যায়ে এসে ১৬ ডিসেম্বর (১৯৫৭) ফিরোজ খান নুন কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কংগ্রেস পার্টির সদস্যরা এ নতুন মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। অবশ্য, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ ছয়টি দলের নেতৃবৃন্দ কিছু দিন

[১৮৪] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯।
[১৮৫] *দৈনিক আজাদ*, ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[১৮৬] *দৈনিক আজাদ*, ২৫ ও ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধরে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী রিপাবলিকান দলেল নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁর দল নতুন মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানও করাচী থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা বিমান বন্দরে ঘোষণা দেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কোনো মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না। এতে দলের নেতাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ্য, কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সোহরাওয়ার্দী বাঙালি-পাঞ্জাবি জোট গঠন করতে প্রয়াসী হন। একই ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হন। অন্যদিকে কৃষক শ্রমিক-পার্টির হামিদুল হক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ফিরোজ খান নুন মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে একটি উপনির্বাচন হয়। রংপুর সদর মধ্য আসনের এ উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের সিরাজুল ইসলাম কৃষক শ্রমিক পার্টির নাসির উদ্দীন আহমদকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নিয়ে বিজয়ী হন বলে মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অভিযোগ করেন। ২৪ ডিসেম্বর (১৯৫৭) রংপুর শহরে মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতাকর্মীরা সদ্য অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।[১৮৭] এদিকে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার অবস্থান দুর্বল হতে শুরু করে। ২২ ডিসেম্বর (১৯৫৭) প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট নিয়ে আলোচনা চলাকালে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এক ভোটাভুটি হয়। এতে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা ১৩৬-১২১ ভোট পেয়ে সামান্য ভোটের ব্যবধানেই পতন থেকে রক্ষা পায়। তবে এ ভোট গ্রহণকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকেন। তাঁরা যদি বিপক্ষে ভোট দিতেন তবে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার পতন ঘটতো। এ প্রসঙ্গে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার বলেন, আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, ভোটের দিন বিরোধী দলের অনেক সদস্য অনুপস্থিত থাকার কারণে আতাউর রহমান খানের ওই মন্ত্রিসভা কোনো রকমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী

[১৮৭] *দৈনিক আজাদ*, ২২, ২৩ ও ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৭।

আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে ৮৫টি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তান সরকার করেছিলেন তা কার্যকর করা হলো না। শুধুমাত্র তার বিশেষ সাহস ও উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব কোটা হতে বিদেশি মুদ্রা দিয়ে ৫৮টি শিল্পের মধ্যে মাত্র ৩/৪টি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল।[১৮৮] এক্ষেত্রে অবশ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নানাবিধ বিবৃতিই দায়ী ছিল।

১ জানুয়ারি (১৯৫৮) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও তাহারিক-ই-এস্তেহকাম-ই-পাকিস্তান পার্টির নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কিশোরগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দেশে শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন প্রদানের জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের নিকট দাবি জানান। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ৫ জানুয়ারি (১৯৫৮) ঘোষণা দেন যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে দেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে পৃথক নির্বাচন প্রথা পুনরায় প্রবর্তনের বিষয় নিয়ে ঢাকায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের আলোচনা নতুন করে শুরু হয়। ৬ জানুয়ারি (১৯৫৮) তাঁরা একটি সম্মিলিত জোট গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১৮৯] ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাহমুদুল হক উসমানী ১২ জানুয়ারি (১৯৫৮) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানকালে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ও ওই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর তীব্র সমালোচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতা নুরুল আমিন বিভিন্ন স্থানে তার দলের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভার ঘোষণা করেন যে, তিনি ভাষা আন্দোলনের রক্তপাতের ঘটনার জন্য দায়ী নন, তিনি নির্দোষ এবং মুসলিম লীগ ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ও অপর রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো মূলতঃ ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। একইভাবে মুসলিম লীগের আবদুস সাত্তার পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেন, আওয়ামী লীগ হিন্দু দল ও কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতায় এসেছে এবং বিভিন্ন স্থানে মসজিদের পরিবর্তে মন্দির মেরামত করে অর্থ ব্যয় করেছে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের আবুল কাশেমও প্রকাশ্যে বলেন যে, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে বড় বাধা।[১৯০] এভাবে মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য

[১৮৮] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩।
[১৮৯] *দৈনিক আজাদ*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৫৮।
[১৯০] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 38.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল সারা প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম লীগ ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাবনা, টাঙ্গাইল, সৈয়দপুর, রংপুর ও কিশোরগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় জনসভার আয়োজন করে। এ সকল জনসভায় নুরুল আমিন, আই. আই. চন্দ্রিগড়, ফজলুর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান বক্তৃতা করেন। জামায়াতে ইসলাম পার্টির মওলানা মওদুদী পূর্ব পাকিস্তানে ৪৩ দিনের দলীয় কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেন। ৩০ জানুয়ারি (১৯৫৮) ঢাকায় তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে গণভোটের মাধ্যমে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন পদ্ধতিতে হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সরকারের নিকট জোরালো দাবি জানান।[১৯১] নেজামে ইসলাম পার্টির মওলানা আতাহার আলী ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৮) তাঁর দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় যুক্ত নির্বাচন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে বক্তৃতা দেন। মওলানা ভাসানী এই সময় করাচী থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে সাংবাদিকদের বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের দলের নীতিমালা পরিবর্তন না করলে তাঁদের দলের শাসনামলে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৮) 'শহীদ দিবস' পালনের উদ্দেশে ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দূরীভূত হওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকে উল্লেখ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগে পুনরায় অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত বিরোধের পরিণতিই ওই চরম দ্বন্দ্ব। আবুল মনসুর আহমদের বর্ণনায়– দুজনই আদর্শবাদী দেশ-প্রেমিক। দুই-এর দক্ষ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা এক বছরে অনেক ভাল কাজ করেছেন। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ওয়াপদা আই ডব্লিউ টি এ, ফিল্ম কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ইত্যাদি নয়া-নয়া শিল্প ও সংস্থা স্থাপন এবং খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, কাপতাই পানি বিদ্যুত এই ধরনের আবদ্ধ স্কিমগুলি তরান্বিত করণ, বর্ধমান হাউসে আইন মাফিক বাংলা একাডেমি স্থাপন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ তারা করেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ইহাদের পার্লামেন্টারি সদাচার। নির্বিচারে সমস্ত রাজ বন্দীর মুক্তিদান, নিরাপত্তা আইনসমূহ বাতিলকরণ, নিয়মিতভাবে উপনির্বাচন

[১৯১] *দৈনিক আজাদ*, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্য অফিসারদের কঠোরভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখা, নির্ধারিত সময়ে আইন-পরিষদের বৈঠক ডাকা, বিনা বাজেট-মনজুরিতে খরচ না করা, ইত্যাদি সকল ব্যাপারে আদর্শ গণতান্ত্রিক সরকারের উপযোগী কাজ করেছেন।[১৯২] এখানেই বিরোধকে কেন্দ্র করে আবুল মনসুর আহমদ বলেন,

> এই সর্বাঙ্গীন সদাচারের মধ্যে চাঁদের কলংকের মতই ছিল আতাউর রহমান মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ। এই বিরোধের সবটুকুই ব্যক্তিগত ছিল না, অনেকখানিই ছিল নীতিগত। কিন্তু কতটা নীতিগত আর কতটা ব্যক্তিগত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা এখন সম্ভব নয়, তখনও ছিল না।[১৯৩]

৫ মার্চ (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে স্পীকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। পরবর্তীকালে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয়। এরপর ১৩ মার্চ (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চিত্তরঞ্জন সুতার ১৩ মার্চ (১৯৫৮) প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের ওপর আলোচনা করার সময় এক মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করলে পরিষদের হিন্দু সদস্যরা ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্যরা তা সমর্থন করেন। এমনকি বিরোধীদলীয় সদস্য সুভাষচন্দ্র লাহিড়ী ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী আইন গভর্নরের সম্মতির অভাবে বাতিল হয়ে যাওয়ায় অভিযোগ উত্থাপন করলে পরিষদে বিপুল হৈ-চৈ এর সৃষ্টি হয়। প্রায় ৩ ঘণ্টা ব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি দলে এ বিতর্ক চলে। বিরোধী দলের সদস্যরা আতাউর রহমান খানের তীব্র সমালোচনা করে পদত্যাগ দাবি করেন। ১৪ মার্চ (১৯৫৮) মুসলিম লীগের উদ্যোগে ও ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থাপিত বাজেটের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলের নেতা সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুল হামিদ মজুমদার ও আবু হোসেন সরকারসহ কতিপয় নেতা বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে ওই বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেন। ২১ মার্চ (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তান তফসিলি জাতি ফেডারেশনের সদস্য রসরাজ মন্ডলসহ তাঁর দলের ১১ জন সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা দেন। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপদলীয়

[১৯২] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬।
[১৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬।

কোন্দল পুনরায় চরম আকার ধারণ করে। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যেই এ বিরোধ বেশি দেখা দেয়। এর ফলে সোহরাওয়ার্দী তাঁর ইউরোপ সফর সংক্ষিপ্ত করে ২০ মার্চ (১৯৫৮) ঢাকায় আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করে ওই বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন।

তিনি মনে করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ ত্যাগ করলে ওই দল দুটো উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থাপিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা চলাকালে মনোরঞ্জন ধর ২১ মার্চ (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র হতে যে পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে তা পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রের আয়ের সঙ্গে তুলনায় অনেক কম।[১৯৪] এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন পার্টির এক বৈঠক ২৪ মার্চ (১৯৫৮) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতেই শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তিনি নিজ দলের নেতা-কর্মীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে কেবল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার হুমকি প্রদান করেন। আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা 'অর্থ বিল' নামের একটি বিল জনসাধারণের মতামত যাচাই করার উদ্দেশে প্রচারের সময়সীমা ৩১ মার্চ (১৯৫৮) থেকে বর্ধিত করে ৩১ এপ্রিল (১৯৫৮) করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী দল দাবি তুলেন যে, সরকারি দল নিজেদের পরাজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই তা করতে চাচ্ছে। এ সময় গভর্নর ফজলুল হক প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি ও বিরোধী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের তোড়জোড় দেখে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার প্রতি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা থাকার বিষয় যাচাইয়ের জন্য এক নোটিশ জারি করেন। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বাজেট অধিবেশন মুলতবি রেখে দেয়ার জন্য গভর্নর ফজলুল হককে অনুরোধ করেন। কিন্তু, গভর্নর ফজলুল হক তা করতে অস্বীকার করেন।

---

[১৯৪] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 3rd Session 16th June. 1958. Vol. 18, (Dacca: East Pakistan Government, 1958), pp. 9-49.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে এ পর্যায়ে এসে গভর্নর ফজলুল হক ৩১ মার্চ (১৯৫৮) রাতে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির সংসদীয় দলের নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। এ আমন্ত্রণ পেয়ে আবু হোসেন সরকার ওই রাতেই শপথ গ্রহণ করেন। এরপর গভর্নর ফজলুল হকের অপসারণ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন। ফলে ৩১ মার্চ রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ফজলুল হককে অপসারণ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব হামিদ আলীকে অস্থায়ী গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করে। অস্থায়ী গভর্নর হামিদ আলী পহেলা এপ্রিল (১৯৫৮) নিজে শপথ গ্রহণ করার পর পরই আবু হোসেন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং আতাউর রহমান খানকে পুনরায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। এর ফলে আতাউর রহমান খান ১ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আতাউর রহমান খান ৯ সদস্য বিশিষ্ট সরকার গঠন করেন।[১৯৫] ২ এপ্রিল (১৯৫৮) খুবই উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়।[১৯৬] তবে এ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ৪০০০ নতুন সদস্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।[১৯৭] এ সময়ে যারা আওয়ামী লীগে যোগ দেন তারা তাদের এ সিদ্ধান্তের পক্ষে বিশটির মতো কারণ দেখান। এক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব সর্বাধিক বিবেচনা লাভ করে। এরপরের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাটি ছিল এ শর্তে বিশ্বাস যে, একমাত্র আওয়ামী লীগই বাঞ্ছিত পথে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের ত্যাগতীতিক্ষায় নির্ভর করা যায়।[১৯৮] সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে আওয়ামী লীগে নবাগতদের বেশিরভাগই ছিল কে এস পির। এর পরের স্থান যথাক্রমে রক্ষণশীল মুসলিম লীগ ও প্রগতিবাদী ন্যাপের। এতে আওয়ামী লীগের মধ্যসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরো জোরদার হয়। এ নবাগতদের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও সিলেটে প্রায় দেশজোড়া অবস্থান বিন্যাসের সুবাদে দলের দেশব্যাপী পরিসর বাড়তে থাকে। একই সময়ে এ মর্মে খবর পাওয়া যায় যে আওয়ামী লীগ স্থানীয় স্তরে তথা

[১৯৫] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।
[১৯৬] *দৈনিক আজাদ*, ২ এপ্রিল, ১৯৫৭।
[১৯৭] শ্যামলী ঘোষ, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, পৃ. ৪৩।
[১৯৮] দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা), ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ মার্চ ১৯৫৮ প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে সঙ্কলিত। দেখুন, শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ড, থানা, ইউনিয়ন ও মহকুমা পর্যায়ে শাখা কার্যালয় স্থাপন করছে, কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করছে, কর্মকর্তা বাছাই করছে ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করছে।[১৯৯] এছাড়াও সোহরাওয়ার্দী নিজে প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় সফরে গিয়ে জনসভায় ভাষণ দেন। ফলে মার্চ ১৯৫৭ ও ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৬টি উপনির্বাচনের ৫টিতে জয়লাভ করে।[২০০]

অন্যদিকে ৪ এপ্রিল (১৯৫৮) কৃষক শ্রমিক পার্টিসহ প্রায় সকল বিরোধী দলগুলোর উদ্যোগে এবং নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মওলানা আতাহার আলীর সভাপতিত্বে ঢাকায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় বক্তৃতা প্রদান কালে হামিদুল হক চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেন, ওই সরকার অন্যায় হস্তক্ষেপ করে ফজলুল হককে গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেছে। তাছাড়া অনেক নেতা তাঁদের বক্তৃতায় প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার শীঘ্র পদত্যাগ দাবি করেন। এমতাবস্থায় ৫ এপ্রিল (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের এক অধিবেশন বসে। কিন্তু তা হট্টগোলের কারণে সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। এ অধিবেশন ২০ মিনিট স্থায়ী হলেও তাতে পীরজাদা মোহসেন উদ্দীন ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সামান্য ধস্তাধ্বস্তি এবং অপর সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা ও আস্তিন গুটিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করা হয়। এমনকি বিরোধী দলীয় নেতা আবু হোসেন সরকার ও আবদুল লতিফ বিশ্বাস ওই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা ও বিরোধীদলের সদস্যদের কথা বলতে সময় না প্রদান করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন। এ সময় সরকারি দলের সদস্যরা টেবিল চাপড়ান ও চিৎকার করে গোলমাল করে। এতে বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল না।[২০১] ১৯৫৭ সালের শেষদিকেই পূর্ব পাকিস্তানে চরম অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেয়। সীমান্ত দিয়ে ভারতে চোরাচালান চলতে থাকলে তা এ সময় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে; পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব দেখা দেয়। শুধু তাই নয় ব্যাপকভাবে টাকার মান নেমে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি টাকার ধান-চাউল, পাট ও সোনা প্রায় একশত

---

[১৯৯] *ঐ*।

[২০০] শ্যামলী ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

[২০১] *দৈনিক আজাদ*, ৬ এপ্রিল, ১৯৫৮।

মাইল ব্যাপী সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে পাচার হতে থাকে। এসব বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেন। এটা তাঁর শাসনামলের রুদ্ধদ্বার অভিযান (Operation Closed Door) নামে অধিক খ্যাত। এ অভিযান ১৭ ডিসেম্বর (১৯৫৭) শুরু হয়।[২০২] সীমান্ত এলাকায় কতিপয় হিন্দু ব্যবসায়ী এ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেনাবাহিনী তাঁদের রুদ্ধদ্বার অভিযান জোরদার করলে ওই সকল হিন্দু চোরাচালানকারীদের চোরাচালান বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে তাঁদের মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। এ নিয়ে পরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের হিন্দু সদস্যরা আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানান।[২০৩] অন্যদিকে কোয়ালিশন সরকারের শরিক দল কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে রুদ্ধদ্বার অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁদে মধ্য থেকে বি. কে. দাসের নেতৃত্বে কতিপয় সদস্য লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন যে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে না নিলে তাঁরা প্রাদেশিক কোয়ালিশন সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিবেন।[২০৪] কংগ্রেস সদস্যদের নিজেদের দলীয় মন্ত্রিদের প্রতি যে আস্থা নেই এ কথা পূর্বেও কয়েকবার কংগ্রেসের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে গুরুত্ব দেন নি। এভাবে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান প্রদেশের স্বার্থে তথা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য যে রুদ্ধদ্বার অভিযান চালু করেছিলেন তা কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনে। শ্যামলী ঘোষের ভাষায় –

"It is quite possible that Ataur had become more of a liability than an asset due to the repercussions of the Operation Closed Door (OCD) on Hindus and its unpopularity among a section of Awami Leaguers."[২০৫]

পরবর্তীতে কংগ্রেস দলের অনেক সদস্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁরা সরকারি দলের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং বিরোধী দলে যোগদান করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ৪ জুন (১৯৫৮) করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, পূর্ব

[২০২] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 37.
[২০৩] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।
[২০৪] Mohammed Ghulam Kabir, *op. cit.*, pp. 62-63.
[২০৫] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 37.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের প্রতি বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ, কেন্দ্রীয় সামরিক-বেসামরিক চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানিদের নায্য অধিকার হতে বঞ্চনার ঘোরতর ও গভীর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনয়ন করেন। এভাবেই ১৯৫৯ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কড়ি অগ্রভাগেই আদায় করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান। সত্যিই ক্ষমতার রাজনীতির গতি কি বিচিত্র।[২০৬]

সার্বিকভাবে যদি সোহরাওয়ার্দী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা বাতিলকরণ, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ২১ দফার অন্ততঃ ১৪ দফা বাস্তবায়নের আশ্বাস দিতেন তবে ওই দলের সদস্যরা তা গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতেন। আর তাতে ওই সময় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন রোধ করা সম্ভব হতো।[২০৭] বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিরুদ্ধে পরিষদে অআস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করন। অপরদিকে মহিউদ্দীন আহমদ প্রাদেশিক পরিষদে বক্তব্য প্রদানকালে আওয়ামী লীগকে অভিযুক্ত করে বলেন, আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভায় হামলা চালাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগ কর্মীরা মিলে হামলা চালালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা আবদুল আউয়ালের হাত ভেঙ্গে যায়।[২০৮] পূর্ব পাকিস্তানে এ রকম পরিস্থিতিতে ১২ জুন (১৯৫৮) প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ১৮ জুন (১৯৫৮) ওই অধিবেশন চলাকালে "ছাটাই প্রস্তাবের" ওপর এক ভোট হয়। এতে ১২৬-১৩৮ ভোটে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা হেরে যায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্যরা ভোট দানে বিরত থাকে। এ ভোটগ্রহণের সময় তাঁদের ২৮ জন সদস্যদের মধ্যে ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।[২০৯] ফলে আবু হোসেন সরকার প্রাদেশিক পরিষদে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় ২৪ জুন (১৯৫৮) মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ সময় গভর্নরের নির্দেশে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবি ঘোষণা করা হয়। এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধানের (১৯৫৬) ১৯৩ ধারা বলে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ১৯৩ ধারা

---

[২০৬] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯।

[২০৭] আতাউর রহমান খান, *ওজারতির দুই বছর*, ঢাকা: স্টান্ডার্স পাবলিশার্স, ১৯৬৪।

[২০৮] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 3rd Session 16th June. 1958. Vol. 20, (Dacca: East Pakistan Government, 1958), p. 159.

[২০৯] *Ibid*, pp. 205-298.

Dhaka University Institutional Repository

জারির পেছনে মুসলিম লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই দায়ী বলে দাবি করে কৃষক শ্রমিক পার্টি। এরপর অবিলম্বে পাকিস্তান থেকে ১৯৩ ধারা প্রত্যাহার করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়। ২৪ জুলাই (১৯৫৮) কৃষক শ্রমিক পার্টির মোহন মিয়া ও সৈয়দ আজিজুল হক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের দাবি জানান।[২১০] শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমানের মধ্যকার এরকম দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি দেখে সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জয়ী হলে আতাউর রহমান খানের পরিবর্তে আবুল মনসুর আহমদকে দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ ওই নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তিনি মনে করেন যে, এটা একদিকে যেমন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অপমৃত্যু ঘটাবে ঠিক (তেমনি তাঁর দলের উপদলীয় কোন্দল আরো বৃদ্ধি করে দিবে।[২১১] এর সোহরাওয়ার্দী আতাউর রহমান খানকে এসময় আওয়ামী সমর্থক সদস্যদের সশরীরে হাজির করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আতাউর রহমান তা করতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানান।[২১২] পরে অবশ্য তিনি আবার রাজী হন। ২৫ আগস্ট (১৯৫৮) প্রায় দুইমাস পর গভর্নরের শাসন জারি ১৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা হয়।[২১৩] এই দিনই আতাউর রহমান খান পুনরায় পূর্বপাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর দলের উপদলীয় কোন্দল দূর করার উদ্দেশ নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের তালিকা ও দফতর বণ্টন করে দেন। এটা সত্ত্বেও আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্য থেকে একেবারে মতবিরোধ দূর হয়নি। এর ফলে সোহরাওয়ার্দী সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৮) আবুল মনসুর আহমদকে আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খানের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বের কারণ নির্ণয় করতে অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি আবুল মনসুর আহমদকে ওই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্বও দেন। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগকে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির মতো গঠন করার উপায় বের করে দিতে ও তাঁকে বলেছিলেন। আবুল মনসুর

---

[২১০] আবদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

[২১১] Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 3rd Session 16th June. 1958. Vol. 20, (Dacca: East Pakistan Government, 1958), pp. 325-335.

[২১২] *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জুলাই, ১৯৫৮।

[২১৩] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ ইংল্যান্ডের লেবার পার্টিবিষয়ক অনেক বই অধ্যয়ন করতে শুরু করেন এবং সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) মাসে এ নতুন করে দায়িত্ব পাওয়ার পরে মুজিব আতাউর রহমানের সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ বিরোধ মূলতঃ আইন পরিষদ ও ক্ষমতাসীন দলের শক্তির লড়াই। তবুও তিনি এর জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে বেশি দায়ী করেন।[২১৪] কারণ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, মন্ত্রিসভা দলের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

এইভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। ১৯৫৮ সালের বাজেটের ব্যাপারে চারটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু আগস্ট পর্যন্ত বাজেট পাস সম্ভব হয় না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে আইন পরিষদে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং অক্টোবরে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইন পরিষদের অবসান ঘটে। তবে ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনা এর মধ্যেই ঘটে যায়। উল্লেখ্য, আইন পরিষদের স্পিকার (জনাব আবদুল হাকিম) ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির এবং ডেপুটি স্পিকার (জনাব শাহেদ আলী) ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে কখনো কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার আবার কখনো আওয়ামী লীগের সরকার দেশ পরিচালনা করে। ১৯৫৮ সালে আওয়ামী লীগ স্পষ্টত অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্পিকার আবদুল হাকিম নিরপেক্ষ নন। এর প্রেক্ষিতে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী এম. পি. অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পিকার এক রুলিং দিয়ে তা বাতিল করেন। ফলে পরিষদ ভবনের মধ্যে গোলযোগ হয়। স্পিকার পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। তখন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় দেওয়ান মাহবুব আলী স্পিকারের বিরুদ্ধে তার অনাস্থা প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলে ১৭০ জন সদস্য তা সমর্থন করেন।[২১৫] ডেপুটি স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা গৃহীত হয়। পরক্ষণেই সরকারি দলভুক্ত পিটার পল গোমেজ (কংগ্রেস) স্পিকার আবদুল হাকিমকে পাগল ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উক্ত প্রস্তাব গ্রহীতও হয়।[২১৬] অলি আহাদের ভাষায় – দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন পাগলামির

[২১৪] আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪।
[২১৫] ড. মোঃ খায়েরুল আহসান ছিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭।
[২১৬] Shyamali Ghosh, *op. cit.*, p. 36.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় সবাই অবতীর্ণ; দেশ ও জাতি গৌণ। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল পরিষদ অভ্যন্তরে দাঙ্গা।[২১৭] এরপর স্বভাবতই স্পিকার আবদুল হাকিম আর স্পিকার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যবৃন্দ এ পরিবর্তন মানেনি। পরবর্তী ২ দিন চেয়ারম্যান প্যানেলের সদস্য সৈয়দ আজিজুল হকের সভাপতিত্বে স্বল্প সময়ের জন্য অধিবেশন চলে। কিন্তু তার পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী স্পিকারের চেয়ারে বসামাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তার সমর্থক দলের সদস্যবৃন্দ জনাব শাহেদ আলীকে উক্ত চেয়ারে আসন গ্রহণ না করার দাবি করে। কিন্তু শাহেদ আলী আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন পার্লামেন্ট সদস্য আবুল মনসুর আহমদের[২১৮] ভাষায় উল্লেখ্য, ডেপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হইল। হাউস শুরু হইল মানে বিরোধী দলের হট্টগোল শুরু হইল। শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। শুধু খালি হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক। পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া-হাতল ডিপুটি স্পিকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁরা হাতে-চেয়ারে ডেপুটি স্পিকারকে অস্ত্র-বৃষ্টির ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরোধীদের কেউ কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাঁদের বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা ভাঙ্গা ছিল। তাই না যোগ দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম সাবধানীদের মতো হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে। নিজ জায়গায় অটল-অচল বসিয়া বসিয়া সিনেমায় ফ্রি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল খেলা দেখার মতো এ মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। খেলোয়ারদের চেয়ে দর্শকরা খেলা অনেক ভাল দেখে ও বুঝে। আমি তাই দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলাম। তিনি আরও বলেন, যা দেখিলাম, তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন ব্যথিত হইলাম; বুদ্ধিমানের মুর্খতায় তেমনি চিন্তিত হইলাম। গণ-প্রতিনিধিরা বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব লইয়াই আইন সভায় আসিয়াছেন। গুন্ডামি করিয়া কাজ হাসিল করিতে আসেন নাই, ভাল কাজ হলেও না। শিক্ষিত ভদ্র ও সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক লোকেরা কেমন করিয়া ইতরের মতো গুন্ডামি করিতে পারেন, চেনাজানা

[২১৭] ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।
[২১৮] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সুপরিচিত, সমান শিক্ষিত ভদ্র সহকর্মী ডেপুটি স্পিকারের ওপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলা-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন; তা দেখিয়া আমার সারা দেহমন ও মস্তিষ্ক বরফের মতো জমিয়া গিয়াছিল। সে বরফেরও যেন উত্তাপ ছিল। আমারও রাগ হইয়াছিল। সে অবস্থায় আমার হাতে রিভলভার থাকিলে আমি নিজের আসনে বসিয়া আক্রমণকারীদের গুলি করিয়া মারতে পারতাম। ওঁরা সবাই আমার সহকর্মী শিক্ষিত ভদ্রলোক। অনেকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবু তাঁদের গুলি করিয়া মারিতে আমার হাত কাঁপিত না।

নিছক অক্ষমতার দরুণ অর্থাৎ রিভলভারের অভাবে তা করিতে পারি নাই। করিতে পারিলে ওঁদেরই মতো গুণ্ডা আখ্যা লাভের যোগ্য হইতাম। বেশকম শুধু হইত ওঁদের হাতে মাইকের মাথা, পেপার ওয়েট আমার হাতে রিভলবার। বুঝিলাম ওঁদের হাতে আমারই মতো রাগ ছিল। সে রাগের কারণ ডেপুটি স্পিকার অন্যায়ভাবে সরকার পক্ষকে সমর্থন করিতেছিলেন। ডেপুটি স্পিকারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা বিরোধী মেম্বরদের কারও ছিল না নিশ্চয়ই। এমনকি, অমন অসভ্য গুন্ডামিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের সকলে জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া ওই আক্রমণ করেন নাই। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছি হামলাকারীদের অনেকেই স্পন্টোনিয়াসলি, নিজের অজ্ঞাতসারেই, যেমন শুধু দেখাদেখি পাটকেল নিক্ষেপ করিতেছেন। এটা যেন হাটের মার। সবাই মারিতেছে, আমিও একটা মারি, ভাবটা যেন এই। কিন্তু ফল কি হইতেছিল? দেহরক্ষীরা চেয়ারের ওপর চেয়ার খাড়া করিয়া ডেপুটি স্পিকারের সামনে প্রাচীর তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে প্রাচীরটা ভেদ করিয়া হামলাকারীদের পাটকেল ডেপুটি স্পিকারের মাথায় নাকে মুখে লাগিতেছিল। শাহেদ আলী কোনও বীর বা ডন-কুস্তিগির পাহলওয়ান ছিলেন না। সাদা সিধা শান্ত-নিরীহ ছোট কাদের একটি অহিংস ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। দর্শনের ছাত্র না শুধু। চলনে আচরণেও ছিলেন দার্শনিক। ওকালতি বা রাজনীতির চেয়ে স্কুল কলেজের মাস্টারি করাই তাঁকে বেশি মানাইত। এমন লোকের ওপর অমন হামলা। দেহরক্ষীরা চেয়ারের পাহাড় না তুলিলে তিনি ওই মঞ্চের ওপরই মরিয়া একদম চ্যাপটা হইয়া যাইতেন। পরের দিন হাসপাতালে তিনি সত্য-সত্যই মারা যান। এ হত্যাকাণ্ডের আদালতী বিচার হয় নাই। ভালই হইয়াছে। বিচার হইলে অনেক মিয়ারই শাস্তি হইত। দেশের মুখা কালা হইত। কিন্তু আদালতী বিচার না হইয়া গায়েবী বিচার হইয়াছে। তাতে দেশের মুখ কালা হইল কিনা পরে বুঝা যাইবে; কিন্তু দেশের অন্তর যে কালা হইয়াছে সেটা

Dhaka University Institutional Repository

সংগে সংগেই বোঝা গিয়াছে। ওই ঘটনার ১৫ দিনের মধ্যেই মার্শাল ল। শাহেদ আলীর অপমৃত্যুকে মার্শাল ল প্রবর্তনের অন্যতম কারণ বলা হইল। অর্থাৎ পরের ঘটনার জন্যই আগেরটা ঘটিয়াছিল বা ঘটান হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে গিয়া শাহেদ আলী নিহত হইলেন অপজিশনের ঢিল-পাটকেলে। অথচ পূর্ববাঙলার দুশমনরা তখনও বলিলেন এবং আজও বলেন, আওয়ামী লীগই শাহেদ আলীকে হত্যা করিয়াছে। কোন্ পাপে এ মিথ্যা তহমত! তখন *আজাদ*[২১৯] পত্রিকা রিপোর্ট করে,

ওই সময় একটি বস্তু ডেপুটি স্পিকারের ওপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি মুখে আঘাত পান এবং আহত স্থান হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। নিক্ষিপ্ত বস্তুটি সম্ভবত সদস্যদের ডেস্কের সহিত সংযুক্ত লেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ভগ্নাংশ।

এ ঘটনার পর ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) বেলা ১.২০ মিনিটে হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। যেটি ছিল পূর্ববাঙলা জাতীয় পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এরপর ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাঙলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে। সেইদিন পাকিস্তানের প্রথম উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা যিনি রাতারাতি রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদটিও দখল করেছিলেন। তিনি রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জংলী আইনের ঘোষণা দেন। জেনারেল মীর্জা রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে বলেন,[২২০]

আপনারা স্পিকারকে মেরে ডেপুটি স্পিকারকে হত্যা করে এবং জাতীয় পতাকার অবমাননা করে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেননি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা এতই নিচে নেমে গেছে যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানের গোলযোগপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে ....। আমরা চাঁদ থেকে মানুষ পেতে পারি না। ... আমি নিশ্চিত যে, এ নির্বাচনে প্রধানত ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে। নির্বাচনে জয়ী হলে তারা পুনরায় গণতন্ত্রের দুভার্গ্যজনক পরিণতির পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন ...।

[২১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।
[২২০] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৫-৪৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানকে পবিত্র আমানত বলা হয়। কিন্তু সংবিধানের চেয়েও দেশ ও দেশের জনগণের কল্যাণ ও সুখ আরও বেশি পবিত্র। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, আল্লাহ ও জনগণের সামনে আমার প্রধান কর্তব্য পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা। ... আমি একজন নীরব দর্শক হিসেবে দেশের ধ্বংসের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারি না। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে গভীর ভাবে চিন্তা করার পর আমি এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নেই যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হব, যদি না আমি কোনো পদক্ষেপ নেই যা কিনা আমার মতে বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য, সুতরাং আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি :

১. সংবিধান স্থগিত থাকবে

২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দেয়া হলো

৩. জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হলো

৪. সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হলো এবং

৫. জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হলো।

বিশ্বাসঘাতকদের জন্য আমি বলছি, দেশত্যাগই তাদের জন্য উত্তম পথ, যদি তারা সুন্দরভাবে এ কাজ করতে পারে তাহলে ভালোই হয়।

এরপর ১৯ জুন (১৯৫৮) একপর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে আতাউর রহমান খান পদত্যাগ করেন।

২০ জুন (১৯৫৮) আবু হোসেন সরকার সুভাস চন্দ্র লাহিড়ীর নেতৃত্বাধীন উপদল, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টির সদস্যবৃন্দ ও তফসিলী জাতি ফেডারেশনের একটি উপদলের সমর্থন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভায় প্রভাষ লাহিড়ী ও আবদুল হামিদ চৌধুরী অন্তর্ভুক্ত হন। ২২ জুন (১৯৫৮) প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন পুনরায় বসে। এ অধিবেশনের প্রথম দিনেই আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। কিন্তু ওই অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে এক সমঝোতা হয়। উভয় পার্টির সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান ও মাহমুদ আলী ২০ জুন (১৯৫৮) এক যুক্ত বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে সমঝোতা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ন্যাশনাল

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী পার্টির পাঁচ দফা মেনে নেয়ার বিষয় বিবেচনা করছে। ওই দিনই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২২১] কিন্তু এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে ওই প্রস্তাবের ওপর ভোট হয় এবং আবু হোসেন সরকার ১৫৬-১৪২ ভোটে হেরে যান।[২২২]

[২২১] *দৈনিক আজাদ*, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

[২২২] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, *প্রথম খন্ড*, পৃ. ৬২৩-৬২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

১৯৫৪ সালে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে যে ব্যালট বিপ্লব পূর্ববাঙলায় হয় তা সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ নিয়ে আসে। কিন্তু বহু প্রত্যাশিত যে ২১ দফা দাবির ওপর ভিত্তি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তার সবগুলোই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দেশের উন্নয়ন সাধনের যে সুযোগগুলো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ পেয়েছিলেন তা তারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থের কারণে কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথমত, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেই মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফজলুল হক নিজ দল ও নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আপত্তি আসার কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন সদস্যকে তাঁর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হননি। কারণ এতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হতো। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের অপর শরিকদল গণতন্ত্রী দলকেও মন্ত্রিসভায় অন্তভুক্ত না করে ফজলুল হক রোষানলে পড়েন। গণতন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, ২১ দফা বাস্তবায়ন করা হলে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করতেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগও ঘোষণা দেয় যে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভা যতদিন ২১ দফাকে সমর্থন দেবে ততদিন সমর্থন করে যাবে। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে ডেকে বলেন, পূর্ববাঙলার বামপন্থী জোট থেকে যুক্তফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে গণপরিষদে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে। এ অবস্থায় ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নমনীয় হয়ে পড়েন। কিন্তু পরবর্তীতে সব দলের নানা বাধার মুখে তিনি আবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে বাধ্য হন। কিন্তু ১৫ মে (১৯৫৪) মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর শপথ গ্রহণের দিনই নারায়ণগঞ্জে আদমজী মিলে বাঙালি অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়া হয়। এর আগেও ২৩ মার্চ (১৯৫৪) চন্দ্রঘোণা পেপার মিলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধায় যাতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন দেরি হয়। এর মধ্যে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাক-মার্কিন চুক্তি (১৯ মে, ১৯৫৪) স্বাক্ষরিত হয়। যেটাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাঙলার জনগণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়। মোটকথা কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিজয়ের পর এর বিরোধিতা করে আসে। তারা ফজলুল হককে পাকিস্তান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। ইতোমধ্যে প্রণীত ৯২ (ক) ধারা জারির সঙ্গে সঙ্গে দেশে নির্বিচারে গ্রেফতার ও

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন শুরু হয়। ফলে পূর্ববাঙলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫৪) পর নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরখাস্তকরণ সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাভিত্তিক মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করে। নবনিযুক্ত গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা উচ্ছেদের ঘটনাকে সমাজতন্ত্র উচ্ছেদের ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার পরপরই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি তুলেছিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জেনারেল মীর্জা অক্টোবর '৫৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করা কালীন এক প্রকারের সামরিক শাসন জারি করার মতো অবস্থা তৈরি করে রাখেন। যুক্তফ্রন্টের ব্যাপক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হক ও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেশদ্রোহী খ্যাত ফজলুল হককেই পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার দায়িত্ব দেয়। ফজলুল হক আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের সান্নিধ্যে থাকার কারণে পূর্ববাঙলার কৃষক শ্রমিক দলের পক্ষে তদবির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানকে সরকার গঠনের সুযোগদানের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। আতাউর রহমান খানকে ও কমিউনিস্ট আখ্যা দেয়া হয়। এভাবে দেখা যায় যে, কমিউনিস্ট দলের সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে, অন্যদিকে খিলাফতে রব্বানী পার্টিও কিছু হিন্দু সদস্য ফজলুল হকের জোট সমর্থন দেন। এভাবে পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার শুধু যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গেই দেননি চক্রান্ত করে সোহরাওয়ার্দীকে ও কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে পূর্ববাঙলায় আওয়ামী লীগকে বামপন্থীদের সমালোচনার সম্মুখীন করেন।

তৃতীয়ত, ১৯৫৫ সালের ৫ জুন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমোদন দেয়। শুরুতেই তিনি প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হন এবং তিনি তাঁর দলের সকল শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সমর্থন লাভ করতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় সরকার সব সময়ই যুক্তফ্রন্টের দুই দল কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে সর্বদা ফাটল ধরানোতে ব্যস্ত থাকত। এই রকম পরিস্থিতিতে ১৭ জুন (১৯৫৫) মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় দাবি করেন ২১ দফার ভিত্তিতে পূর্ববাঙলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হউক। এই রকম পরিস্থিতিতে পাঁচ দফা দাবি পাল্টা দাবির ভিত্তিতে মারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাঙালিরাও মারি চুক্তি মেনে নেয় এই কারণে, এতে ২১ দফার অনেকটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মারি চুক্তি হওয়ার পর পরই আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী পদে বসাতে চান এবং আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চান। এরপর ফজলুল হক ১১ আগস্ট (১৯৫৫) কেন্দ্রে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর যোগদান পূর্ববাঙলায় আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করে। ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) আবু হোসেন সরকার ১০ জন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করেন এবং ৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) এই মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৭ ডিসেম্বর (১৯৫৫) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ও তাঁর সভাপতির ভাষণে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ক্ষমতাসীন দল ২১ দফা পালনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ১৯৫৬ সালের ২৮ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীর মধ্যস্থতায় কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐক্যমত্যে কাজ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আবু হোসেন সরকারকে আশ্বাস দেন যে, পূর্ববাঙলায় ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভা যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা মন্ত্রিসভাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। পূর্ববাঙলায় খসড়া সংবিধান প্রণয়নকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলো দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দলসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলো ওই খসড়া সংবিধানের সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ সংবিধানের ২১ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এই সংবিধানকে তারা ইসলামি সংবিধান বলে আখ্যায়িত করেন। তারপরও আন্দোলনের মুখে ২৩ মার্চ (১৯৫৬) সংবিধান জারি হয়। এই

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লে সংবিধানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দলের নানা টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়, অনেকে পদত্যাগ করেন। ফলে আবু হোসেন সরকার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হুমকির মুখে পড়ে। এ সময় পূর্ববাঙলায় খাদ্য সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করে। এ রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হককে নির্দেশ দেন ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) এর মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদে অধিবেশন আহ্বান করতে। এরপর ফজলুল হক মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছে না এই অজুহাতে জরুরি ক্ষমতাবলে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা স্থগিত ঘোষণা করে পূর্বপাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করেন। ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন সরকার তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৩ ধারা বলে পূর্বপাকিস্তানে কেন্দ্রের শাসন জারি হয়েছে বলে ঘোষণা দেন। ২১ দফার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করলে আবু হোসেন সরকার ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ২১ দফার কোনটাই তেমন বাস্তবায়িত হয়নি।

চতুর্থত, পূর্ববাঙলায় কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রীদল ও আওয়ামী লীগের অংশ বিশেষ নিয়ে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন বসে ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬)। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এটাই ছিল পূর্ণাঙ্গ প্রথম অধিবেশন। এ অধিবেশনে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা পৃথক নির্বাচন প্রথা বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করার উদ্যোগ নিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়। মুসলিম লীগের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১ অক্টোবর (১৯৫৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ১৫১-১ ভোটে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়। পরবর্তীতে ১০ অক্টোবর (১৯৫৬) প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচন বিল উত্থাপন করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু করার কথা বলা হয়। এতে সব দলই রাজি থাকলেও মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। এরপরও ১১ অক্টোবর (১৯৫৬) ৪৮-৪৯ ভোটে বিলটি পাস হয়। আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রচণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কারণ, সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে সিয়াটো (SEATO), সেন্টো (CENTO) ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ঘোর সমর্থকে পরিণত হন। এছাড়া মিশরের সুয়োজ খাল সংকটে ও সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকলে দলের ওপর নিজের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হননি। এদিকে ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী 'কাগমারীর ডাক' শিরোনামে প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এ প্রচারপত্রে মাওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক মহান ২১ দফা আদায়ের ডাক দেন এবং ২১ দফার পূর্ণ রূপায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ডাক দেন। এছাড়া এ সম্মেলনে ভাসানী তাঁর বিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিপক্ষে। ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তানকে ইতোমধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের ২৬ জুলাই পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে নতুন দল গঠিত হয়। নবগঠিত দলটি "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি" নামে আত্মপ্রকাশ করে। এ দলটিও জোরালোভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করে। ১৯৫৮ সালের ১৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে বাজেট অধিবেশন শুরু হলে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিতর্কের সম্মুখীন হন। বাজেটে এক সাধারণ আলোচনায় মনোরঞ্জন ধর ২১ মার্চ (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। এরপর বিরোধী জোট থেকে 'অর্থ বিল' নিয়ে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা সমস্যার সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় ৩১ মার্চ (১৯৫৮) রাতে গভর্নর ফজলুল হক আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির সংসদীয় দলের নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ২০ জুন (১৯৫৮) আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় আবু হোসেন সরকার ১৫৬-১৪২ ভোটে হেরে যান। ২৪ জুন (১৯৫৮) আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ১৯৫৬ সংবিধানের ১৯৩ ধারা বলে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। প্রায় দুই মাস পর ২৫ আগস্ট (১৯৫৮) গভর্নরের শাসন প্রত্যাহার করে আতাউর রহমান খান পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার মধ্যেও মতবিরোধ দূর হয়নি। নানা উপদলীয় কোন্দল দূর করার জন্য সোহরাওয়ার্দী নিজে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের তালিকা ও দফতরও বণ্টন করে দেন। তাতেও কোন সমাধান হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবারের গভর্নরের শাসন চালু হয়। আগস্ট মাস পর্যন্ত বাজেট পাস ও সম্ভব হয় না। এমনকি ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনা এরই মধ্যে ঘটে যায়। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলীর মৃত্যু সব ঘটনাকে ম্লান করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে পূর্ববাঙলায় সংসদীয় পদ্ধতির অবসান ঘটে।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাগুলো ২১ দফা ভিত্তিক যে দাবি নিয়ে '৫৪ এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পূর্ববাঙলায় যে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, মানুষের দাবিগুলো পূরণ হবে তার অনেক কিছুই হতে পারেনি। বার বার মন্ত্রিসভা গঠনের পর ও অন্তর্দলীয় কোন্দল ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সকল কিছুকে ভুন্ডল করে দেয়। ফলে ১৯৫৪-১৯৫৮ পূর্ববাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার সফলতার মুখ দেখতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১

একুশ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজানা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজানা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পেরও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবনের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্তমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত কর হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হইবে।

১৮. ২২ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা ইহবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোর্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।[১]

[১] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২

OFFICE OF THE UNITED FRONT PARTY

56, Simpson Road, Dacca

DEAR SIR,

Will you kindly send to us information and report on the following points as early as possible:

1. The names of the other candidates in your constituency with notes on their influence, names of their principal supporters and their chances of success.

2. A note of your own work; for instance, how many unions there are in your Constituency; how many you have covered yourself; in how many are your workers working; what are the difficulties in your way; should we write to any particular person to help you; your own chances of success, etc;

3. Nature of the propaganda against you e. g., are there any candidate misusing the name of the United Front Party or that they will join Mr. Haq's party if they succeed, are they defaming you or threatening the voters with hell-fire or are there any Maulvis and Pirs working against you and for the Muslim League.

4. Are there any leaflets in circulation in favour of other candidates alleged to have been signed by any of the leaders.

5. What is your symbol? If you have not got "BOAT" as your symbol, you have time up to February 17th to apply to the Election Commissioner for the symbol. If however, any other candidate has got the "BOAT" symbol, you must obtain his consent to the transfer. So you should try to get that consent.

6. Detailed report of the progress you have made so far. Have you met with any difficulties? If so, suggest means to get over the same, if you have not been able to surmount them already.

Yours truly,

(H.S. SUHRAWARDY)[২]

[২] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৩

UNITED FRONT PARTY OFFICE
56, SIMPSON ROAD, DACCA

Dear Sir,

Now that the elections are over and matters must still be fresh in your minds, it is very important that we collect for future reference some important data. We would request you to devote some time and attention to the collection of material and to let us know the replies as soon as possible. The replies may be sent in two batches, one batch in regard to questions which you can immediately answer, and the other in regard to questions which may require some time to reply.

We would like to have information on the following points:

(1) Names of contestant candidates with particulars of whether –
   (a) they had applied to the Muslim League,
   (b) whether they had applied to the United Front,
   (c) whether they claimed to be nominees of any particular person,
   (d) whether they issued pamphlets signed or purporting to have been signed by any particular Leader of the United Front or any other Party.
   (e) any important particulars.

(2) Can you send the leaflets produced by all parties particularly –

   (a) leaflets containing a Fatwa or recommendation of the Pir of Furfura. This was actually issued by the late Pir Sahib in 1946 and has been re-issued by the Muslim League on this occasion to mislead the people.

   (b) the Fatwas of Maulana Shamsul Huq and the Pir Sahib of Sarsina stating that a Vote against the Muslim League is against the Quoran and the Sunnah,

   (c) any other leaflets calculated to mislead the people.

Dhaka University Institutional Repository

(3) The name of those who worked on behalf of yourself and on behalf of the Muslim League and on behalf of their candidates, Union by Union and preferably village by village. Names of important and influential people need only be given (This information is required).
(4) Names of important workers not associated with the Union or village but working in the Centre may also be given.
(5) Particulars of persons arrested before the elections – whether under Public Safety Act or in any specific case; if in detention when election held also, who amongst them are Communists, and who are your workers?
(6) Name of persons who should have supported us but did not do so.
(7) Of the workers of the Muslim League many were violent characters and Goondas. Their names may also be supplied with short notes.
(8) Some information regarding Polling – whether any difficulties were placed in the way.
(9) Any comments regarding Female voting.
(10) Was the Polling Station placed where it should have been or was there anything wrong with its location.
(11) Has your Constituency been properly constituted or should your Constituency have been differently constituted in the interests of contiguous or Polling facilities.
(12) Was the Muslim League candidate rich? What were his antecedents and did he spend much money? Give any particulars regarding his method of work.

I would very much like a note regarding –

(a) Partial or impartial officers in your Constituency and their behaviour,
(b) a note on the requirements of your Constituency and its grievances and what should be done to improve your area and give some satisfaction to the people.

Please consider this to be of the utmost importance and reply as soon as possible.

Yours sincerely

SHAHEED SUHRAWARDY[3]

[৩] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৪

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত পূর্ববাঙলা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা হলেন- (EPA Election held on 3 March 1954. District Wise List of the MLAs):

দিনাজপুর :

১-১. আজিজুর রহমান
২-২. ভবেশ চন্দ্র সিংহ
৩-৩. দুর্গা মোহন রায়
৪-৪. ফজলে হক
৫-৫. জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
৬-৬. হাজী মোঃ দানেশ
৭-৭. মির্জা গোলাম হাফিজ
৮-৮. মোঃ দবিরুল ইসলাম
৯-৯. রহিমউদ্দিন আহমেদ

রংপুর :

১০-১. আবদুল হাফিজ
১১-২. আবদুর রহমান মিয়া
১২-৩. অভয় চরণ বর্মণ
১৩-৪. আবু হোসেন সরকার
১৪-৫. আবুল হোসেন আহম্মদ
১৫-৬. আবুল হোসেন মিয়া
১৬-৭. আহমদ হোসেন
১৭-৮. অমরেন্দ্র নাথ রায়
১৮-৯. আনামত আলী প্রধান
১৯-১০. আজিজুল হক
২০-১১. আজিজুর রহমান খন্দকার
২১-১২. ব্রজমাধব দাস
২২-১৩. কান্তিশ্বর বর্মণ
২৩-১৪. দবির উদ্দিন আহমেদ
২৪-১৫. দৌলতুননেছা খাতুন
২৫-১৬. এমদাদুদ্দিন আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া :

২৬-১. আকবর আলী খান চৌধুরী
২৭-২. দেওয়ান মহিউদ্দিন
২৮-৩. ধীরেন্দ্র নাথ সরকার
২৯-৪. জমিরউদ্দিন আহমেদ
৩০-৫. মাহবুবুর রহমান চৌধুরী
৩১-৬. মাজিরুদ্দিন আহমেদ
৩২-৭. মফিজউদ্দিন আহমেদ
৩৩-৮. সুরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত
৩৪-৯. সৈয়দ আহমেদ
৩৫-১০. কাসিমুদ্দিন তালুকদার

রাজশাহী :

৩৬-১. মোল্লা আবুল কালাম আজাদ
৩৭-২. আবুল কাসেম খন্দকার
৩৮-৩. আতাউর রহমান
৩৯-৪. ইদ্রিশ আহমেদ মিয়া
৪০-৫. কাঞ্চু উদ্দিন
৪১-৬. খোদা বক্স চৌধুরী
৪২-৭. লতিফ হোসেন
৪৩-৮. মফিজউদ্দিন আহমেদ
৪৪-৯. মজিবুর রহমান
৪৫-১০. মুসলেম আলী মোল্লা
৪৬-১১. প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী
৪৭-১২. হৃষীরাজ রায় বর্মণ
৪৮-১৩. বাবু সাগ্রাম
৪৯-১৪. সামছুল হক
৫০-১৫. সুরত আলী মন্ডল
৫১-১৬. তহুর আহমেদ চৌধুরী

পাবনা :

৫২-১. আবদুল আউয়াল
৫৩-২. আবদুল গফুর
৫৪-৩. মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ
৫৫-৪. আবু মোঃ ইউনুছ আলী
৫৬-৫. বছির উদ্দিন চৌধুরী
৫৭-৬. বিন্দু বাসিনী সরকার

Dhaka University Institutional Repository

৫৮-৭. জসিমউদ্দিন আহমদ
৫৯-৮. মধুসুদন সরকার
৬০-৯. মোঃ আবদুল মতিন
৬১-১০. ক্যাপ্টেন মোঃ মনসুর আলী
৬২-১১. রইচউদ্দিন আহমেদ
৬৩-১২. সেলিনা বানু

কুষ্টিয়া :
৬৪-১. বদরুন্নেসা বেগম
৬৫-২. কফিলউদ্দিন আহমেদ কাজী
৬৬-৩. মোঃ রাহাতুল্লাহ মিয়া
৬৭-৪. অহিদউদ্দিন জোয়ারদার
৬৮-৫. রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী
৬৯-৬. সৈয়দ আলতাফ হোসেন

যশোর :
৭০-১. আবদুল হাকিম
৭১-২. বিজয় চন্দ্র রায়
৭২-৩. ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত
৭৩-৪. মীর হাশেম আলী
৭৪-৫. ইকবাল আনোয়ার ইসলাম
৭৫-৬. মশিয়ুর রহমান
৭৬-৭. মোঃ মোশাররফ হোসেন
৭৭-৮. মোঃআবদুল খালেক
৭৮-৯. কামরুজ্জামান
৭৯-১০. শরৎচন্দ্র মজুমদার
৮০-১১. সুশান্ত কুমার বিশ্বাস
৮১-১২. সৈয়দ শামসুর রহমান

খুলনা :
৮২-১. শেখ আবদুল আজিজ
৮৩-২. আবদুল গণি খান
৮৪-৩. এ. এফ. এম. আবদুল জলিল
৮৫-৪. বিভুতি ভুষণ রায়
৮৬-৫. দেবেন্দ্র নাথ দাস
৮৭-৬. জি. এম. ওকালত আলী
৮৮-৭. জগদিশ চন্দ্র মন্ডল

Dhaka University Institutional Repository

৮৯-৮. খগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস
৯০-৯. ক্ষেত্রনাথ মিত্র
৯১-১০. কুবের চন্দ্র বিশ্বাস
৯২-১১. মমতাজ আহমেদ
৯৩-১২. রাজেন্দ্র নাথ সরকার
৯৪-১৩. সৈয়দ মোস্তাগাওসাল হক
৯৫-১৪. তৈয়বুর রহমান
৯৬-১৫. এনায়েতউল্লাহ

বাকেরগঞ্জ :

৯৭-১. আবদুল আলিম
৯৮-২. আবদুল কাদির মিয়া
৯৯-৩. আবদুল করিম
১০০-৪. আবদুল ওয়াহাব খান
১০১-৫. আবু নছর জিয়াউল আহসান
১০২-৬. আমিনুল হক চৌধুরী
১০৩-৭. বি. ডি. হাবিবুল্লাহ
১০৪-৮. চিত্ত রঞ্জন সুতার
১০৫-৯. দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ
১০৬-১০. ফারমাজুল হক
১০৭-১১. ফজলে রব খান চৌধুরী
১০৮-১২. মতিয়ুর রহমান
১০৯-১৩. আবদুর রশিদ
১১০-১৪. মোঃ এমদাদ আলী
১১১-১৫. ইসমাইল তালুকদার
১১২-১৬. মোঃ আলী তালুকদার
১১৩-১৭. মহিউদ্দিন আহমদ
১১৪-১৮. মজিবুল হক চৌধুরী
১১৫-১৯. মনোরঞ্জন সিকদার
১১৬-২০. নুরুদ্দিন আহমদ
১১৭-২১. প্রাণ কুমার সেন
১১৮-২২. মিসেস রাজিয়া বানু
১১৯-২৩. সতীশ চন্দ্র বালা
১২০-২৪. এস. ডবি- উ লকিতউল্লাহ
১২১-২৫. সৈয়দ আজিজুল হক
১২২-২৬. জয়নাল আবেদিন

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুর :

১২৩-১. আবদুল হামিদ চৌধুরী
১২৪-২. আবদুল ওয়াজিদ চৌধুরী
১২৫-৩. আবদুর রশিদ
১২৬-৪. আবদুর রশিদ সরকার
১২৭-৫. আবদুস সালাম খান
১২৮-৬. আবদুল হাফিজ মোহসিন উদ্দিন আহমদ
১২৯-৭. আসমত আলী খান
১৩০-৮. আদেল উদ্দিন আহমদ
১৩১-৯. ভবানী শঙ্কর বিশ্বাস
১৩২-১০. গৌর চন্দ্র বালা, তফশিল স্বতন্ত্র
১৩৩-১১. গোলাম মাওলা মিয়া
১৩৪-১২. এম. এ. ওয়াহিদ
১৩৫-১৩. মোঃ আবদুর রহমান
১৩৬-১৪. শেখ মুজিবুর রহমান
১৩৭-১৫. নগেন্দ্র নাথ তালুকদার
১৩৮-১৬. নীল কমল সরকার
১৩৯-১৭. ফনী ভূষণ মজুমদার
১৪০-১৮. রুকুনুদ্দিন কাজী
১৪১-১৯. রমেশ চন্দ্র দত্ত
১৪২-২০. ইউসুফ আলী চৌধুরী

ঢাকা :

১৪৩-১. আবদুল আউয়াল মিয়া
১৪৪-২. আবদুল লতিফ বিশ্বাস
১৪৫-৩. আবদুস সামাদ খান
১৪৬-৪. আবু আকবর মোঃ আবদুর রইছ হোসেন মিয়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা
১৪৭-৫. আফতাব উদ্দিন ভুইয়া
১৪৮-৬. আলমাছ আলী
১৪৯-৭. আনোয়ার উদ্দিন সিকদার
১৫০-৮. আতাউর রহমান খান
১৫১-৯. বেগম আনোয়ারা খাতুন
১৫২-১০. বিজয় ভুষণ চাটার্জী
১৫৩-১১. ভবেশ চন্দ্র নন্দী
১৫৪-১২. ধনঞ্জয় রায়
১৫৫-১৩. ফজলুর রহমান খান
১৫৬-১৪. গোলাম কাদের চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

১৫৭-১৫. কফিলউদ্দিন চৌধুরী
১৫৮-১৬. কলিমউদ্দিন আহমেদ
১৫৯-১৭. আবদুস সোবহান
১৬০-১৮. এম. বাদশা মিয়া
১৬১-১৯. মনির হোসেন জাহাঙ্গীর
১৬২-২০. মুনিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১৬৩-২১. সাদুল্লাহ
১৬৪-২২. তফাজ্জল হোসেন
১৬৫-২৩. মোঃ কোরবান আলী
১৬৬-২৪. মিসেস নুরজাহান মুরশেদ
১৬৭-২৫. পিটার পল গমেজ, খৃস্টান সংরক্ষিত আসন
১৬৮-২৬. রসরাজ মন্ডল, তফশিল হিন্দু
১৬৯-২৭. সঞ্জিবণ চন্দ্র দাস
১৭০-২৮. সিরাজউদ্দিন
১৭১-২৯. সামছুল হক
১৭২-৩০. সৈয়দ মোঃ আলী
১৭৩-৩১. তাজউদ্দিন আহমদ
১৭৪-৩২. ইয়ার মোহাম্মদ খান

ময়মনসিংহ :

১৭৫-১. আবদুল হাকিম মিয়া
১৭৬-২. আবদুল ওয়াহিদ বোকাইনগরী
১৭৭-৩. আবু আহমদ
১৭৮-৪. আবুল মনসুর আহমদ
১৭৯-৫. আফতাবউদ্দিন আহমদ
১৮০-৬. আহমদ আলী খান
১৮১-৭. আকতারুজ্জামান খান
১৮২-৮. আলতাফ হোসেন
১৮৩-৯. আমির আলী খান
১৮৪-১০. মাওলানা হাফিজ আতাহার আলী
১৮৫-১১. আজহারুল ইসলাম
১৮৬-১২. মাওলানা ফয়জুর রহমান
১৮৭-১৩. গিয়াসউদ্দিন আহমদ
১৮৮-১৪. গৌর কিশোর দাস
১৮৯-১৫. হাতেম আলী খান
১৯০-১৬. হাশেম উদ্দিন আহমদ
১৯১-১৭. হায়দার আলী মল্লিক

Dhaka University Institutional Repository

১৯২-১৮. ইনসান ভুইয়া
১৯৩-১৯. খালেক নেওয়াজ খান
১৯৪-২০. খন্দকার আবদুল হামিদ
১৯৫-২১. খোদাবক্স
১৯৬-২২. লুৎফর রহমান খান
১৯৭-২৩. খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ
১৯৮-২৪. ময়েজউদ্দিন আহমদ
১৯৯-২৫. মাজহারুল হক
২০০-২৬. মোয়াজ্জেম হোসেন
২০১-২৭. মিসেস মেহেরুননেছা খাতুন
২০২-২৮. মোঃ কালাম আলী
২০৩-২৯. মনোরঞ্জন ধর, কংগ্রেস
২০৪-৩০. মোয়াজ্জমউদ্দিন হোসেন
২০৫-৩১. মিসেস নিবেদিতা মন্ডল
২০৬-৩২. প্রফুল্ল রঞ্জন সরকার
২০৭-৩৩. ড. রফিকউদ্দিন আহমদ
২০৮-৩৪. নাঈমউদ্দিন আহমদ
২০৯-৩৫. রায়চরণ রায়
২১০-৩৬. মৌলভী সাইদুর রহমান
২১১-৩৭. সিরাজুল হক
২১২-৩৮. মাওলানা শামসুল হুদা
২১৩-৩৯. সুধাংশ শেখর
২১৪-৪০. সৈয়দ সরফউদ্দিন হোসেন
২১৫-৪১. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজা
২১৬-৪২. জমিরউদ্দিন আহমেদ
২১৭-৪৩. খয়রাত হোসেন
২১৮-৪৪. পণিরউদ্দিন আহমদ
২১৯-৪৫. সাইফুর রহমান
২২০-৪৬. সিরাজুল ইসলাম
২২১-৪৭. ড. জিকরুল হক

কুমিল্লা :
২২২-১. আবদুল গণি মুন্সী
২২৩-২. আবদুল করিম
২২৪-৩. আবদুর রহমান খান
২২৫-৪. আবুল কাশেম মোঃ জহিরুল হক
২২৬-৫. আবুল খয়ের রফিকুল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

২২৭-৬. এ. এন. এম. নুরুর রহমান
২২৮-৭. আমিনা বেগম
২২৯-৮. আমির হোসেন
২৩০-৯. আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী
২৩১-১০. আশুতোষ সিংহ
২৩২-১১. দেওয়ান মাহবুব আলী
২৩৩-১২. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত
২৩৪-১৩. খন্দকার মোশতাক আহম্মদ
২৩৫-১৪. ক্ষীরোদচন্দ্র ভৌমিক
২৩৬-১৫. মজিবুল হক মজুমদার
২৩৭-১৬. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
২৩৮-১৭. মোঃ হারুন-অর-রশিদ চৌধুরী
২৩৯-১৮. মাওলানা মোঃ ওসমান
২৪০-১৯. মোঃ আবদুল হামিদ মজুমদার
২৪১-২০. মোঃ আবদুর রউফ
২৪২-২১. হাফিজ মোঃ হাবিবুর রহমান
২৪৩-২২. এম. সৈয়দ সিরাজুল হক
২৪৪-২৩. এম. ওয়ালিউল্লাহ
২৪৫-২৪. প্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরী
২৪৬-২৫. প্রকাশ চন্দ্র দাস
২৪৭-২৬. হাজী রমিজ উদ্দিন আহমদ
২৪৮-২৭. শাহেদ আলী, কৃষক-শ্রমিক পার্টি
২৪৯-২৮. জহিরুল কাইউম

নোয়াখালী :

২৫০-১. আবদুল জব্বার খদ্দর
২৫১-২. আবদুল মালেক উকিল
২৫২-৩. আবদুস সালাম
২৫৩-৪. মাওলানা আবদুল হাই
২৫৪-৫. হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী
২৫৫-২৫-৬. খাজা আহমদ
২৫৬-৭. মোহাম্মদ তোয়াহা মিয়া
২৫৭-৮. মোজাম্মেল হোসেন
২৫৮-৯. ড. নুরুজ্জামান চৌধুরী
২৫৯-১০. রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী
২৬০-১১. সিরাজুদ্দিন আহমদ
১৬২-১২. শাহ সৈয়দ গোলাম সরওয়ার হোসেইন

Dhaka University Institutional Repository

২৬২-১৩. সাঈদুজ্জামান মিয়া
২৬৩-১৪. জিল্লুর রহিম

সিলেট :
২৬৪-১. আবদুল লতিফ
২৬৫-২. আবদুস সামাদ আজাদ
২৬৬-৩. আহমেদুর রহমান খান
২৬৭-৪. অক্ষয়কুমার দাস
২৬৮-৫. বসন্তকুমার দাস
২৬৯-৬. ফজলুল করিম
২৭০-৭. ফয়জুল হাসান
২৭১-৮. পীর হাবিবুর রহমান
২৭২-৯. জীবন সণ্যাল
২৭৩-১০. গজেন্দ্রচন্দ্র দেব রায়
২৭৪-১১. কালি প্রসন্ন দাস চৌধুরী
২৭৫-১২. কেরামত আলী
২৭৬-১৩. আবদুল হামিদ
২৭৭-১৪. মহিবুস সামাদ
২৭৮-১৫. মোহাম্মদ আলী
২৭৯-১৬. নছিরুদ্দিন চৌধুরী
২৮০-১৭. প্রসুন কান্তি রায়
২৮১-১৮. পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত
২৮২-১৯. রফিকুদ্দিন আহমদ চৌধুরী
২৮৩-২০. সাখায়াতুল আম্বিয়া চৌধুরী
২৮৪-২১. সৈয়দ কামরুল আহসান
২৮৫-২২. শাহেদ আলী

চট্টগ্রাম :
২৮৬-১. আবুল বাশার মোঃ সুলতান আলম চৌধুরী
২৮৭-২. আকতার কামাল
২৮৮-৩. ফজলুল কাদের চৌধুরী
২৮৯-৪. বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা
২৯০-৫. ফরিদ আহমদ
২৯১-৬. মৌলভী ফিরোজ আহমদ চৌধুরী
২৯২-৭. কামিনী মোহন দেওয়ান
২৯৩-৮. মাহফুজুল হক
২৯৪-৯. এম. এ. কাশেম

২৯৫-১০. হাজী মুহাম্মদ নবী চৌধুরী
২৯৬-১১. মোঃ আসহাবুদ্দিন আহমদ
২৯৭-১২. মাওলানা মাহমুদুর রহমান
২৯৮-১৩. মিসেস নেলী সেনগুপ্তা
২৯৯-১৪. পুলিন বিহারী দে
৩০০-১৫. পুর্ণেন্দু দস্তিদার
৩০১-১৬. সতীশ চন্দ্র জলদাস
৩০২-১৭. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ
৩০৩-১৮. শদ্ধানন্দু বিমল বড়ুয়া
৩০৪-১৯. সুধাংশু বিমল দত্ত
৩০৫-২০. তোহফানুন্নেছা বেগম
৩০৬-২১. ওবায়দুল আকবর
৩০৭-২২. জহুর আহমদ চৌধুরী
৩০৮-৩০৯. পার্বত্য চট্টগ্রামের এ আসন দুইটি শূন্য ছিল।[৪]

[৪] হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ১৬১-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. সরকারি রেকর্ড ও প্রকাশনা

ক. পূর্ববাঙলা/ পূর্ব পাকিস্তান সরকার

Government of Pakistan, The first five Years Plan 1955-60, Chapter 2, Background from five years plan (Karachi: National Planning Board, 1957).

Government of Pakistan, Census of Pakistan, 1951, vol. 3, East Bengal Report X Tables (Karachi: Ministry of the Interior, 1957)

Government of East Bengal (Home Department: Constitutions and Elections), Election manual, vol. I, Rules (Dacca: East Bengal Govt. Press, 1953).

Government of East Pakistan, A Handbook of Comparative Statistics of East and West Pakistan, Dacca: Planning and Development, 1968. Government of Pakistan, 20 Years of Pakistan in statistics 1947-1967, Karachi: Central Statistics Office, 1968.

Government of East Pakistan, Statistical Abstract for East Pakistan, Containing Statistical Data on Various Subjects for the Years 1949-50 to 1953-54, vol. III Dacca: The Provincial Statistical Board and Bureau of Commercial and Industrial Intelligence (Planning Development) 1956.

১. খ. The East Bengal Legislative Assembly Election (Preparation, Revision and Publication of Electoral rolls) Rules 1953.

Assembly Proceeding: official Report East Pakistan Assembly, 1st session 22nd May, 1956, vol. XIII (Dacca: East Pakistan Government, 1956).

Assembly Proceeding : Official Report East Pakistan Assembly, 2nd Session 13 August, 1956, vol. XIV (Dacca: East Pakistan Government, 1956).

Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 1st October 1956, vol. XV (Dacca: East Pakistan Government, 1957).

Assembly Proceeding: Official Report East Pakistan Assembly, 1st session 3rd April, 1957, vol. XVI, No. 5, (Dacca: East Pakistan Government, 1957).

Assembly Proceeding : Official Report East Pakistan Assembly, 3rd session 16th June, 1958, vol. 18 (Dacca: East Pakistan Government, 1958).

Assembly Proceeding : Official Report East Pakistan Assembly, 3rd session, 16th June, 1958, vol. 20 (Dacca: East Pakistan Government, 1958).

Government of Pakistan, Pakistan Constituent Assembly Debates, official Report, 1st to 16th session August, 1947 – September 1954, vol. 1-16, Karachi: Government of Pakistan Press (Corresponding Years).

_____, Debates of the Constituent Assembly of Pakistan, 1955-56.

_____, Debates of the Constituent Assembly of Pakistan, 1956-58.

১. গ. বাংলাদেশ সরকার

Election Commission of Bangladesh, *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly*, 1954, Dhaka, Secretary, Bangladesh Election Commission, May, 1977.

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

২. ইংরেজি গ্রন্থ :

Afzal, M. Rafique, *Political Parties in Pakistan 1947-1958*, vol. I, Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research Islamabad, 1986.

Ahmad, Kamruddin, *The Social History of East Pakistan*, Dacca: Crescent Book Center, 1967.

Ahmed, Kabir Uddin, *Breakup of Pakistan Background and Prospects of Bangladesh*, London: The Social Science Publishers, 1972.

Ahmad, Mustaq, *Government and Politics in Pakistan*, 2nd Edn. Karachi: Pakistan Publishing House, 1963.

Ahmed, Moudud, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy*, Dhaka, University Press Limited, 1991.

Ahsan, Syed Qamrul, *Politics and Personalities in Pakistan*, Dacca, 1967.

Bhuiyan, Md. Abdul Wadud, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1982.

Choudhury A. K., *The Independence of East Bengal a Historical Process*, Dhaka: The Jatiya Grantha Kendra, 1984.

Callard, Keith, B., *Pakistan: A Political Study*, London: George Allen and Unwin Ltd., 1957.

Chowdhury G. W., *Constitutional Development in Pakistan*, 2nd edn., London: Longmans 1969.

_____, *Democracy in Pakistan*, Dhaka: Green book House, 1963.

_____, *Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan*, Dacca: Green Book House 1967.

Chowdhury, Najma, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature*, 1947-58, Dhaka: University of Dacca, 1980.

Chowdhury, Mustafa, *Pakistan its Politics and Bureaucracy*, New Delhi: Associated Publishing House, 1968.

Choudhuri, Muzaffar Ahmed, *The Civil Service in Pakistan*, 2nd Edition, Dacca: National Institute of Public Administration 1969.

Chakravarty, Troilakya Nath, "Thirty Years in Prison and the Independence Struggle of Pakistan India" (Bengalijele Trish Basar O Pak Bharater Swadhinata Sangram, Dacca: Modern Printing Works Limited, 1968.

Gardezi, Hasan & Jamil Rashid (ed.), *Pakistan The Roots of Dictatorship The Political Economy of a Praetorian State*, Delhi: Oxford University Press, 1983.

Gough, Kathleen and Hari P Sharma (ed.) *Imperialism and Revolution in South Asia*, New York and London: Monthly Review Press, 1973.

Ghosh, Shyamali, *The Awami League 1947-1971*, Dhaka: Academic Publishers, 1990.

Hayes, Louis D., *Politics in Pakistan, The Struggle for Legitimacy*, USA, Westview Press, Inc., 1984.

Haque, Azizul, *Trends in Pakistan's External Policy 1947-1972*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1985.

Huq, M. Mahfuzul, *Electoral Problems in Pakistan*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1966.

Islam, Nurul, *Making of a National Bangladesh An Economist's Tale*, Dhaka: The University Press Ltd., 2003.

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh 1704-1991*, Vol. I Political, Vol. II Economic; Vol. 3 Social and Cultural; Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997.

Jahan, Rounaq, *Pakistan: Failure in National Integration*, London: Columbia University Press, 1972

Jalal, Ayesha, *The State of Martial Rule the Origins of Pakistan's Political Economy of Defence*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Kamal, Ahmed, *State Against the Nation, The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54*, The University Press Ltd., 2009.

K. K. Aziz, *The Maling of Pakistan: A Study in Nationalism*, London: Chatto & Windas, 1967.

Kabir, Humayun, *Muslim Politics 1906-1947 and other Essays*, Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969.

Kabir, Muhammad Ghulam, *Minority Politics in Bangladesh*, New Delhi: Visas Publishing House (Pvt.) Ltd, 1980.

Karim, Abdul, *Social History of the Muslim in Bengal*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan 1959.

Mc Grath, Allen, *The Destruction of Pakistan's Democracy*, New Your: Oxford University Press, 1996.

Maniruzzaman, Talukder, *The Politics of Development*: *The case of Pakistan, 1947-58*, Dacca: Green Book House Ltd., 1971.

Mahmood, Safdar, *Pakistan Divided*, Islamabad: Alpha & Brao, 1988.

Papanek, Gustav F. *Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives*, Cambridge: Harvard University Press, 1967.

Rahman, Muhammad Anisur, *The Lost Moment Dreams With a Nation Born Though fire Papers on Political Economy of Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd., 1993.

Rahman, Mutlubur, *Economic Problems of Pakistan*, Vol. 2. Karachi: The name of Publishers is not mentioned, 1950.

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

Russell and Mohammad, J. & Andrus X Azizli F., *The Economy of Pakistan*, London: Oxford University Press, 1958.

Sayed, Khalid B., *Politics in Pakistan The Nature and Direction of Change*, New York: Praeger Publishers, 1980.

_____, *Pakistan The Formative Phase 1857-1948*, 2nd Edn., Karachi: Oxford University Press, 1968.

_____, *The Political System of Pakistan*, Boston: Houghton Miffin, 1967.

Samad, Yunas, *A Nation in Turmil Nationalism and Ethnicity in Pakistan, 1937-1958*, New Delhi: Sage Publications, 1995

Sen, Rangalal, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka: UPL, 1986.

Scalapino Robert A., ed. *The Communist Revolution in Asia*: *Tactics, Goals and Achievements*. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall, 1965.

Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and Emergence of Bangladesh*, Dacca, 1975,

Tinker, Hugh, *India and Pakistan: A Political Analysis*, New York: Frederick A. Praeger Inc., 1962.

Umar, Badruddin, *The Emergence of Bangladesh*, Class *Struggles in East Pakistan (1947-1958)*, Karachi: Oxford University Press, 2004).

Zakaria, Nasim, *Parliamentary Government in Pakistan*, Lahore: New Publishers, 1958.

৩. ইংরেজি প্রবন্ধ

Ahmed Firoz, "The Structural Matrix of the Struggle in Bangladesh", New York and London: *Monthly Review Press,* 1973.

Callard, Keith, "The Political Stability of Pakistan," Pacific Affairs, Vol. XXIX, March, 1956.

Chowdhury. G. W., "Democracy on Trail in Pakistan," *Middle East Journal*, Winter-Spring, 1963.

_____, "Failure of Parliamentary Democracy in Pakistan." *Parliamentary Affairs,* Vol. 12 (1), Winter, 1959.

_____, "The East Pakistan Political Scheme," *Pacific Affairs*, December, 1957.

Franda Marcus F. "Communism and Regional Politics in East Pakistan," Asian Survey, Vol X, No. 7, July, 1970.

Huq, A. M., "Pakistan's Economic Development (1949-58)" *Pacific Affairs*, June, 1959.

Sayeed, Khalid. B., "Collapse of Parliamentary Democracy in Pakistan," *The Middle East Journal,* Autumn 1959.

_____, "Federalism and Pakistan," for Eastern Survey, September, 1954.

_____, "The Political Role of Pakistan's Civil Service," *Pacific Affairs*, June 1958.

Sarkar, Suman, "Pakistan: Patterns of Exploitation" Media and The Liberation War of Bangladesh, Vol. 2, Dhaka: *Centre for Bangladesh Studies,* 2002.

Gough and Sharma, Kathleen a Hari P. (ed.) Imperialism and Revolution in South Asia, New York and London, *Monthly Review Press,* 1973.

৪. বাংলা গ্রন্থ

আহাদ অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ঢাকা, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, কামরুদ্দীন, *পূর্ববাঙলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ইনসাইড লাইব্রেরি, ১৯৭৬।

আহমদ, সালাউদ্দিন, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫

_____, *শেরে-বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১।

আহমদ, ফয়েজউদ্দিন, পাঁচ দশকের স্মৃতিকথা, ঢাকা: পরমা প্রকাশনী, ১৯৯৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড*, রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০, দ্বিতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫, তৃতীয় খণ্ড, চট্টগ্রাম বইঘর, ১৯৮৫।

কাশেম, আবুল, (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ, ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১।

কামাল মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯১।

খান, আতাউর রহমান, *ওজারতির দুই বছর*, ঢাকা: স্ট্যান্ডার্স পাবলিশার্স ১৯৬৪।

গুপ্ত, অভিতাভ, *গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিত শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

ঘোষ, শ্যামলী, *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭।

চট্টপাধ্যায়, প্রণব কুমার, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৪।

ছিদ্দিকী, মোঃ খায়েরুল আহসান, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ১৯৫৩-১৯৬৬, ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০১১।

ছদরুদ্দীন, *বাংলাদেশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ*, ঢাকা: ১৯৭৫।

পাল, মতিলাল, *বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত*, *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৯।

১৯৭০, দ্বিতীয় খন্ড ১৯৭৫, তৃতীয় খন্ড, চট্টগ্রাম বই ঘর ১৯৮৫।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, *বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

মিয়া তোফাজ্জল হোসেন মানিক, *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*, ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি., ১৯৮১।

রহমান মোঃ মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

রহমান, শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

রহমান, সাঈদ-উর, *পূর্ববাঙলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

রায়, খোকা, *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬।

রহিম, খন্দকার আবদুর, *শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী*, ১ম খণ্ড, ১৮৮৭-১৯২১, টাংগাইল।

জাতীয় সাহিত্য সৃজনী সংস্থা, ১৯৯২ ইং, ২য় খণ্ড, ১৯২১-১৮৪৭, ৩য় খণ্ড, ১৯৪৭-১৯৭১, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৭১-১৯৭৬, ১৯৯৩।

রেজা শাহ আহমদ, ভাসানী, *কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম*, ঢাকা: গণ প্রকাশনী, ১৯৮৬।

সাঈদ, আবু আল, *আওয়ামী লীগের শাসনকাল (১৯৫৬-৫৮ এবং ১৯৭১-৭৫)*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

_____, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

_____, *সাত চল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

সোবহান রেহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাস্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

সেন, অসিত কুমার, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী ১৯৮৬।

রশিদ, হারুন-অর, *বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পুনর্পাঠ*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩।

রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ*, হাসিনা প্রকাশনা, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ১৬১-১৭১।

হেলাল, বশীর আল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।

হান্নান ড. মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে* ১৯৭১, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৌষ ১৪০৫, জানুয়ারি ১৯৯৯।

_____, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নিকট বিশ্লেষণ*, মো. সুলতান মিঞা, এ হাকিম এন্ড সন্স, ২৭ আলীমুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭০০০১৬, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭।

হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।

হুদা, নূরুল (সম্পাদিত), আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি – পরিক্রমা প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ*, ১৯৫৩- '৯৩, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬।

৫. বাংলা প্রবন্ধ

উমর, বদরুদ্দীন, "পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানি শাসনের প্রথম অধ্যায়," তদসংখ্যা *বিচিত্রা*, ১৯৮০।

চৌধুরী, মীজানুর রহমান, "ষাটের দশকে বাঙালী জাতীয়তার বিকাশ" ঈদসংখ্যা *বিচিত্রা*, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

তোয়াহা, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও যুব আন্দোলন." *বিচিত্রা*, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

রহমান, মোঃ মাহবুবর, "১৯৫৪ সালের পূর্ববাঙলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন: নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা," আই.বি.এস, *জার্ণাল*, ১৪০১: ২।

হোসেন ও করিম, আবু মো. দেলোয়ার ও এস. এম. রেজাউল, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার ও পূর্ববাঙলায় এর প্রতিক্রিয়া," *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, ১৯৮৭।

৬. পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

৭. দৈনিক পত্রিকা

Dawn (Karachi)

The Morning News (Dacca)

The Pakistan Observer (Dacca)

সাপ্তাহিকী, ঢাকা, ১৯৭০

দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা)

আজাদ (ঢাকা)

পাক সমাচার (ঢাকা)